শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—৭৩

অস্ফুট	শ্রীঅরবিন্দ	৫
বুঝেছি তোমার আত্মা	শ্রীঅরবিন্দ	৬
প্রশ্নমালা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৭
সাবিত্রী (অনুবাদ)	শ্রীঅরবিন্দ	১৩
ঋষি বিশ্বামিত্রের অভিনয়	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৭
অভিলাষ	ভাস্কর গুপ্ত	২২
প্রশান্তি	যমেন সেনগুপ্ত	২৩
বিকল্প		২৫
শ্রীমা ও আবদুল বাহা		২৬
মায়ের সঙ্গে কথা	...	৩২
ইউজেনিও মন্তালে	সমীরকান্ত গুপ্ত	৪৭
আশ্রমের ফুটবল	সমীরকান্ত গুপ্ত	৫৩

(ফেব্রুয়ারী–নভেম্বর
১৯৭৮

756.3
·002/25

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রি
চাঁদা ৫টাকা। বৎসরের যে-
আপিসে কিংবা কলিকাতা '
জমা না দিলে পত্রিকা ভি

কাশিত হয়। বার্ষিক
চিঠিপত্র সম্পাদকীয়
রের চাঁদা যথাসময়ে

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০	২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০	৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০	৬০০·০০

শাখা
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

P30605

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by : **Nolini Kanta Gupta**
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-73
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry-2

7 2 60

Trois étapes pour réaliser un Divin

Donne tout ce que tu as, c'est le point de départ

Donne tout ce que tu fais ; c'est la voie

Donne tout ce que tu es ; c'est l'aboutissement

avec mes bénédictions

ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হবার তিনটি ধাপ

যা কিছু আছে তোমার সব দিয়ে দাও এই হল যাত্রার সুরু।
যা কিছু করছ তুমি সব দিয়ে দাও ; এই হল পথ।
যা কিছু হয়েছ তুমি সব দিয়ে দাও ; এই হল সিদ্ধি।

আমার আশীর্বাদ সহ
৭. ২. ৬০

—শ্রীমা

অস্ফুট

শ্রীঅরবিন্দ

সদাই প্রাণের মাঝে অস্ফুট নিক্কণ বাজে,
গুপ্ত বেণু বাজে তাঁর।
বেণুর অস্ফুট কথা জাগায় মধুর ব্যথা
তীব্র প্রেম বাসনার।

অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় ত্রাসে ঘোরে যেন সদা পাশে
ভোঁয় এড়ায় নয়ন।
আধ দেখা তনুখানি, অস্ফুট সে পদধ্বনি,—
সদাই আকুল মন।

আঁধারে ঈষদ হাস, তনুর কিরণ ভাস,
ঘুরিছে অদৃশ্য কেহ।
প্রেমে তার প্রাণ মন কারায় বন্দিনী সব,
খুঁজি প্রেম-খনি দেহ।

অধরে অধর ছুঁয়ে, ক্ষণে হাত হাতে খুয়ে
মুহূর্ত্তের বৃথা স্পর্শ
বিফলি' বাড়ায় লোভ, নিরাশি' মধুর ক্ষোভ,
থাকি হরষে বিমর্ষ।

কবে ধরা দিবে আসি' হাসিয়া অপূর্ব্ব হাসি
ঢালিয়া হৃদয়-ধন
অল্প স্পর্শে বিশ্বানন্দ, অখিল সৌন্দর্য্য বন্ধ
এক দেহে উদ্‌ঘাটন।

বুঝেছি তোমার আত্মা

শ্রীঅরবিন্দ

বুঝেছি তোমার আত্মা, মহাপ্রাণ কাল।
বিচিত্র আকাশ যবে কিরণ প্রপাতে
মায়াপুরী রচয়িত্রী নির্মল সন্ধ্যার,
প্রবেছি নদীর তীরে, কলকলস্বর
সবাকুল প্রাণগীতি তরঙ্গবীণায়
বিলাইতে হৃদি-তারে। অনন্ত রজনী
নামিল নিঃশব্দপদে মুকুটের ছায়া
বিস্তারি গগন পটে, উড়ায়ে অঞ্চল
মসৃণ আঁধার পাতি দীর্ঘ ধরাতলে।
চিন্তামগ্ন নেত্রে * বিপুল সন্ধ্যায়
আকাশ ব্রহ্মের ধ্যানে বিলীন ভৈরবী
কৃষ্ণকায়া জগন্মাতা সমাধির এবে†।
টানিয়া গভীর কোলে শান্তিস্তব্ধ প্রাণী
সুষুপ্তির অভিনেত্রী থামাইল আসি
জীবনের কোলাহল অন্তহীন মৌনে।
নীরবতা-বধূভোজ তারকার পাল
দীপ্তির মৌমাছি সব উড়ে আসে নভে।
মাখিতে প্রাণীর মর্মে আনন্দ কিরণ
সুশীতল রভসের সমুজ্জ্বল ভাও

ভেসে উঠে শশী মণি-খচিত নিশায়।
জ্যোৎস্নাপ্লুত অন্ধকারে স্বপ্ন-আলোকিত
মানবের ক্ষুদ্র প্রাণ এ অসীম প্রাণে
ডুবাইয়া শুনিয়াছি নীরবের গান।

---

* এখানে অস্পষ্ট একটি শব্দের পাঠোদ্ধার করা গেল না
† পাঠান্তর 'ভবে'

ব্রহ্মজায়া

(ঋগ্বেদ : ১০—১০৯)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

আজ আমি তোমাদের একটা গল্প বলব—বড়দের এবং ছোটদের, সকলেরই জন্য এ গল্প—একটি অতি পুরাতন ও প্রাচীন কাহিনী। আসলে এটি বেদের গল্প।

একদা এককালে—অবশ্যই আমি এমন কালের কথা বলছি যে সময়ে দেশও ছিল না, কালও ছিল না, দেশ ও কালের অস্তিত্বেরও পূর্বে, যে সময়ে ছিল শুধু একমাত্র এক অনন্য সত্তা, নামাতীত সত্তা, নাম যার ব্রহ্ম। আমাদের মানুষী জীবের কাছে তিনি পরমপুরুষ, ভগবান, পরমপ্রভু অথবা যে নামে যার খুশী তাই। তিনি আবার সূর্যদেব, জ্যোতির্ময় সত্য। সকল জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম তাকালেন নিজের দিকে এবং অবাক হয়ে দেখলেন তাঁর জ্যোতিস্ফটাস, তাঁর ঔজ্জ্বল্য ক্রমেই স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে, হয়ে উঠছে অন্ধকার, আরও অন্ধকার। তিনি বিভ্রান্ত, হতবুদ্ধি প্রায়। এ কি করে হল? তখন তাঁর মনে পড়ল তাঁর সঙ্গী দেবকুলের কথা। তাঁরা তৎক্ষণাৎ এসে উপস্থিত হলেন—তাঁদের পুরোভাগে বরুণদেব বরুণ অর্থ যাঁর আছে বিরাট চেতনা ও দৃষ্টি। বরুণদেব দূরদর্শী—সুদূরতম দূরত্বেও দেখতে পান তিনি—দেখতে পারেন অদৃষ্ট ভবিষ্যৎকেও। তিনি আবিষ্কার করলেন ব্যাপারটা কি এবং বললেন, "ভগবন, আপনার শক্তি চলে গেছেন।" ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের শক্তি, ব্রহ্মজায়া ছিলেন এক তাঁরা ছিলেন সর্বদাই সম্মিলিত, এক অনন্য সম্মিলিত সত্তায় পরস্পরে লীন। বরুণদেব বললেন, "ব্রহ্মজায়া ব্রহ্মকে ত্যাগ করে চলে গেছেন।" এখন তবে সকলের কর্তব্য হল ব্রহ্মকে অন্ধকার অবস্থায় ফেলে কোথায় গেলেন তিনি সেটা আগে আবিষ্কার করা। তখন যেমন সর্বদাই ঘটে থাকে, বরুণদেব তাঁর দৃষ্টি দিয়ে—দূরদৃষ্টি, তাঁর সর্বভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন যে ব্রহ্মশক্তি, ভাগবতী শক্তি চলে গেছেন দূরে, বহু দূরে, পৃথিবীর অন্তরে অনেক গভীরে এবং সেখানে তিনি নিজেকে চূর্ণবিচূর্ণ করে জড় পদার্থে পরিণত করেছেন। তিনি হয়ে উঠেছেন জড়বস্তু, জড়ের মতই অচেতন ও অন্ধকার। দেবতারা দেখলেন, সেখানে তিনি সাধারণ জীব বস্তু ও পদার্থের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। তখন দেবতারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ এবং স্থির করলেন "আমরাই তাঁকে জাগ্রত করে তুলব, তাঁর আপন স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলব, নিয়ে যাব তাঁকে তাঁর প্রভু ব্রহ্মের কাছে—তবেই আবার ব্রহ্ম পারবেন তাঁকে পুনর্গ্রহণ করতে, পুনরায় লাভ করবেন তাঁদের আপন একাত্মতা।" সেই মত দেবতাদের প্রথম যিনি ব্রহ্মজায়ার সমীপস্থ হলেন তিনি সোমদেব—সোম অর্থ চন্দ্র বা আনন্দ। দেবতারা বললেন, আনন্দই তাঁদের—পরমদেব ও তাঁর শক্তিকে একত্র করে মিলিত করেছিল, সুতরাং তাঁদের পুনর্মিলনে স্বভাবতঃই এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে সোমদেবেরই উচিত পথপ্রদর্শক হওয়া এবং ব্রহ্মজায়ার নিকটে প্রথম অগ্রসর হওয়া। অতএব সব দেবতারা মিলে ব্রহ্মশক্তির কাছে গেলেন, তাঁকে সমস্ত পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বললেন এবং

অবশেষে তাঁকে সম্মত করালেন তাঁদের অনুসরণ করে চলতে তাঁদের পথে, সেই দীর্ঘ যাত্রার গৃহে প্রত্যাগমনের যাত্রায়। এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি পার্বতীর পার্থিব মাতৃগৃহবাস ও তার শেষে কৈলাসে তাঁর স্বর্গবাসী পতির নিকট প্রত্যাবর্তনের চিত্রটি।

আরও একটি কাহিনী আছে বেদে, এরই অনুরূপ বা সমান্তরাল কাহিনী—অগ্নিদেবতার সম্বন্ধে, এই মহাপ্রয়োজনীয় দেবতা অগ্নির আকস্মিক অন্তর্ধানের কাহিনী। তোমরা তো জান, অগ্নিদেবই যজ্ঞের প্রধান এবং হব্যবাহক, বৈদিক যজ্ঞব্যবস্থায়। অগ্নি ব্যতিরেকে যজ্ঞ হয় না, অগ্নিই পুরোহিত, এই মহা অনুষ্ঠানের পুরোভাগে আসীন যিনি—এই অনুষ্ঠান যা হল, আমি তোমাদের কাছে এখনই বলে দিচ্ছি, চেতনার অগ্রগতির যজ্ঞ। এর আরম্ভ বহ্নি প্রজ্বলিত ক'রে—তার অর্থ এ হল আত্মাহুতিময়ী সঙ্কল্পশক্তির উদ্বোধনের প্রতীক। আমাদের কাহিনীতে আসা যাক যজ্ঞ আরম্ভ করা হবে, সবকিছু প্রস্তুত, এমন সময় সহসা দেখা গেল যজ্ঞের নেতা দেবতাটি নেই সেখানে। সকলে তারা চারিদিকে খুঁজে ফিরল তাকে, কোথাও পাওয়া গেল না তাকে। সে পালিয়ে গিয়েছে। তখন যথারীতি সব দেবতারা একত্র হল এবং পলাতককে ধরবার জন্য সর্বত্র তন্নতন্ন করে খুঁজল। এখন সমস্যা হল কিন্তু কোথায় যেতে পারে সে? এ তো তারই কর্তব্য ছিল উপস্থিত থেকে কর্মটি আরম্ভ করা, আর কিনা এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটিতেই সে কোথাও নেই! সকলে বিভিন্ন দিকে খুঁজতে চলল—এবং শেষকালে আবিষ্কার হল, সে লুকিয়ে বসে আছে—কোথায়? না জলরাশির তলে। তখন দেবতারা তার সমীপস্থ হয়ে বলল "অগ্নি, কেন লুকিয়ে রয়েছ তুমি? বেরিয়ে এস, তোমার কর্তব্য পড়ে রয়েছে।" অগ্নি উত্তর দিলে: "না। আমি যাব না, সে তোমরা যাই বল না কেন আমি এই এখানেই রইলাম।" "কিন্তু কেন?" "এ অত্যন্ত কঠিন কাজ। আমার পূর্বেও অনেকে এই কর্মের প্রয়াস করেছে, এই দায়িত্বভার কাঁধে নিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু কেউই সফল হয়নি, অন্ততঃ সম্পূর্ণ সফল কেউই হয়নি। কাজেই আমি আর-একটা ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি করার কষ্টপ্রয়াস করতে চাই না। এ মিথ্যা প্রয়াস।" দেবতারা তবু অনুরোধ করে চললেন, অনুনয় বিনয় প্রার্থনা সব—"না অগ্নি, এ তোমার কর্ম। এর সম্পূর্ণ সুফল তুমি ভোগ করবে, আমরা তোমায় আশ্বাস দিচ্ছি।" শেষ পর্যন্ত দেবতারা সফলকাম হলেন। বিদ্রোহী দেবতা শান্ত ও সম্মত হলেন।

যজ্ঞ অর্থ—একটু আগেই তোমাদের বলেছি—চেতনার উর্ধ্বায়ন যখন আমরা উঠে চলি সাধারণ জড় স্তর থেকে, যখন আমরা উঠে এসেছি উর্ধ্বতর আলোর দিকে ইন্দ্রিয়ের অন্ধকার পার হয়ে, তার নাম উর্ধ্বায়ন, উর্ধ্বগতি এবং তাকেই বলা হয় যজ্ঞ: কারণ তুমি উঠে চল নিম্নভূমিকে ত্যাগ করে প্রকৃতির নিম্নতন স্তর সব ছেড়ে এবং তার ফলে লাভ কর উর্ধ্বতর সত্যসব। অগ্নি হল তোমার অন্তরাগ্নি অর্থাৎ তোমার হৃদয়ের তপঃশক্তি, সাধারণ মর্ত্যজীবের চেয়ে বেশি কিছু হয়ে ওঠার তোমার যে আস্পৃহা তারই বল। সুতরাং আসলে এ হল এক তপস্যা, উর্ধ্বে উঠে চলার সশ্রম প্রয়াস মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানের বিরুদ্ধে: বাস্তবিকই এ এক বিষম বিপত্তি। অগ্নি এ ঝামেলা গ্রহণ করতে চাননি, কারণ মানুষ, সাধারণ স্বাভাবিক মানুষও এ অস্বীকার করে। কিন্তু যেমন বলেছি এর সমাপ্তি অবশ্যম্ভাবী, কারণ শেষে অগ্নি রাজী হলেন। এখানে আমরা দেখি অগ্নি লুকিয়েছেন জলরাশির নীচে।

জলের তাৎপর্য কি? জল হল জীবনীরস, প্রাণশক্তি, প্রাণধারার প্রতীক। এ হল সেই একই চিৎ-শক্তির প্রতীক অগ্নি নিজেই যা, শুধু আচ্ছাদিত ভূমিত একটা জড় আবরণে, যেন একটা গোপন আশ্রয়। সেখান থেকে তাকে মুক্ত করে ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে হবে।

এবার আমরা আমাদের কাহিনীতে ফিরি। দেবতারা ব্রহ্মজায়াকে, ব্রহ্মের বধূকে সঙ্গে করে নিয়ে চললেন তার গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে। কিন্তু এ গল্পটির একটি আদি কাণ্ড আছে, একটা সূচনা—একটা প্রস্তাবনা যেন। ভাগবতী জায়া তাঁর স্বামীকে ছেড়ে এলেন কেন? কি এমন ঘটল যার ফলে তাঁকে পালিয়ে যেতে হল? ব্রহ্মকে একা ফেলে, যাঁর সঙ্গে এমন অটুট অখণ্ড মিলনে যুক্ত ছিলেন? কাহিনী বলছে, উপনিষদ বলছে, ভগবান ব্রহ্ম বহুকাল ধরে—আসলে শাশ্বতকাল ধরেই অনন্য একক ছিলেন, এক অস্তিত্ব এক সত্তা, অবিভক্ত, অবিভাজ্য; কিন্তু তাঁর অস্তিত্বের কোন এক সময়ে তিনি সচেতন হয়ে উঠলেন যে তিনি একক, একা। এতকাল এ কথাটা আদৌ তাঁর চিন্তায় আসেনি। একা থাকার কথা বা চারপাশে অন্যলোক থাকার কথা কিছুই মনে হয়নি তাঁর। তিনি ছিলেন নিছক অস্তিত্ব, তাই হয়েই বর্তে ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর অনুভব হতে লাগল, তিনি দেখলেন তিনি একাকী। এবং একবার যদি তুমি ভাবতে আরম্ভ কর, তার আর শেষ নেই। শেষ-কালে তিনি বললেন "একা একা কি করে সুখী হওয়া যায়? সুখী হতে হলে তোমাকে দ্বয়ী হতে হবে—একাকী ন রমতে। যতক্ষণ তুমি একা, তুমি উপভোগ করতে পার না। সুতরাং তোমাকে দুই হতে হবে।" এইভাবে ব্রহ্ম, পরম ভগবান নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন—দ্বিধাবিভক্ত এক এক অংশ পুরুষ, অপর অংশ প্রকৃতি, এক অংশ চিৎ, অপর অংশ শক্তি, বল, এক অংশ ব্রহ্ম অপর অংশ ব্রহ্মশক্তি। এতদিন এই দুই অংশই ছিল, কিন্তু তা ছিল মিলিত, সংযুক্ত, একই সত্তা ও ব্যক্তিতে একাত্ম শক্তি ও তাঁর অধিদেব, অগ্নি ও তার শিখা যেন—তাঁরা ছিলেন এক এবং অবিভাজ্য। কিন্তু যখনই মনে এল তাঁদের দুই হতে হবে কার্যতঃ তাঁরা আলাদা হয়ে গেলেন, ব্রহ্ম নিজেকে পৃথক করে নিলেন তাঁর শক্তি থেকে এবং শক্তিকে তাঁর থেকে বের করে নিলেন, এবং শক্তি নিজেও বেরিয়ে এলেন এবং বাস্তবিকই দুজনে পৃথক হয়ে গেলেন যেন মুখোমুখি দাঁড়ালেন পরস্পরের। তোমাদের মনে আছে হয়তো—আমি বড়দের বলছি—সেই নাটকটির কথা—এখানে থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল, যা নিজে পরিচালনা করেছিলেন—"He and She"—এবং সেখানে অভিনীত হয়েছিল পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতির লীলা—তাঁরা কেমন এক হয়েছিলেন, কেমন করে পৃথক হলেন, যাতে পরস্পরকে আরো স্পষ্ট করে ভাল করে দেখতে পান সেজন্য ক্রমশই পরস্পরের থেকে দূরে সরে যেতে লাগলেন, ধীরে ধীরে দূরত্ব বেড়ে চলল—এতদূর যে তাঁরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন এবং তাঁদের মিলন ও পুনর্মিলনের লীলা। এখন, তাঁরা যখন পৃথক হয়ে গেলেন এবং শক্তি তাঁর অধিদেবের কাছ থেকে এত দূরে সরে গেলেন যে তিনি গিয়ে পড়লেন অপর বিপরীত প্রান্তে। ব্রহ্ম ছিলেন ঊর্ধ্বে পরাচৈতন্য, এবং শক্তি হয়ে উঠলেন এখানে সম্পূর্ণ অন্ধকার জড়। ব্রহ্মও আবার তাঁর দিক থেকে তাঁর শক্তি হতে ভিন্ন হয়ে গেলেন, চলে গেলেন বিপরীত দিকে নাস্তির অভিমুখে, বৌদ্ধেরা যাকে বলেছে শূন্য।

এবার প্রত্যাবর্তন। শক্তি তাঁর দেবাধিদেবকে ছেড়ে দীর্ঘকাল থাকতে পারেন

না, সেটা শেষ পরিণতি হতে পারে না। তাঁকে তাঁর দেবের নিকট ফিরে আসতে হবে। তাই হল জড় প্রকৃতির পুনরুত্থান তার ক্রমরূপান্তর পরাপ্রকৃতিতে, তাঁর দেবদেবের পাশে পুনরায় আসনলাভের কাহিনী।

বেদে মানুষী জীবের জন্যও তার নিম্নতন প্রকৃতি হতে মুক্তির ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতি পুনরায় অর্জন করার যে পদ্ধতি ও সোপানশ্রেণীর বর্ণনা করা হয়েছে তা সর্বদাই এক। বেদ বলছে দেবতারা একে একে এলেন এবং শক্তিকে ঊর্ধ্বে তুলে নিয়ে চললেন। প্রথম এলেন সোমদেব অর্থাৎ আনন্দ, তিনি স্পর্শ করলেন পতিতা প্রকৃতির অন্তরতম অন্তরকে, বাধ্য করলেন তাকে জাগ্রত হতে, উত্থিত হতে। তাঁদের আদি মিলনেরও উৎস ছিল আনন্দ, সুতরাং তাঁদের পুনর্মিলনেও সে-ই দেবে অনুপ্রেরণা, হবে দিশারী। তারপর অগ্নিকে নির্দেশ দেওয়া হল শক্তিকে সঙ্গে করে পথে এগিয়ে নিয়ে চলতে। অগ্নি, আমি তোমাদের তো বলেছি, হল ঊর্ধ্বে উঠে চলার যে আকাঙ্ক্ষা তারই জ্যোতি ও বহ্নি। অগ্নি প্রথমে অজ্ঞান শক্তিকে দিল এক মন্ত্র, সাধারণ মানুষ আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করার সময় যেমন দীক্ষা নেয়। তুমি তখন একজন গুরুর কাছে যাও, গুরু তোমাকে দেন "মন্ত্র" যা তোমার চেতনাকে জাগ্রত করে তুলবে। এখন অগ্নি মন্ত্র দিলেন দিব্যবাক্ "ব্রহ্ম" ভগবানের প্রতিভূ রূপে। তাঁকে এই মন্ত্রে চেতনা সংহত করতে হবে যতক্ষণ না চেতনায় তাঁর সঙ্গে তিনি এক হয়ে যান। শক্তি তাই করলেন, এক সময় তিনি অনুভব করলেন তিনি পুনরায় চিনেছেন তাঁর দেবতাকে এবং তাঁকে গ্রহণ করেছেন। তখন অগ্নিদেব বললেন, "আরও অগ্রসর হও তবে। এবার তোমায় দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। তোমার সত্তাকে তোমার চেতনাকে বৃহত্তর প্রসারিত করে ধর : বর্তমানে যে উপলব্ধি পেয়েছ তুমি তা হল যে তুমিই ব্রহ্ম, তাঁর সঙ্গে তুমি এক। এখন তোমাকে মিলিত হতে হবে সকল জীব, সকল দেবতা, সকল প্রাণীর সঙ্গে, নিজেকে বিশ্বব্যাপিনী করতে হবে।" সুতরাং ব্রহ্মজায়া তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধি হতে এগিয়ে গেলেন বিশ্বভূত উপলব্ধিতে যেখানে তিনি ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করলেন সর্বজীবের সর্বপ্রাণীর অন্তরে সর্বত্র,—তিনি প্রবেশ করলেন সর্বদেবতার নিবাসেও।

তোমরা জান তবে, তিনটি ধাপ আছে, চেতনার তিনটি ধাপ, তোমার সত্তার তিনটি ধাপ পরমপুরুষের অভিমুখে উঠে চলতে হলে : প্রথমত তোমার সাধারণ ব্যক্তিসত্তা তার বিশেষ নাম ও রূপ নিয়ে, তা হল তোমার ব্যক্তিগত ব্যক্তিসত্তা ; তারপর সেই খোলস থেকে বেরিয়ে তুমি শেখ সর্বজীব, সকল মানুষ এমনকি সর্ববস্তুর সঙ্গে এক হতে। তুমি তখন হয়ে ওঠ সৃষ্টির মতই বিশাল, যদিও তাতেই শেষ নয়। তারও ওপারে যেতে হবে তোমাকে, তারও অতীতে যাকে বলা হয় পরাৎপর সেখানে, সেখানে তুমি দেখবে পরম ভগবানকে, তোমার সত্তার সমগ্র সত্য চরম সত্যকে। সুতরাং ব্রহ্মজায়া তাঁর বিশ্ব-উপলব্ধি থেকে গেলেন পরাৎপরে, তাঁর দেবতার মধ্যে, তার আপন পরিপূর্ণ স্বরূপের মধ্যে। তাঁর অজ্ঞান জড় রূপায়ণ থেকে তার ঊর্ধ্বায়নযাত্রায় তিনি যেন তাঁর নিম্নতর রূপের নির্মোক যত এক এক করে ছেড়ে চললেন, গ্রহণ করে চললেন বিশুদ্ধতর ঊর্ধ্বতর আরও মহিমাময় তনুসব। শেষ পর্যন্ত তিনি দেখলেন তিনি হয়ে উঠেছেন বিচ্ছেদের পূর্বে তিনি যা ছিলেন, আদিতে চিরকাল সদাসর্বদা। এভাবে তাঁরা যখন মিলিত হলেন তখন দেবতারাও তাঁদের আলিঙ্গনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন এবং পরিশেষে সকলেই হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হলেন।

বলা হয়, এই বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন অর্থ পৃথিবীর বুকে এক মহত্তর সিদ্ধি। এই বিচ্ছেদ ব্যতিরেকে এ সিদ্ধি পৃথিবীর পরে ঘটতে পারত না। পৃথিবী যা ছিল তাই থেকে যেত যদি না এই বিচ্ছেদ ঘটত, অর্থাৎ ব্রহ্মজায়া তাঁর দেবদেবের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জড়ে নেমে এসে জড়ের সঙ্গে এক হয়ে ওঠায় দেখা দিল সেই সম্ভাবনা, অনিবার্য ভবিতব্য তাঁর সত্তা ও ব্রহ্মের সত্তা জড়ের মধ্যে অবতীর্ণ ও প্রতিষ্ঠা হওয়ার।

ভাগবত জায়া পৃথিবীতে পতিত হলেন, জড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তার সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। হয়ে গেলেন জড় পদার্থ, জড়প্রকৃতি, ঘন, অন্ধকার, গুরুভার তার সকল ভার বয়ে। তিনি হয়ে উঠলেন—বেদের ভাষায়—ভীমজায়া, শক্তিময়ী ভয়ঙ্করী জায়া—বস্তুত আমাদের মহাকালী। আদিতে তিনি ছিলেন সৌম্যজায়া শ্রীময়ী বধূ। কিন্তু চাই এক প্রগতি, বিশেষ লাভ এক। তাই যখন তিনি উঠে ঊর্ধ্ব মুখে যাত্রা শুরু করেছেন, তিনি অর্জন করেছেন নিশ্চেতনার গুরুতম ভার তাঁর সঙ্গে উঠিয়ে বহন করে নিয়ে যাবার এবং ক্রমে তাকে রূপান্তরিত করবার শক্তি। শেষ পরিণতিতে সকল দেবতাকে আসতে হবে পুরোভাগে, সমগ্র মানবজাতিকে বেরিয়ে আসতে হবে যে উন্মুক্ত প্রসারে এবং স্নান করতে হবে সূর্যের আলোকে, অংশ নিতে হবে ভাগবত দম্পতির মিলনের আনন্দে।

এই নাটকই রূপায়িত হচ্ছে, সত্যকার নাটক, অলীক কল্পনাগড়া কাহিনী নয়। এ কার্য ঘটে চলেছে সূক্ষ্মতর স্তরে অন্য এক লোকে। স্বর্গসকলে, বেদ যেমন বলে, এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলেছে; পুনরাবৃত্তি হয় যাতে তা ক্রমেই অধিক হতে অধিকতর বাস্তব হয়ে ওঠে, অধিক হতে অধিকতর প্রকট সত্য হয়ে ওঠে পৃথিবীর উপরে এবং সর্বশেষে তা পৃথিবীতে প্রকট হয়ে ওঠে জড় আয়তনে, দেহ ধারণ করে।

বিশ্বসৃষ্টির এই নাট্যলীলার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য প্রণিধান করা উচিত। কোথাও কোন অবতরণ ঘটলে, তারপরে আসে তাকে অনুসরণ করে, অপরিহার্যভাবে এক আরোহণ। আপাতদৃষ্টিতে শক্তি একাই নেমে এসেছিলেন কিন্তু মূলত তিনি একা হতে পারেন না। তিনি নেমে এসেছেন তাঁর পরমদেবকে পশ্চাতে নেপথ্যে নিয়ে। কঠিন জড়ের ঘনতম তমসার মধ্যে ব্রহ্মও ছিলেন তার অন্তরতম অন্তরে উপ্ত শায়িত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ, যেন আলোকের অণুতম অণু এক। এবং তার অর্থই হল ঊর্ধ্বমুখী প্রবেগ এক, এক এষণা, আস্পৃহা আমাদের ভাষায়, তা সর্বদাই থাকে সেখানে। শক্তি যখন অচেতনার অতলে শেষ সীমায় পৌঁছান এইটিই ঘটে সেখানে: সেখান থেকে একাই প্রত্যাহৃত শক্তির গতি শুরু হয় বুমেরাং-এর গতি যেন। তার ফলে জাগরণ শুরু হয় অচেতন প্রকৃতির, শুরু হয় তার বিবর্তন, তার ঊর্ধ্বায়নের দীক্ষা। তার ক্রমবৃদ্ধির মধ্যে, লক্ষ্য করা যায়, পরমদেব তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত হয়ে চলেন; অর্থাৎ পরম ভগবানও নিজেকে অধিক হতে অধিকতর প্রকট করে চলেন—এ এক ত্রয়ী প্রকাশ। এই ত্রয়ীকে কখনও বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তাঁরা সর্বদাই এক, আপাত-বিচ্ছেদ বা তমসাচ্ছাদন লীলামাত্র মহত্তর পুনর্মিলনের উদ্দেশ্যে।

জানি না, তবে মনে হয়, আমরা এ যুগের মানুষেরা চরম উপলব্ধির খুব কাছাকাছি, একেবারে দোরগোড়ায় এসে গেছি, এই যে উপলব্ধি যার কথা বলে গেছেন প্রাচীন মহাপুরুষেরা—যখন সত্যই জড়, নিরেট অন্ধকার প্রত্যক্ষ জড়, আমাদের জড়মাতা,—বেদের

তীমাজায়া—রূপান্তরিত হবে এবং আমাদের মানবকুলও সে রূপান্তরের অংশভাগী হবে। বর্তমানে সেসব জিনিস, আগেই বলেছি যেমন, পুনরাবর্তিত হয়ে চলেছে অন্য সব জগতে, সূক্ষ্মতর স্তরে, সূক্ষ্মতর রূপে ও শক্তিতে। সম্পূর্ণ জড়রূপ তার বেশিদূরে নয়, উদীয়মান উষার পশ্চাতেই রয়েছে তা। তোমরা সকলে, আমরা সকলে নিশ্চয়ই অংশগ্রহণ করব সেই পরম পরিণতিতে কোন না কোন রূপে, কিন্তু আগে কিংবা পরে।

৮-৮-৭৭ তারিখে তরুণ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের প্রতি ভাষণ

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

৭ম পর্ব—যোগসাধনা

১ম সর্গ—মিলনের আনন্দ ;
ভাবী মৃত্যুর অপেক্ষায় অগ্নিপরীক্ষা—অন্তরের মহাশোক

(১)

নিয়তি অনুসরণ করে চলে পূর্বদৃষ্ট তার চিরস্থির পথ।
মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষায় গঠিত চলমান রথচক্র
বহন করে মূর্ত ভাগ্য তার
আর অন্ধ ইচ্ছাকে চালিত করে এক অজানা লক্ষ্যের দিকে।
অন্তরের নিয়তি তার রূপ দেয় সকল কর্মে আর বিধিবিধানে ;
নিয়তির মুখ আর অবয়ব জন্ম নিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে,
পিতৃপরিচয় রয়েছে তার আপন প্রচ্ছন্ন অন্তরাত্মায় ;
এই এখানে জড়শক্তি মনে হয় শারীর জীবনধারাকে দিয়েছে আকার
তারই স্বভাবের ধারা চালায় যেমন অন্তঃপুরুষ তার অনুসরণ করে তারে
প্রকৃতি আর নিয়তি বাধ্য করে তার আপন স্বেচ্ছা-নির্বাচন।
তবে মহত্তর সত্তাসব রয়েছে, সক্ষম তারা বিপর্যয় ঘটাতে এই ভারসাম্যে,
অন্তরাত্মাকেই গড়ে তুলতে পারে তার নিয়তির শিল্পীস্রষ্টারূপে।
এই হল গূঢ় সত্য, অজ্ঞান আমাদের ঢেকে রয় তারে
আমাদের জন্মসিদ্ধ শক্তি পথ কেটে চলে যে তারই নাম নিয়তি,
বাধাবিঘ্ন সেখানে সব আমাদের প্রচ্ছন্ন অন্তশ্চেতনাই স্বাগত করেছে,
নির্বন্ধ হল আমাদের আপন সত্তার আপন নির্দেশ।
সবই সার্থক হয়েছে যা-কিছু সাবিত্রীর হৃদয়
কুসুমকোমল বজ্রকঠোর আবেগোদ্বেল প্রশান্ত,
বরণ করেছে স্বেচ্ছায়, আপন সামর্থ্যের ঋজু পথরেখা ধরে
বিশ্বের সুদীর্ঘ বঙ্কিম রেখাকে বাধ্য করেছে তারই লক্ষ্য অনুসরণ তরে।
পুনরায় আসন গ্রহণ করে সে শব্দায়িত ধ্বন্যান্বিত অশ্বখুরাঘাতের পশ্চাতে ;
বেগবান সশস্ত্র বাহিনীসব আর দূরশ্রুত
ধাবমান রথচক্রধ্বনি বয়ে নিয়ে চলে তারে আপনার গৃহ হতে।
শায়িত পৃথিবী মূক তন্দ্রা হতে তার জেগে ওঠে
বিপুল আলস্য ভেঙে দৃষ্টি দেয় ঊর্ধ্বে এই সমাগতার অভিমুখে

পাহাড়সব পরস্পরে জড়িয়ে ধরে রয়েছে সেই উজ্জ্বল কুয়াশার মাঝে,
প্রসারিত প্রান্তরসব আয়াসে ছড়িয়ে দিয়েছে আপনাকে সেই নিদাঘের আকাশতলে,
বিস্তৃত সূর্যতলে দেশের পর দেশ,
নগরসব সোনালী পাথর যেন সেই প্রস্থলন্ত বিস্তারে,
পীতবর্ণ নদীসব বয়ে যায় শোভিত যেন কেশরদামে,
নিয়ে যায় শালুদেশের সবুজ সীমানারেখায়,
প্রিয়দর্শন পুরোভাগ, পশ্চাতে লৌহকঠোর অপার প্রান্তরসব
আর নিরাবরণ রুক্ষ চূড়াসব আর ভীষকায় নির্জন প্রসার।
নিকটে এল আর একবার বিধিনির্দিষ্ট সেই সুশোভন স্থান,
প্রান্তদেশ সমুজ্জ্বল বনস্থলীরাজির আনন্দে
প্রথম যেখানে দেখে সে সত্যবানের মুখখানি
আর সত্যবান দেখে যেন স্বপ্নের মধ্যে জেগে ওঠে
চিরন্তন সত্য এক সৌন্দর্য এক,
স্বর্গের পৃথ্বীজাত সন্তানের সোনালী জ্যোৎস্নার মাধুর্য।
অতীত চলে যায় পিছনে, নিকটে চলে আসে ভবিষ্যৎ
দূরে পিছনে পড়ে রয়েছে এখন যজ্ঞের বিশাল রাজপ্রাসাদের কক্ষসব,
শুভ্র রেখাঙ্কিত স্তম্ভরাজি, আর ছায়াশীতল একান্তের নীড়সব
বহুবীন অলঙ্করণ স্ফটিকের হর্ম্যতলে,
বিলাসশোভিত আরামনিবাস, বায়ুহিল্লোলিত জলাশয় কত,
ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত উদ্যান—
অবিলম্বে বিস্মৃত অথবা শুধু ক্ষীণ স্মৃতি এক—
প্রস্রবণ-প্রপাত প্রস্তরবেষ্টিত বিস্তৃত জলাশয়ে,
চিন্তামগ্ন দ্বিপ্রহরের গভীর সমাহিতি,
স্তম্ভশ্রেণীর ধূসর স্বপ্ন প্রশান্ত গোধূলিলগ্নে,
মন্থর চন্দ্রোদয় ভেসে চলে রাত্রির সম্মুখে।
দূরে ফেলে এসেছে পরিচিত মুখ যত,
হাস্যের ওষ্ঠাধরে মৃদুল কোমল কলধ্বনি
দৃঢ়নিবদ্ধ অন্তরঙ্গ যুগল করতল
প্রিয়জনের নয়নে পূজার আরতি-থালো
সমর্পিত সকলের জীবনের একমাত্র অধিপতিপদে।
প্রকৃতির আদিম নির্জনতা বিরাজে এখানে :
এখানে শুধু রয়েছে পশুপক্ষীদের কণ্ঠ,
তপস্বীর নির্বাসন এই অস্ফুট-চেতন বিশাল
মানববর্জিত অরণ্যমাঝে, পশে না সেখানে প্রফুল্ল কলকণ্ঠ
মানুষের হাস্যমুখর আলাপন আর তার কর্মব্যস্ত দিবসাবলী।
প্রসারিত সন্ধ্যা চেয়ে রয় মেলে তার রক্তলাল মেঘের আঁখি,

সঙ্কীর্ণ পথ এক, কুসুমাকীর্ণ সবুজ অবকাশ পার হয়ে
পার হয়ে আকাশের আর প্রান্তরের নির্নিমেষ দৃষ্টি এল তারা
শ্যামল সন্ধ্যার বিপুল আশ্রয়ে।
এগিয়ে নিয়ে চলে তাদের ক্ষীণ ধ্যানস্তিমিত পথ এক
বিশাল বৃক্ষকাণ্ডের ছায়াতল ভেদ করে
রৌদ্রের কৃপণ ভাণ্ডারী যত তোরণাবলী অতিক্রম করে,
দেখে তারা এক আম্রবের তৃণ-আচ্ছাদিত কুটিরের
ঘনসন্নিবিষ্ট শ্রেণী এক সুনীল প্রসারের তলদেশে
রৌদ্রোজ্জ্বল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে—মনে হয় সেখানে
হাসির উল্লাস ফেটে পড়েছে অরণ্যের সেই বিকট বক্ষতলে,
মানুষী চিন্তার সংকল্পের ক্ষুদ্র আশ্রয়
সাক্ষী শুধু তার মহারণ্যের মহামহীরুহ-সমারোহ।
উপনীত সাবিত্রী তুচ্ছ এক পর্ণকুটিরদুয়ারে,
প্রশ্ন নাই কোন তার এই অদ্ভুত নিয়তির সম্মুখে,
সকলের প্রিয় সকলের গর্ব সমর্পিত এখন অন্ধরাজার পদপ্রান্তে,
উদ্ভুঙ্গ বিজয়স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ যেন
পাশে তার বেদনাক্লিষ্ট মহীয়সী নারী এক, একদিন ছিল যে মহারাণী
এখন আপনার তরে কোন আশা রাখে না সে জীবনধারা হতে,
সকল আশা তার একমাত্র সন্তানের তরে,
ভিক্ষা করে সে সেই একমাত্র শীর্ষপরে পক্ষপাতদুষ্ট নিয়তির কাছে
পৃথিবীর সকল আনন্দ স্বর্গের সকল আশীর্বাদ।
প্রজ্ঞার সৌন্দর্যের আধার তরুণ দেবতার মত পূজা করে তারে,
দেখে স্বর্গও ভালবাসে তারে আপনি যেমন সে বাসে ভাল,
তার ঔজ্জ্বল্যে উল্লসিত সে, আস্থা রেখেছে এখনও তার ভাগ্য পরে
জানে না এখনও আসন্ন যে মহাকাল।
আরও কিছুদিন রয়ে যেতে চায় বনপ্রান্তে তারা
মানুষেরা যেমন অন্তিমযাত্রার বেদনা সরিয়ে সরিয়ে রাখে,
চায় না বিচ্ছিন্ন করে ধরতে শোকাচ্ছন্ন দৃঢ়বদ্ধ করতল,
শেষবারের মত চায় না দেখতে প্রিয়মুখখানি এক,
ক্লিষ্ট আগামী দিনের গুরুভার দুঃখে
বিস্মিত তারা দেখে নিয়তির একান্ত ঔদাসীন্য
হেলায় ভেঙে ফেলে যায় যে তার পরমসুন্দর সৃষ্টি সব
বিদায় গ্রহণ করে তারা বেদনায় জর্জরিত হৃদয় বহন করে;
অপরূপ সাবিত্রীর নির্বন্ধ,
সাবিত্রীর স্বেচ্ছানির্বাচনে অসহায় তারা
তারই আপন আনন্দে তারই আপনার নিয়তির পরে ন্যস্ত করে তারে

রেখে যায় বিশাল অরণ্যানীর নির্মম অধিকারে।
সবই পিছনে সরে গিয়েছে যা-কিছু আপনার জীবন ছিল তার,
স্বাগত করে যা-কিছু এখন হতে সত্যবানের ও তার যুগপৎ আপনার,
সাবিত্রী রয়ে যায় সত্যবানের সঙ্গে সেই উদ্দাম অরণ্যানী মাঝে
মৃত্যুমুখী আনন্দ এই অনুন্য তার কাছে :
নিঃসঙ্গে একান্তে ভালবাসা নিয়ে ভালবাসার তরে জীবন এখন তার।
দিবসাবলীর ক্রমধারার উর্ধ্বে আত্মপ্রতিষ্ঠ সে,
নির্বিচল চেতনা তার দেখে যায় কালের ক্লান্বিত গতি,
নিখর বিগ্রহ সে আবেগের আর অজেয় শক্তির,
মধুর সর্বক্ষম সঙ্কল্পের পরাকাষ্ঠা,
দেবতাদের প্রশান্তি আর রুদ্রবেগ
অদম্য অবিচল।

ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র

(ঋগ্বেদ)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৩য় মণ্ডল—৭ম সূক্ত

১। প্র য আরুঃ শিতিপৃষ্ঠস্য ধাসেরা মাতরা বিবিশুঃ সপ্ত বাণীঃ।
পরিক্ষিতা পিতরা সং চরেতে প্র সর্স্রাতে দীর্ঘমায়ুঃ প্রযক্ষে ॥১॥

প্র (+আরুঃ)—আরোহণ করেছে
যে—যারা
আরুঃ (প্র+)—আরোহণ করেছে
শিতিপৃষ্ঠস্য—কৃষ্ণপৃষ্ঠের
ধাসেঃ—প্রতিষ্ঠার
আ (+বিবিশুঃ)—প্রবেশ করেছে
মাতরা—পিতামাতার মধ্যে
বিবিশুঃ (আ+)—প্রবেশ করেছে
সপ্ত—সাত
বাণীঃ—বাণীতে
পরিক্ষিতা—চারিদিকে অবস্থিত
পিতরা—মাতা-পিতা
সম্+চরেতে—সঞ্চরণ করে, সর্বত্র চলেছে
প্র+সর্স্রাতে—অগ্রসর হয়ে চলেছে
দীর্ঘম্—দীর্ঘ
আয়ুঃ—আয়ু
প্রযক্ষে—যজ্ঞে দান করবার জন্য

কৃষ্ণপৃষ্ঠ অধিষ্ঠান হতে যারা ঊর্ধ্বে উঠে এসেছে, তারা মাতা-পিতার মধ্যে, সপ্তবাণীর মধ্যে প্রবেশ করেছে; মাতা ও পিতা ঘিরে রয়েছে চারিদিকে, তারা সর্বত্র বিচরণ করে, তারা অগ্রসর হয়ে চলেছে যজ্ঞের সহায়ে দীর্ঘ আয়ু দান করবার জন্য ॥১॥

২। দিবক্ষসো ধেনবো বৃষ্ণো অশ্বা দেবীরা তস্থৌ মধুমদ্বহন্তীঃ।
ঋতস্য ত্বা সদসি ক্ষেষমন্তং পর্যেকা চরতি বর্তনিং গৌঃ ॥২॥

দিবক্ষসঃ—স্বর্গবাসী
ধেনবঃ—ধেনু সব
বৃষ্ণঃ—বর্ষকের, পুরুষের
অশ্বাঃ—অশ্বসব, হয়রাজি
দেবীঃ—দিব্য
আ+তস্থৌ—উপনীত হল,
পৌঁছিল গিয়ে,
মধ্যে রয়েছে
মধুমৎ—মধুময়
বহন্তীঃ—স্রোতধারা
ঋতস্য—ঋতের, সত্যের
ত্বা—তোমাকে
সদসি—বাসস্থানে, আবাসে
ক্ষেষমন্তম্—আবাসাকাঙ্ক্ষী
পরি (+চরতি)—আবর্তন করে চলে
একা—একমাত্র
চরতি (পরি+)—আবর্তন করে চলে
বর্তনিম্—পথে
গৌঃ—জ্যোতি

দ্যুলোকবাসী ধেনুদের কাছে এসে তিনি উপস্থিত হলেন—পুরুষবরের অশ্বী (বাহন-

শক্তি) তারা, মধুময়ী স্রোতস্বিনী তারা। অধিতীয় জ্যোতি এক তোমাকে ঘিরে চলেছে পথ বেয়ে তুমি যখন তোমার নিবাস কাননা কর সত্যের গৃহে ॥২॥

৩। আ সীমরোহৎ সুযনা ভবন্তী: পতিশ্চিকিত্বান্রয়িবিদ্রয়ীণাম্।
প্র নীলপৃষ্ঠো অতসস্য ধাসেস্তা অবাসয়ৎ পুরুধপ্রতীক ॥৩॥

আ (+অরোহৎ)—উঠে গিয়েছে
সীম্—সর্বত:, চারিদিক ঘিরে
অরোহৎ (আ+)—উঠে গিয়েছে
সুযনা: —সুনিয়ন্ত্রিত
ভবন্তী:—তারা হয়েছে
পতি:—অধিপতি
চিকিত্বান্—জ্ঞানবান হয়ে
রয়িবিৎ—ধনাধিকারী, সম্পদাধিকারী, আবিষ্কারক
রয়ীণাম্—সকল সম্পদের
প্র (+অবাসয়ৎ)—স্থির নিবাস করে দিয়েছে
নীলপৃষ্ঠ:—নীলপৃষ্ঠ
অতসস্য—সতত চলমান
ধাসে:—প্রতিষ্ঠা বা অধিষ্ঠানের
তা:—তাদের
অবাসয়ৎ (প্র+)—স্থির নিবাস করে দিয়েছে
পুরুধপ্রতীক:—বহুরূপী

চারিদিক ঘিরে তাদের সে উঠে চলেছে, তারা সুনিয়ন্ত্রিত এখন, জ্ঞানবান সে, ধনৈশ্বর্য আবিষ্কার করেছে সে, তাদের অধিকারী সে। নীলপৃষ্ঠ সে, বহুরূপী চলমান অধিষ্ঠান থেকে তুলে ধ'রে সে তাদের স্থির আবাসে নিয়ে গিয়েছে ॥৩॥

৪। মহি ত্বাষ্ট্রমূর্জয়ন্তীমথর্বং স্তভূয়মানং বহতো বহন্তি।
ব্যঙ্গেভির্দিদ্যুতান: সধস্থ একামিব রোদসী আ বিবেশ ॥৪॥

মহি—মহান
ত্বাষ্ট্রম্—রূপণ-শক্তি (ত্বষ্টা-পুত্র)
ঊর্জয়ন্তীম্:—তপোময়ী
অথর্বম্—ক্ষয়হীন
স্তভূয়মানম্—স্তম্ভরূপী, দৃঢ়প্রতিষ্ঠ
বহত:—বহমান নদীসব
বহন্তি—বহন করে
বি (+দিদ্যুতান:)—প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে, সর্বত্র দীপ্যমান
অঙ্গেভি:—সকল অঙ্গ দিয়ে
দিদ্যুতান: (বি+)—প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে, সর্বত্র দীপ্যমান
সধস্থে—আপনার নিবাসে
একাম্-ইব—একই যেন
রোদসী—দ্যুলোকে ভূলোকে
আ+বিবেশ—অন্তরে প্রবেশ করেছে

বহমান নদীরা তপোবীর্যে পূর্ণ, তারা বহন করে চলেছে স্তম্ভরূপী এই অক্ষয়, মহান তপঃ শক্তিকে ; তার সর্বাঙ্গ দিয়ে দীপ্তি ফুটে বের হয়েছে, আপন আসনে আসীন সে, স্বর্গ ও মর্ত্যকে এক করে তার মধ্যে প্রবেশ করেছে ॥৪॥

৫। জানন্তি বৃষ্ণো অরুষস্য শেবমুত ব্রধ্নস্য শাসনে রণন্তি।
দিবোরুচ: সুরুচো রোচমানা ইলা বেষাং গণ্যা মাহিনা গী: ॥৫॥

জানন্তি—তারা জানে
দিব:-রুচ:—দ্যুলোকের (স্বর্গের) জ্যোতি

বৃষ্ণঃ—পুরুষবৃষের
অরুষস্য—অরুণবর্ণের
শেবম্—মহাসুখ
উত—আর
ব্রধ্নস্য—মহান সত্তা
শাসনে—শাসনে
রণন্তি—আনন্দ লাভ করে
সুরুচঃ—পরম জ্যোতির্ময়
রোচমানাঃ—জ্যোতিষ্মান
ইলা—দৃষ্টিময়ী বাক্, প্রকাশিকা বাক্
যেষাম্—যাদের
গণ্যা—সাধারণী ; গণপূজ্যা (সায়ণ)
মাহিনা—মহতী
গীঃ—উক্তি

তারা জানে অরুণবর্ণ পুরুষবৃষের পরমস্বরূপ, পরমসত্তার শাসনে তাদের আনন্দ, তারাই হল স্বর্গের জ্যোতি, পরমজ্যোতির্ময় তারা, দীপ্যমান তারা, ইলাদেবী তাদের হল সাধারণী মহতী বাক্ ॥৫॥

৬। উতো পিতৃভ্যাং প্রবিদানু ঘোষং মহো মহদ্ভ্যাননয়ন্ত শূষম্।
উক্ষা হ যত্র পরি ধানমক্তোরনু স্বং ধাম জরিতুর্ববক্ষ ॥৬॥

উতো—এবং, আরও
পিতৃভ্যাম্—মাতা-পিতার
প্র-বিদ্যা—জ্ঞানের সহায়ে
অনু+ঘোষম্—তার ঘোষণা বা আহ্বান অনুসরণ ক'রে
মহঃ—মহান
মহদ্-ভ্যাম্—মহানদের
অনয়ন্ত—প্রচালিত করে
শূষম্—বল, সামর্থ্য
উক্ষা—পুরুষ-বৃষ
হ—নিশ্চিতার্থে
যত্র—যেখানে
পরি—চতুর্দিকে
ধানম্—ধারণ বা আলিঙ্গন বা অবরোধ
অক্তোঃ—রাত্রির
অনু—অভিমুখে
স্বম্—আপন
ধাম—গৃহে
জরিতুঃ—পূজককে, পূজারীকে
ববক্ষ—বহন করেছে

মহান তারা, মহান মাতা-পিতার জ্ঞানের বলে তার মহাবলকে তারা প্রচালিত করেছে তার আহ্বান অনুসরণ ক'রে যেখানে পুরুষবৃষ তাঁর পূজককে বহন করে চলেছেন রাত্রিকে পরিক্রমণ ক'রে আপন প্রতিষ্ঠানের অভিমুখে ॥৬॥

৭। অধ্বর্যুভিঃ পঞ্চভিঃ সপ্ত বিপ্রাঃ প্রিয়ং রক্ষন্ত নিহিতং পদং বেঃ।
প্রাঞ্চো মদন্ত্যুক্ষণো অজুর্যা দেবা দেবানামনু হি ব্রতা গুঃ ॥৭॥

অধ্বর্যুভিঃ—পুরোহিতদের দ্বারা
পঞ্চভিঃ—পাঁচজনের
সপ্ত—সাতজন
বিপ্রাঃ—জ্যোতির্দ্রষ্টা
প্রিয়ম্—প্রিয় অথবা প্রেয়
রক্ষন্তে—রক্ষা করে
প্রাঞ্চঃ—সম্মুখগামী
মদন্তি—আনন্দ গ্রহণ করে
উক্ষণঃ—পুরুষবৃষেরা
অজুর্যাঃ—অক্ষয়
দেবাঃ—দেবতারা
দেবানাম্—দেবতাদের

নি-হিতম্—অন্তরে স্থাপিত
পদম্—আসন বা স্থিতি
বেঃ—সত্তার বা সম্বন্ধের
অনু (+গুঃ)—অনুসরণ করে
হি—নিশ্চয়
ব্রতা—কর্মধারা
গুঃ (অনু+)—অনুসরণ করে

সাতজন ঋষি যজ্ঞযাত্রার পাঁচজন পুরোহিতদের সহায়ে অন্তরে নিহিত আত্মসত্তার প্রেয় ও প্রিয় আসনকে রক্ষা করে। অবিনাশী বৃষভেরা মহানন্দে অগ্রসর হয়ে চলেছে, দেবতারা চলেছে দেবতাদের কর্মধারা অনুসরণ ক'রে ॥৭॥

৮। দৈব্যা হোতারা প্রথমা ন্যৃঞ্জে সপ্ত পৃক্ষাসঃ স্বধয়া মদন্তি।
ঋতং শংসন্ত ঋতমিত আহুরনু ব্রতং ব্রতপা দীধ্যানাঃ ॥৮॥

দৈব্যা—দেবরূপী
হোতারা—হোতৃ দুজনকে
প্রথমা—সর্বপ্রথম, মুখ্য
নি-ঞ্জে—অভিষেক করি
সপ্ত—সাতজন, সাতটি
পৃক্ষাসঃ—সুখধারা, ভোগধারা
স্বধয়া—স্বধর্মের বশে
মদন্তি—উল্লাস করে
ঋতম্—সত্যকে
শংসন্তঃ—প্রকাশ করে তারা
ঋতম্+ইৎ—সত্যই
তে—তারা
আহুঃ—মুখে বলে, কথায়
অনু—অনুসারে
ব্রতম্—কর্মধারা
ব্রতপাঃ—কর্মধারার রক্ষক
দীধ্যানাঃ—দীপ্যমান তারা

দেবরূপী সর্বাদি হোতাযুগলের আমি অভিষেক করি ; সপ্ত ভোগধারা, তাদের স্বধর্মে উল্লসিত, সত্যকে তারা প্রকাশ করে, সত্যকেই তারা কথায় বলে, কর্মধারার রক্ষক তারা, কর্মধারার অনুসারে প্রদীপ্ত তারা ॥৮॥

৯। বৃষায়ন্তে মহে অত্যায় পূর্বীর্বৃষ্ণে চিত্রায় রশ্ময়ঃ সুযামাঃ।
দেব হোতর্মন্দ্রতরশ্চিকিদ্ধ্যমহো দেবাঁরোদসী এহ বক্ষি ॥৯॥

বৃষায়ন্তে—বৃষবৎ হয়ে ওঠে
মহে—মহান
অত্যায়—অশ্বের জন্য, তুরঙ্গের জন্য
পূর্বীঃ—বহুল
বৃষ্ণে—বৃষভের জন্য
চিত্রায়—বহুবর্ণ
রশ্ময়ঃ—রশ্মিসকল
সু-যামাঃ—সুসংযত
দেব—হে দেব
হোতঃ—হে হোতা
মন্দ্রতরঃ—পরম মাদয়িতা
চিকিদ্ধ্যান্—জ্ঞানবান
মহঃ—মহান
দেবান্—দেবতাসকলকে
রোদসী—স্বর্গ-মর্ত্যকে
আ (+বক্ষি)—নিয়ে এস
ইহ—এখানে
বক্ষি (আ+)—নিয়ে এস

সুসংযত বহুল রশ্মিরাজি বৃষবৎ আবেগপূর্ণ হয়ে উঠেছে, বিচিত্রবর্ণ বৃষবরের জন্য ;

আহ্বানকারী হে দেবতা, পরম জ্ঞানময় তুমি, জ্ঞানময় হয়ে মহান দেবসকলকে, দ্যুলোক-ভূলোককে এখানে বয়ে নিয়ে এস ॥৯॥

১০। পৃক্ষপ্রযজো দ্রবিণঃ সুবাচঃ সুকেতব উষসো রেবদুষুঃ।
উতো চিদগ্নে মহিনা পৃথিব্যাঃ কৃতং চিদেনঃ সং মহে দশস্য ॥১০॥

পৃক্ষ—তৃপ্তিসকল
প্রযজঃ—যজ্ঞে নিয়ে আসে যারা
দ্রবিণঃ—দ্রুতগামী
সুবাচঃ—সত্যবাক্
সুকেতবঃ—সত্য চেতনা
উষসঃ—উষাসকল
রেবৎ—সমৃদ্ধ হয়ে
উষুঃ—উদয় হয়েছে
উতো—আর
চিৎ—নিশ্চিতার্থে
অগ্নে—হে অগ্নি
মহিনা—মহত্ত্ব দিয়ে
পৃথিব্যাঃ—পৃথিবীর
কৃতম্—কৃত হয়েছে, করা হয়েছে
চিৎ—নিশ্চয়
এনঃ—পাপ
সম্ (+দশস্য)—বিচ্ছিন্ন কর
মহে—মহতের বা বৃহতের উদ্দেশ্যে
দশস্য (সম্+)—বিচ্ছিন্ন কর

উষারাজি ক্ষিপ্রবেগে তাঁদের সকল সমৃদ্ধি নিয়ে উদয় হয়েছেন, তাঁরা যজ্ঞে নিয়ে এসেছেন সকল তৃপ্তি, সত্য তাঁদের বাক্, সত্য তাঁদের চেতনা। হে অগ্নি, পৃথিবীর মহত্ত্ব দিয়ে যা-কিছু পাপ করা হয়েছে তা বিচ্ছিন্ন করে দাও বৃহতের জন্য ॥১০॥

১১। ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ।
স্যান্ নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবাগ্নে সা তে সুমতির্ভূত্বস্মে ॥১১॥

ইলাম্—দৃষ্টিময় বাক্
অগ্নে—হে অগ্নি
পুরুদংসম্—বহুল কর্মময়
সনিম্—বিজয়
গোঃ—জ্যোতির
শশ্বত্তমম্—পরম চিরন্তন
হবমানায়—আহুতিকার বা আহ্বাতার জন্য
সাধ—সাধন কর, অর্জন কর
স্যাৎ—হয় যেন
নঃ—আমাদের
সূনুঃ—পুত্র
তনয়ঃ—আত্মজ
বিজাবা—সর্বত্রজাত
অগ্নে—হে অগ্নি
সা—সেই
তে—তোমার
সুমতিঃ—সত্যচিন্তা
ভূতু—সৃষ্ট হয় যেন
অস্মে—আমাদের মধ্যে

হে অগ্নি, আমরা আহ্বান করি তোমাকে, আমাদের জন্য নিয়ে এস চক্ষুষ্মান বাক আর সেই চিরন্তনী আলোকবিজয়ী বহুমুখী কর্মধারা ; হে অগ্নি, আমাদের আপন আত্মজ পুত্র হয় যেন, আমাদের মধ্যে সৃষ্ট হয় যেন তোমারই সত্য মতি ॥১১॥

P30605

অভিলাষ

ভাস্কর গুপ্ত

তোমার দেউলতলে উঠে গেছে ঊর্দ্ধ যে পথ—
আমি সেই পথপ্রান্তে বসি'
ধূলি লয়ে সারাদিন করেছিনু খেলা।
অন্যমনে কেটে গেছে বেলা—
শুনি নাই কবে তব বাঁশী
পথভ্রষ্ট পথিকেরে ডাক দিল আসি'
উৎসবআনন্দঘন ঐ তব মন্দির প্রাঙ্গণে।
লগ্ন হয়ে গেলে গত, পড়ে গেছে মনে
আমারও যে যেতে হ'বে, হে সুন্দর, তোমার আলয়ে।
আজি তাই আসিয়াছি হেথা
শত তীর্থযাত্রীলোকে আনিয়াছে যেথা
জীবন ঢালিয়া পড়া কী বিচিত্র অর্ঘের সম্ভার।
আমি একা ম্লান নিঃস্ব দাঁড়ায়েছি এসে
কবে তুমি নাগো, মধু হেসে
আমার রিক্ত হাতে ভরি' দেবে ডালি।
তাই দিয়ে অর্ঘ রচি দিব আমি চরণে তোমার—
বারবার—প্রতিবার, যত দিবে তত্বার।

দেবী, মোর এই শুধু এক অভিলাষ।

প্রশান্তি

রমেন সেনগুপ্ত

দুঃখ নয়, শোক নয়,
সুখ ?
চাই না যে তাও।
দুঃখের কণ্টকজ্বালা সয়েছি কতই।
বেদনার বিষপাত্র থেকে
দুঃখের মদিরা
আকণ্ঠ করেছি পান।
আরো দুঃখ দেবে ?
দিও না মা।
দেবে শোক ?
কত দেবে বলো।
প্রিয়জন-বিয়োগ বেদনা
বিদীর্ণ করেছে বক্ষ
কঠিন আঘাতে ;
শ্মশানের দীপ্ত বহ্নিশিখা
নিবে গেছে তপ্ত অশ্রুপাতে,
বিদায়ী নিঃশ্বাসে।
তবে আর কেন।
আর কেন কাঁদাবে মা।
তোমার নির্মম হস্ত দিয়েছে যে দান,
গ্রহণ করেছি সবই
নম্র নেত্রে
কম্প্র বক্ষ পেতে।
এবার কি দেবে সুখ—
ফেনিল উচ্ছল।
সম্পদের সুধাপাত্রখানি
তুলে দেবে হস্তে মোর,
বসাবে আমায়
জন-অনুরাগ-ধন্য সিংহাসন 'পরে
বর্ণালী আলোকে ?
চাই না মা, চাই না সে সুখ।

অন্তহীন ক্ষুধা তার,
যত পায় পাত্র ভরে,
রিক্ততা ঘোচে না।
কে চায় এমন সুখ।
মোরে তুমি দাও আগো
প্রশান্তির স্নিগ্ধ ছায়াখানি,
আলোহীন, জ্বালাহীন, বাসনাবিহীন
একখানি মেহঢাকা ছায়া।
নিরালা বনের ধারে ফোটে যে কুসুম,
আকাশের দূর প্রান্তে
অন্ধকার রাতে
যে তারাটি চেয়ে থাকে
মৌন নির্নিমেষে,
তারি সঙ্গী মোরে।
দুঃখ নয়, শোক নয়, নয় তুচ্ছ সুখ,
সমস্ত ছাড়ায়ে যাব
অন্তরের নিভৃত নিলয়ে
যেথা আছে তৃপ্তি এক
প্রশান্ত গম্ভীর।

দ্বিরূপা

মাঘ রজনীতে জাগিয়া দেখি যে
আকাশ পৃথিবী কালো
খাটির প্রাসাদ মুছিয়া গিয়াছে
তারায় তারায় আলো

সহসা পরীরা কোন্ দেশ হতে আসে
ঘুমভাঙা-ভাষে কুসুম-লেখায় হাসে.
চাহনি ছড়ায় অনুত মাধুরী
আমার শিখা কাঁপে,
ঘুমন্ত বুকে শিহর বুলায়ে
উষার রচনা যাপে ;

মুঠো মুঠো ঘরে আশ্পৃহাবীজ
আলোমানবীর দোলে মনসিজ,
জ্যোতির প্রতিমা দুয়ারে দাঁড়ায়ে
কণক-করুণা চালে
মর্ত্তের বাধা খোলে চিরসাধা
তৃতীয় নয়ন ভালে।

বিদ্যুৎ দৃক্‌পাতে
নিমেষে নিতাতে
সঞ্চিত যত কালো
মাঘ রজনীতে জাগিয়া দেখেছি
করালী মুণ্ডমালিনী
আপনি ধরেছে শুক্লাম্বরূপা
দিক্‌দিগন্তভাসিনী।

শ্রীমা ও আবদুল বাহা

"আমি আবদুল বাহাকে বিশেষ করে জানতাম। তিনি ছিলেন বাহাই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বাহা-উল্লার উত্তরপুরুষ, ছিলেন তাঁর পুত্র। জন্ম তাঁর কারাগারে এবং যতদূর মনে হয় চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি কারাগারেই কাটিয়েছিলেন। যখন তিনি কারাগার থেকে বাইরে এলেন তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছে এবং তিনি তাঁর পিতার ধর্ম উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন।..."*

"তিনি ছিলেন প্রখ্যাত বাহা-উল্লার পুত্র। সুফী সম্প্রদায়ের চেয়ে অধিকতর প্রগতিশীল ও উদার সব ভাবধারা প্রচার করেছিলেন বলে বাহা-উল্লাকে কারারুদ্ধ করা হয়; আর এই জন্য গোঁড়া মুসলমানেরা ছিলেন তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী, তাঁর পুত্র, পিতার ধর্মমত প্রচার করবেন বলে স্থির করেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি পৃথিবীর অনেক দেশে গিয়েছিলেন। তাঁর স্বভাব ছিল চমৎকার। তিনি ছিলেন যেমন সহজ সরল তেমনি ছিল তাঁর মহৎ আস্পৃহা। আমি তাঁকে খুবই ভালবাসতাম।...

"তাঁর আন্তরিকতা এবং ভগবানের প্রতি তাঁর আস্পৃহা ছিল সহজ ও খুবই স্বতঃস্ফূর্ত। একদিন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি—সেদিনটি ছিল শিষ্যদের কাছে তাঁর কিছু বলবার দিন। কিন্তু তিনি অসুস্থ ছিলেন, এবং ওঠবার তাঁর শক্তি ছিল না। ফলে সেই সভার কাজ হয়তো স্থগিত রাখতে হত। আমি তাঁর কাছে যেতেই তিনি বললেন, "আজকের সভায় আমার বদলে আপনি কিছু বলুন।" আমি তো প্রস্তুত ছিলাম না, তাই এরকম অনুরোধ শুনে আমি অবাক হলাম। আমি তাঁকে বললাম, "আমি তো আপনাদের সংঘের একজন নই, এবং আমি সে বিষয়ে কিছুই জানি না। আমি কি করে তাদের কাছে কিছু বলতে পারি?" কিন্তু তিনি জোর দিয়ে বললেন: "তাতে কিছু এসে যায় না। যা হোক কিছু বলুন, তাই খুব ভাল হবে। যান, বলুন গিয়ে...সভায় বেরে কিছুটা একাগ্র হবেন, তারপরে বলবেন।" শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে কিছু বলতে রাজী করালেন।...

"এরপর তিনি আমায় একদিন বললেন, আমি যেন প্যারিসে থেকে তাঁর শিষ্যদের ভার নিই। কিন্তু আমি তাঁকে উত্তর দিলাম যে আমি নিজেই তাঁর সংঘের মতবাদ গ্রহণ করিনি, সুতরাং আমার পক্ষে তা করার কোন প্রশ্নই আসতে পারে না।"†

* Entretiens 1950-51 (le 14 Avril), p. 409.

† একটি অপ্রকাশিত ভাষণ থেকে।

একটি ভাষণের ভূমিকা*

সকল ভবিষ্যদ্বক্তা, সকল আচার্য, যাঁরা এসেছেন মানুষের কাছে ভগবানের কথা বলতে, তাঁরা সকলেই অন্তত একটি ক্ষেত্রে একই রকম উপদেশ দিয়েছেন।

আমরা সকলেই জেনেছি যে মহত্তম সত্য সব কথা যদি-না তারা আমাদের মধ্য দিয়ে উপযোগী ক্রিয়াধারায় রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। তাঁদের সত্যদর্শনকে প্রাত্যহিক জীবনে ফলিয়ে ধরার কথা সকলেই ঘোষণা করেছেন। সকলেই স্পষ্টভাষায় বলেছেন যে তাঁরা শুধু আমাদের পথ দেখিয়ে দেন কিন্তু সে-পথ ধরে চলতে হবে আমাদের নিজেদেরই; কোন মানুষ তিনি যত বড়ই হোন না কেন, আমাদের স্থান নিয়ে আমাদের কাজ করে দিতে পারেন না।

বাহা-উল্লাও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম নন। আমি তোমাদের কাছে উদ্ধৃতি দেব না, তোমরা সেসব আমার থেকে অনেক ভাল অনেক বেশি জান। কতবারই-না আবদুল বাহা বলেছেন: কথা বোলোনা, কাজ করে যাও; কাজ ছাড়া কথা কোনোই কাজে আসে না, জগতের কাছে আমাদের হতে হবে দৃষ্টান্তস্বরূপ। বাস্তবিক এটা খুবই প্রয়োজন যে আমরা প্রত্যেকে জগতের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে উঠি। কারণ, শাশ্বত সত্যরাজির সঙ্গে আন্তর আদানপ্রদান কি রকমে বিশৃঙ্খলাকে সুশৃঙ্খলায়, দুঃখকে শান্তিতে রূপান্তরিত করে তা যদি মানুষকে প্রত্যক্ষ করাতে পারি তবেই শুধু আমরা তাদের সেপথ অনুসরণ করাতে পারব যেপথ তাদের নিয়ে চলবে মুক্তির দিকে। কিন্তু আবদুল বাহা এই উপদেশ দিয়েই সন্তুষ্ট নন, তিনি নিজের জীবনে তা পালন করেন আর প্রণোদিত করবার সকল শক্তির উৎস তাঁর সেখানেই।

বস্তুত, কে না দেখেছে আবদুল বাহার সান্নিধ্যে থেকেই অনুভব করা যায় সেই পূর্ণ সদাশয়তা, সেই মধুর প্রসন্নতা, সেই শান্তি যা তাঁর আধার থেকে ছড়িয়ে পড়ে।

আর তাঁর পুত্রের মাধ্যমে প্রচারিত বাহা-উল্লার সত্য-দর্শনগুলি আমাদের পক্ষে অনেক বেশি অবধারণযোগ্য এবং প্রামাণ্য হয়ে উঠেছে কারণ আবদুল বাহা সেসবকে তাঁর নিজের জীবনে ফলিয়ে ধরেছেন।

হয়তো কারো কারো মনে এ-চিন্তা আসবে: "আবদুল বাহা এই সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছেন কেন না তিনি হলেন সিদ্ধপুরুষ, কিন্তু আমরা.. ।"

সকল প্রযত্ন পরিহার করবার পক্ষে এর থেকে ভাল যুক্তি আমাদের নিশ্চেষ্টতা নিশ্চয়ই দিতে পারে না, কিন্তু তা হল আলস্যের এক অজুহাত মাত্র।

সন্দেহ নেই, এক প্রায় দুরতিক্রম্য পার্থক্য মানুষে মানুষে রয়েছে যা এসেছে সত্তাদের অন্তহীন ক্রমপরম্পরায় তাদের যে বিশেষ ভূমিকা, তাদের স্থান, তাদের পদ থেকে; কিন্তু সে ভূমিকা সে পদ যাই হোক না কেন, প্রত্যেকেই সে ক্ষেত্রে নিজ নিজ সামর্থ্যকে

---

* প্যারিসে বিভিন্ন গোষ্ঠির কাছে চিন্তা স্বপ্ন প্রভৃতি প্রসঙ্গে মা যেসব ভাষণ দিতেন তা গোষ্ঠিবিশেষের উপযোগী করবার জন্য কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে নিতেন। এই ভূমিকাটি ও তার আনুষঙ্গিক অংশগুলি ছিল আবদুল বাহা সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক এক গোষ্ঠির জন্যে।

পূর্ণতায় বিকশিত করে তুলতে পারে ; প্রত্যেকেরই আস্পৃহা থাকতে পারে এবং থাকা উচিত সেই শুদ্ধি, সেই পূর্ণ আন্তরিকতা, সেই গভীর সুসঙ্গতি অর্জনের জন্য যা বিশ্ব-শৃঙ্খলার সব বিধানের সঙ্গে আমাদের সমতাল করে ধরে।

আমি একজন শ্রৌঢ় প্রাজ্ঞকে জানতাম যিনি মানুষদের তুলনা করতেন এক একটি আকরিকের সঙ্গে যা কমবেশি স্থূল, কমবেশি সমৃদ্ধ, কিন্তু সবার মধ্যেই রয়েছে সোনা। অধ্যাত্ম রূপান্তরের পাবকশিখার মধ্য দিয়ে এই আকরিককে যেতে দাও, গলন-পাত্রের তল-দেশে দেখতে পাবে এক ধাতুপিণ্ড যা কমবেশি গুরুভার কিন্তু সর্বদাই খাঁটি সোনা।

কাজেই আমাদের মধ্যে রয়েছে এই যে বিশুদ্ধ সোনা তাকে তার সঙ্গে মিশ্রিত পদার্থ-পুঞ্জ থেকে মুক্ত করতে প্রয়াসী হতে হবে।

কত না পদ্ধতি নির্দেশ করা হয়েছে এর জন্যে !

তারা সবগুলিই চমৎকার, তবে প্রত্যেকটিই এক এক বিশেষ মানসিকতা ও চারিত্রিক গঠনের উপযোগী, আর প্রত্যেক মানুষকে খুঁজে বের করতে হবে কোনটি তার ধাতের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি খাপ খায়।

আর, আবার যদি ভুল না হয়, তবে মনে করি এইজন্যে শ্রীমতী স্যাণ্ডারসন এখানে প্রত্যেককে বলছেন, যে প্রশ্ন বা যে পদ্ধতি তার কাছে সব থেকে কার্যকরী বলে মনে হয়, সেটিকে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ব্যাখ্যা করে ধরতে।

আজ কোন বিশেষ একটি পদ্ধতির কথা সামগ্রিকভাবে তোমাদের কাছে ব্যাখ্যা করে বলবার দাবি রাখি না।

যেহেতু আমরা এই শিক্ষাই পেয়েছি যে আমাদের প্রথম কর্তব্যই হল কর্মরত থাকা, অধিকন্তু আমাদের কর্মাবলী আমাদের নিজেদের পক্ষে রূপান্তরের জন্যে সবচেয়ে শক্তিমান উপায়, আমি শুধু চাই দুই শ্রেণীর ক্রিয়ার উপর তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে যাদের অন্যদের ক্ষেত্রে এবং আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও যতখানি গুরুত্ব রয়েছে ততখানি, আমার বোধ হয়, সর্বদা তাদের দেওয়া হয় না।

তারা হল নিছক মানসিক ক্রিয়া, কিন্তু তৎসত্ত্বেও খুবই প্রাণবন্ত, খুবই শক্তিমান এবং ফলে যেদিকে তাদের চালানো হচ্ছে সেই অনুসারে তারা হতে পারে খুবই মঙ্গলকর বা খুবই ক্ষতিকর।

প্রথমটি হল আমাদের মানস গঠনবৃত্তি, চিন্তা, দ্বিতীয়টি হল ঘুমন্ত অবস্থার মধ্যে আমাদের ক্রিয়াকলাপ, সাধারণভাবে যাকে বলা হয় স্বপ্ন, এবং দেখতে পাবে যে প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টি খুবই অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত।*

অতি প্রাচীন সব শিক্ষাধারা তা কালদীয়ই হোক বা হিব্রুই হোক সব সময় এই শিক্ষাই দিয়েছে যে চিন্তারা হল সাকার সঙ্কল্প চিন্তার সহায়ে সত্যকার জীবন্ত ও সক্রিয় সব সত্তার জন্ম দেবার সামর্থ্য মানুষের আছে।

---

* এই ভূমিকাটি বোধহয় মূলত চিন্তাপ্রসঙ্গে মায়ের তৃতীয় ভাষণটির ('বুলেটিন' এপ্রিল, '৭৭ পৃঃ ৫৫-৬৯) এবং স্বপ্নপ্রসঙ্গে তাঁর ভাষণের ('পুরানো লেখা', পৃঃ ৩৪) পূর্বে দেওয়া হয়েছিল।

আর এও ভাবা উচিত নয় যে তা শুধু করা সম্ভব অসাধারণ ও বিপজ্জনক কোন অনুশীলনের সহায়ে যাকে বলে যাদুবিদ্যা,—মোটেই তা নয়।

কিছুটা শক্তিশালী ও অধ্যবসায়ী যে কোন চিন্তা, কিছুটা তীব্র যে কোন বাসনা—যা হল চিন্তার আর এক ধরন—তাদের আপন রাজ্যে বলতে গেলে যন্ত্রবৎ নিরূপিত করে এক রূপায়ণ যার ক্রিয়াশক্তি এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করবে যে চিন্তা বা যে বাসনা তাকে জন্ম দিয়েছে তার শক্তিমত্তা ও তীব্রতার উপর।

তোমরা যাতে আরো ভালভাবে আমার কথা বুঝতে পার তার জন্যে এখনো অপ্রকাশিত এক দার্শনিক গ্রন্থের কয়েকটি অনুচ্ছেদ তোমাদের জন্যে নিয়ে এসেছি।

"যা-কিছু প্রাণবান তাই বস্তুময়, কিন্তু যা-কিছু বস্তুময় তাই জীবন্ত। বস্তুর প্রতিটি অবস্থা হল জীবন্ত বলধারার, বাস্তব রূপাবলীর এক জগৎ।

"বাস্তবকে একমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপাবলীর এলাকায় সীমাবদ্ধ করা আর বিশ্ব-মনীষাকে শুধু তার স্থূল অভিব্যক্তির মধ্যে, সকল জ্যোতিকে একমাত্র আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য ক্ষেত্রেই আবদ্ধ করা একই কথা।

"আবার এমন কোন প্রসার নেই যেখানে নেই কোন আলোর স্পন্দন, এমন কোন গভীরতা নেই যেখানে মনীষার সারবস্তু যথোপযোগী রূপ পরিগ্রহ না করে।"...

"যে পর্যন্ত বিশ্বজনীন সকল সত্যসত্তাকেই আমরা একমাত্র বস্তুগত ধারায়, একমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় অবধারে মধ্যে সীমিত করে রাখব সে পর্যন্ত আমরা কিছুই জানব না, কিছুরই ব্যাখ্যা দিতে পারব না।

"বিজ্ঞান যখন বুঝতে চাইল আলো কি, তখন তাকে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারের অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ আশ্রয়ের অত্যন্ত সীমিত এলাকার গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে আসতে হল, আর সে ঈথর নাম দিয়ে এক সূক্ষ্ম বাস্তবতা মেনে নিল। কিন্তু সে অবধারে পৌঁছতে অসংখ্য যত জ্ঞানাভীতের পথে সে শুধু করেছে প্রথম পদক্ষেপ।...

"এইভাবে, এখন আমরা জানতে পারি যে সত্তার যে এলাকার সঙ্গে আমরা পরিচিত তা হল কেবল তার অভিব্যক্তির, স্থূলের ও পূর্বগামী সব ধারার পূর্ণতর বাস্তবায়নের ক্ষেত্র, জীবনের ক্ষেত্রাবলীর যা শেষেরটি।...

"চিন্তারাজি আমাদের ঘিরে যেসব জীবন্ত প্রতিরূপ প্রতি মুহূর্তে গড়ে চলেছে তা যদি আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারতাম, যদি পারতাম তাদের রূপায়ণশক্তির পরিমাপ করতে, তাহলে আমরা বুঝতাম যে আমাদের একমুখী সঙ্কল্পসমূহের সহযোগ আর একটা জনসংঘের একটা সভ্যতার, একটা জাতির গোষ্ঠীগত ভাব ও ভাবনারাজির বিপুল ঐক্যতানে কিনা সৃষ্টি করতে পারে।"...

"সকল ভাব নিশ্চয়ই সম মাত্রায় সৃষ্টিধর্মী নয়। খুব কমসংখ্যক মস্তিষ্কই সত্যকার চিন্তা করতে সক্ষম; ব্যষ্টিগত মানস রূপায়ণের বেশির ভাগই হল অনামা কোন চিন্তাবিদের গড়া বাঁধা-ধরা চিন্তার সব বিকৃতি বা অপকৃতি মাত্র যে চিন্তা সাধারণের সম্পত্তি হয়ে গিয়েছে। বুদ্ধিগত বস্তুস্তরে তারা যে সব রূপ পরিগ্রহ করে তা সাধারণত হয়ে থাকে স্থূল ও নিরর্থক; তাছাড়া তারা হয় ক্ষণস্থায়ী।

"কিন্তু যখনই কোন ভাব হয়ে ওঠে ভাব-শক্তি, মনের সত্যকার ক্রিয়াসামর্থ্য তখন তা

অধিকতর স্থিতিধর্মী ও যথাযথ রূপের মধ্যে তার নমনীয় রূপায়ণ গড়ে তুলতে ও ধরে রাখতে চায়। আর মহান চিন্তারাজি, বুদ্ধিশক্তির মূলগত সমন্বয় সব হল, যে বস্তুতে তারা রূপ নেয় তার মধ্যে, জীবন্ত সব সৃষ্টি, ক্রিয়াশীল সব সত্তা।"

* * *

আর তবুও আমাদের যেতে হবে নক্ষত্রের যারা আসবে একের পর এক এই রাত্রিকে আলোকিত করতে।* আর মানস দিক থেকে এটাই আবদুল বাহা আমাদের সকলের কাছে প্রত্যাশা করেন। বুদ্ধির দিক থেকে জগতের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হবার এই হল উপায়।

এই কাজের জন্য, অন্য সব কাজের চেয়ে বেশি করেই হয়তো, এ-ধরনের সম্মেলনের উপযোগিতা খুবই স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে।

একান্ত বিশুদ্ধ ও সমুচ্চ এক ভাবের চারিদিক ঘিরে নিঃস্বার্থ প্রগতির মিলিত এষণার মধ্যে একটি কি দুটি ঘণ্টা আমাদের চিন্তারাজিকে সম্মিলিত করে ধরলে আমরা এমন এক মানস পরিবেশ সৃষ্টি করব যা হবে ক্রমে আরো বেশি জ্যোতির্ময় আরো বেশি শক্তিমান। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়, এমনকি এটা হবে খুবই সামান্য যদি এই ধরনের সম্মেলনের বাইরে গিয়েই অরক্ষিত আমরা আবার ডুব দিই ওই দুর্ভার ও স্থূল পরিবেশের মধ্যে।

মার্চ ১০, ১৯১২

আবদুল-বাহার বিদায়গ্রহণ

গত সোমবার আবদুল বাহা আমাদের বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়েছেন। অল্প কয়েক-দিনের মধ্যেই তিনি প্যারিস ছেড়ে যাবেন; আর আমি জানি অনেক হৃদয়ই তাতে অনুভব করবে বিরাট শূন্যতা, হবে বিষণ্ণ।

তবুও শরীরই শুধু আমাদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছে, আর শরীর তো কেবলমাত্র এমন কিছু যা দিয়ে মানুষে মানুষে সব থেকে বেশি সাদৃশ্য গড়ে উঠেছে, তারা মহৎ বা ক্ষুদ্র, বিত্ত বা অন্ত পার্থিব বা দিব্য যাই হোক না? হ্যাঁ, ঠিক তাই; তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার যে তাঁর দেহই শুধু আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তাঁর চিন্তা বিস্তৃতভাবে আমাদের সঙ্গে থাকবে, তাঁর অটুট স্নেহ আমাদের ঘিরে রাখবে, আর তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাব সর্বদাই থাকবে একই রকম, পুরোপুরি একই রকম স্থূলভাবে তিনি আমাদের কাছেই থাকুন বা দূরেই থাকুন তাতে কিছু এসে যায় না, কারণ ভাগবত শক্তিরাজি মোটেই স্থূল জগতের বিধানের অধীন নয়: সর্বব্যাপী তারা, সর্বদা কাজ করে চলেছে সকল প্রগতিকুণ্ঠা সকল ঐকান্তিক আস্পৃহার পূর্ণতার জন্য।

---

* ১০ মার্চের এই ভাষণটিতে পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলি এসেছিল "প্যারিসের মত একটি নগরীর মানস পরিবেশ" বর্ণনার ('বুলেটিন', এপ্রিল, '৭৭, পৃঃ ৬১-৬৩) পুনরুক্তির পর; সেটি এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে।

তাই যদিও তাঁকে সশরীরে দেখতে পাওয়া বা তাঁর কণ্ঠ শুনতে পাওয়া, তাঁর সান্নিধ্যে থাকা আমাদের বাহ্য সত্তার কাছে প্রেয় হতে পারে, তবুও আমাদের নিজেদেরকে বিশেষ করে বলতে হবে যে, ওটি যতখানি অপরিহার্য মনে হচ্ছে ততখানিই দেখিয়ে দিচ্ছে যে আমরা আমাদের আন্তর জীবন, সত্যকার জীবন সম্বন্ধে এখনও অতি অল্পই সচেতন।

দিব্য জীবনের অপরূপ গভীরে না পৌঁছেও—সে সম্বন্ধে অতি অল্পলোকেই সজ্ঞান-সচেতন—চিন্তার রাজ্যেই আমরা দেশ-কালের বিধান অতিক্রম করে যেতে পারি।

কারো কথা ভাবা অর্থ তার সন্নিহিত হওয়া ; আর, দুটি মানুষ যেখানেই তারা থাকুক না স্থূলভাবে পরস্পরের কাছ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থাকলেও, যদি তারা পরস্পরের কথা ভাবে তবে তারা খুব বাস্তবভাবেই একত্র হয়। চিন্তাকে যদি যথেষ্ট একাগ্র করা যায় এবং চিন্তার মধ্যে যথেষ্ট একাগ্র হওয়া যায়, তাহলে যা চিন্তা করছি সে সম্বন্ধে আমরা সর্বাঙ্গীণভাবে সচেতন হয়ে উঠতে পারি, আর যদি তা হয় কোন মানুষ তাহলে কখনো-বা তাকে দেখতে পাই, শুনি তার কণ্ঠ—অন্ততপক্ষে তার মনের কথা জানতে পারি।

তখন আর বিচ্ছেদ বলে কিছু নেই, সেটা মনে হওয়া ভ্রমাত্মক। আর ফ্রান্স, আমেরিকা, পারস্য বা চীন যেখানেই হোক, আমরা যাকে ভালবাসি এবং যার কথা ভাবি, সর্বদাই তার সান্নিধ্যে থাকি।

কিন্তু এই তথ্যটি আরো বেশি বাস্তব আমরা যাঁর কথা ভাবছি তেমন এক ক্ষেত্রে—আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে,—যখন আমরা বিশেষভাবে সক্রিয় ও সচেতন এক চিন্তাশক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে চাই, এমন এক চিন্তাশক্তি যা অনন্ত প্রেমকে মূর্ত করে প্রকাশ করে, যা সমগ্র পৃথিবীকে স্নেহময় পিতৃসুলভ সতর্কতায় ঘিরে রাখে, সাগ্রহে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে চায় যারা তার উপর নির্ভর করে আছে।

এই মানস সম্মিলনের অভিজ্ঞতা লাভ কর, তাহলে দেখবে যে বিষাদের আর কোন স্থান নেই।

প্রত্যহ সকালে উঠে, দিনের কাজ শুরু করবার আগে, সানুরাগ প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতায় স্বাগত জানাও মানবসমাজের পরিত্রাতা এই মহাজনদের, যাঁরা দিশারী হয়ে আচার্য হয়ে, তাঁদের ভ্রাতৃবর্গের বিনীত অপরূপ সেবক হয়ে, পূর্ণতার দুরারোহ পথে উঠতে তাঁদের সাহায্য করবার জন্য চিরকাল এসেছেন, আসেন এবং আসবেন কালান্ত অবধি।

এইভাবে, প্রতিদিন সকালে জেগে উঠে বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতায় ভরা তোমাদের চিন্তাকে তাঁর প্রতি একাগ্র কর, তাহলে শীঘ্রই তোমরা তার শুভকর ফল অনুভব করবে। তোমরা অনুভব করবে তোমাদের আহ্বানে তাঁদের উপস্থিতি সাড়া দিচ্ছে, তাঁদের আলোয় তাঁদের প্রেমে তোমরা পরিবেষ্টিত পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকবে।

তখনই, আরো একটু ভাল করে বোঝার, আরো একটু বেশি ভালবাসার, আরো একটু বেশি করে সেবা করবার প্রাত্যহিক প্রয়াস হবে একই সঙ্গে আরো বেশি ফলপ্রসূ আরো বেশি সহজ। অন্যদের তোমরা যে সাহায্য দেবে, তা হয়ে উঠবে অধিকতর কার্যকরী আর তোমাদের হৃদয় ভরে উঠবে এক অটুট আনন্দে।* জুন ৯, ১৯১৩

---

* 'বুলেটিন' থেকে অনূদিত। অনুবাদক ; শতদল

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

২৮ জুলাই ১৯৫৪

(শ্রীঅরবিন্দের লিখিত The Mother বইটিতে লেখা কতকগুলি কথার প্রসঙ্গে)

প্রশ্ন : অর্থের প্রভাব ও তার মূল্য অন্যান্য স্তরেতে কেমন হবে ?

উত্তর : অন্য সব স্তরে ? এখানে শ্রীঅরবিন্দ যা বলেছেন তা শুধু প্রাণের ও দেহের স্তর নিয়ে তাই নয় কি ? উনি বলেছেন যে এই দুই স্তরে অর্থের ক্রিয়া হয় বিশেষ শক্তি রূপে। প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি অর্থের মাধ্যমে হয় খুব বেশি। (নীরব থেকে) দেখ, অর্থ সম্পদ বলতে তুমি ভাবো হয়তো কতকগুলি ব্যাংকনোট বা প্রচলিত বিশেষ মুদ্রাগুলি বা মূল্যবান গহনাগাঁটি বা বিবিধ বৈভবকে। কিন্তু সবই হোল সেই একই বিশেষ শক্তির বাহ্য প্রকাশ বা নিয়ে তোমার প্রাণসত্তা ইচ্ছামত প্রয়োগ করতে পারে, এবং সমুচিত ভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সঞ্চালিত করে তার দ্বারা আপনা হতেই আরো বেশি সম্পদকে বাড়াতে পারে। সবই হবে তার শক্তিরই ক্রিয়াতে (নীরব থেকে)...তার যতই ব্যবহার ও প্রযুক্তি হতে থাকে ততই আরো নানা স্পন্দনকে জাগিয়ে ও পরিচালিত ক'রে তার সেই শক্তিই আরো বেড়ে যায়, যেমন স্থূল দেহের পরিশ্রম ও অনুশীলনে দৈহিক শক্তিও ক্রমশ বেড়ে যায়।

এই শক্তিকে যখন তুমি নিত্য প্রয়োগের দ্বারা নিত্য খাটাতে থাকো তখন প্রাণময় স্তরে তাতে একটা গাঢ় রকমের লাল রং ও সোনালি রং লাগে যা বাইরে চক্‌চক্ না করলেও ভিতরে বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে। এ শক্তিকে তুমি যতই চালু করবে ততই আরো বেড়ে উঠবে। এ এমন জিনিস নয় যাকে স্তূপাকার ক'রে জমিয়ে গুদামে মজুদ ক'রে রাখা যাবে, কারণ অব্যবহারে তার শক্তি নষ্ট হতে থাকবে। যেমন, কৃপণতা ক'রে যারা এই শক্তিকে পুঁজি ক'রে রাখতে চাইবে তাদের কাছে চলাচলের অভাবে পড়ে থেকে হয়তো অন্য উপায়ে পালিয়ে যাবে অথবা অকেজো থেকেও শক্তিহীন হয়ে কেবল ছাতা পড়ে যেতে থাকবে।

এখানে সেই অর্থশক্তির কর্মকুশলতার সাহায্যে তাকে ঠিকভাবে স্থান দেবার কৌশলটি তোমাকে বলা হয়েছে : সম্পূর্ণ নির্ব্যক্তিক অন্তরে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে তুমি ঐ শক্তির মালিক নও পরিবেশক মাত্র, ঐ শক্তি তোমার হাতে দেওয়া হয়েছে এমন বিবেচনার সঙ্গে ব্যবহার করতে যাতে ওর দ্বারা সব চেয়ে দরকারী কাজগুলি সুসম্পন্ন হয়। এরূপ সমুচিত ব্যবহারে ওর শক্তি আরো এমন বেড়ে যায়—অনেক কিছুকে তখন আকর্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অর্থাৎ স্থূল অর্থগুলি হাতে না নিয়েও উপর থেকে তার শক্তিকে পরিচালন ও যথাস্থানে প্রয়োগ করতে পারে এবং তার দ্বারা উদ্দিষ্ট কর্মকে সফল করে নিতে পারে। নিজে সেই ধনের মালিক না হয়েও তার শক্তিকে খাটাতে পারার সুযোগ যদি কেউ পায় তাতে অনেক মহৎ কাজকে সে সার্থক করতে পারে।

কেউ একজন লিখেছিল যে আমার নিজের কোনো সম্পদ নেই, তাই যদি শ্রীঅরবিন্দের

কাজের জন্য কারো কাছে কিছু চাইতে গেলে কি তা মিলবে না,—এরই জবাবে শ্রীঅরবিন্দ তাকে লিখেছিলেন যে তোমার নিজের হাতে অর্থ কিছু না থাকলেও যদি কোনো ব্যক্তির অথবা সংস্থার অর্থশক্তিকে তোমার কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবার অধিকার অবশ্যই তোমার মিলতে পারে যদি তেমন আকর্ষণশক্তি ও দক্ষতা তোমার থাকে।

প্রশ্ন মধুময়ী মা, এই অর্থশক্তি কেমন করে ভগবানের কবলচ্যুত হলো?
উত্তর কি বলছ?

প্রশ্ন পূর্বপ্রশ্নের পুনরুক্তি করলে।
উত্তর তাই তো বুঝতে পারলাম না, কেমন ক'রে অর্থশক্তি...

প্রশ্ন হাঁ, কেমন ক'রে এ শক্তি ভগবানের হাতছাড়া হলো?
উত্তর হাতছাড়া কাকে বলছ? অর্থশক্তি জন্মেছে প্রাণরাজ্যের বিপরীত রকম ক্রিয়াতে। এ জিনিস প্রাণরাজ্যেরই অন্তর্গত। তাই এখানে বলা হয়েছে যে এ ধরনের সব কিছুই বস্তু-স্তরের ও বাস্তবক্রিয়ার জিনিস তাই তা গিয়ে পড়েছে অসুরদের দখলে। সে দখল থেকে ঐ শক্তিকে এখন পুনরুদ্ধার করা দরকার।

আগেকার কালে যারা যোগ সাধনা করতে চেয়েছে তারা বলেছে যে এই অর্থ মাত্রকেই স্পর্শ পর্যন্ত করা চলবে না। কারণ এটা আধ্যাত্মিক পথের অন্তরায়। কিন্তু তবু সবও কিছুই আসলে তো সেই মূল ভগবানেরই বিভিন্ন বিকাশ, তাঁরই অভিব্যক্তি সকল জ্ঞানসই শেষ পর্যন্ত তো কেবল তাঁরই। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে, এটাও তাঁরই অধিকারের অন্তর্গত, একে পুনরুদ্ধার ক'রে তাঁকেই ফেরত দিতে হবে। অর্থাৎ আসুরিক দখল থেকে ছাড়িয়ে এনে ভগবানের কাজের দিকে প্রয়োগ ক'রে তাঁর রূপান্তর আনার ক্রিয়াতে সহায়তা করতে হবে।

(মা নীরব হলেন)

প্রশ্ন মধুময়ী মা, এই অর্থশক্তিকে তো মানুষরাই সৃষ্টি করেছিল, তাহলে তা ভগবৎ শক্তির অন্তর্গত হবে কেমন করে?

উত্তর: হুঁ, হুঁ। (মা হেসে উঠলেন) অর্থাৎ কিনা তুমি এমন কথাও বলতে চাইছ যে, পুরুষ আর মেয়েতে মিলে যে মানুষটিকে জন্ম দিল সে তো ভগবানের হতে পারে না। এ দুটো একই রকম কথা হচ্ছে না কি?

জগতের যত কিছু বাহ্য সৃষ্টি সবই বাহ্য জিনিস থেকে হয়ে থাকে, তথাপি ভগবানের শক্তির কাজ রয়েছে সব কিছুরই পিছনে। মানুষে যা কিছু আবিষ্কার করে, টাকাপয়সা বা দলিল কাগজ নোট প্রভৃতি, সমস্তই তো একটা শক্তিকে প্রকাশ করবার জন্য, একই ক্ষমতার অভিব্যক্তির জন্য। তা ছাড়া আর কি। তাই তো বলছিলাম যে শক্তি কখনো নিজেকে প্রকাশ করে না, মানুষই তাকে নিয়ে রূপ দিয়ে নানা ভাবে কোনো অর্থে প্রকাশ করে। যেমন দেখ, এমন সব দেশও আছে যেখানে টাকা পয়সার কোনো চল নেই, কেবল ঝিনুক

দিয়ে জিনিসের দাম ও আদানপ্রদান চলে। এমন দেশ নিয়ে একজন গল্প লিখেছে যে সেখানে সেই উত্তরপ্রদেশে যার কাছে যত বেশি মাছধরা বঁড়শি সংগ্রহ আছে সে তত বেশি বড়লোক বিবেচিত হয়। বঁড়শি কাকে বলে জানো তো? ছিপে বেঁধে যা দিয়ে মাছ ধরা হয়। সেই রকম ভাবে তৈরি বঁড়শি যার কাছে অনেক বেশি সে হলো সেখানকার কোটিপতি।

সব কিছুই যারা নিদর্শন মাত্র যার পশ্চাতে আছে আসল শক্তি। সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন আকারে সেই শক্তিরই অভিব্যক্তি। যেমন ধরো সোনা, সকল রকম ধাতুর তুলনায় সোনাই সব চেয়ে কম ক্ষয় হতে পারে, তাই ওর দাম হয়েছে সব চেয়ে বেশি। নিরবধি কাল সোনাকে অম্লানভাবে সঞ্চয় করে রাখা যায়। এ ছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই। আর যখনই কোনো নতুন স্বর্ণখনি আবিষ্কার হয়, তখনই সোনার দাম মানুষদের কাছে কিছু কমে। যখন যেমন অবস্থা সেই অনুযায়ী ওর দাম কমে বাড়ে। ওর শক্তি এমন যা সব আকর্ষণ করতে পারে, কিন্তু তা ওর নিজের শক্তি নয়, পিছনে রয়েছে উচ্চশক্তির কাজ।

অর্থশক্তি ব্যবহৃত ও প্রযুক্ত হয় একটা নির্দিষ্ট প্রথা ও রীতি অনুযায়ী। এখনকার দিনের অর্থ মানে হলো কতকগুলি কাগজের টুকরা যার উপরে সংখ্যাবাচক অক্ষরাদি ছাপ দেওয়া থাকে, যদিও সে কাগজ এমন নষ্ট ও মলিন হয়ে যেতে পারে যাতে শুধু যত্নে তখন আগুন ধরাবার কাজে লাগা ছাড়া আর কিছু হবার নয়। অথচ যত্নে রাখলে সেই কাগজটির দাম এত বেশি যে তাকে এক পরম সম্পদ রূপে গণ্য করা চলতে পারে। এর কারণ কি? কারণ শুধু এই যে সংসারে সেই দামেই তা খাটছে এবং সকলেই তার সেই মূল্যকে স্বীকার করে। কিন্তু অধিকারী না হয়েও কেউ যদি সেই অর্থমূল্যবাহী শক্তিকে আয়ত্তে এনে কোনো ভগবদ্‌মুখী মঙ্গলের কাজে নিয়োগ করতে পারে তাহলে বস্তুত তার অন্তর্নিহিত শক্তিকেই সে ঐ কাজে লাগায়।

ফরাসী ভাষাতে অর্থকে বলা হয় argent। আবার এই 'আরজঁ'-শব্দটি একটি বিশেষ ধাতুরও নাম, সে ধাতু দেখতেও সুন্দর, নমনীয় ধাতুসহ, সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। তাতে মর্চেও ধরেনা। তাই ঐ নামটি যাবতীয় অর্থকেও দেওয়া হয়েছে। তাই সকল রকমের অর্থ-মাত্রকেই বলা হয় আরজঁ, তা সোনাই হোক বা কাগজে লেখা নোটই হোক। আবার যেখানে প্রভূত ধনসম্পদের ব্যাপার, যা নোটের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, সেখানে যথাযোগ্য সংখ্যার পর সংখ্যা চাপিয়ে যে বিশেষ লেখ্য কাগজ রচিত হয় তাকে বলা হয় দলিল (ডকুমেন্ট)। সেই দলিলের ক্রিয়াতে তার মূল্য দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ বা দশগুণ হয়ে যেতে পারে, আবার অন্য অবস্থাতে তা শূন্যও হতে পারে। এই দলিলের মারফতে বাস্তবের সব কিছু জিনিস, যেমন তুলো, চিনি, শস্যাদি, কফি প্রভৃতির যত খুশি বেচাকেনার কাজ চালানো হয়, অথচ সেখানে আসল জিনিসগুলির সাক্ষাৎমাত্র নেই,—জিনিস রইল উহ্য, কেবল লেনদেন হচ্ছে কাগজের মাধ্যমে। এই ভাবে তুমি হয়তো লাখ লাখ টাকার মালগুলো কিনে ফেলতে পারো, সে মালের একটা টুকরো হাতে না ধরে,—কেবল কাগজেই লেখা হলো। আবার পরে তা ঐ ভাবেই বেচতেও পারো। সে সময়ে যদি তুলোর দর আগের চেয়ে বেড়ে যায় তাহলে সেই কাগজ বেচে তুমি যথেষ্ট লাভবান হবে, আর দাম কমে গেলে লোকসান খাবে। অথচ তুমি হাতে এক বিন্দু তুলোও ধরোনি, কিংবা নগদ

টাকাটাও পাওনি। সব কিছুই হয়ে যাচ্ছে কাগজের মধ্যে (হেসে উঠলেন), আর এটাই হলো এখনকার দিনের প্রচলিত পদ্ধতি।

প্রশ্ন : মা, আমার নিজের এই স্বতন্ত্র আমিত্ব জিনিসটা কেমন ক'রে ভগবানের চেতনাতে মিলিয়ে দেওয়া যাবে?

উত্তর : মিলিয়ে দেওয়া?

প্রশ্ন : হাঁ, এই আমি বোধ জিনিসটা ভগবৎ চেতনার মধ্যে তলিয়ে দেওয়া?

উত্তর : বুঝলাম না, তলিয়ে দেওয়া কাকে বলো?

প্রশ্ন : নিজের চেতনাকে তাঁর মধ্যে বিলীন করা।

উত্তর : হাঁ, ঠিক বলেছ। অর্থাৎ ভগবৎ চেতনার মধ্যে নিজের অস্তিত্ব চেতনাকে হারিয়ে ফেলা।

তার জন্যে, প্রথম কথা সেই জোর ইচ্ছাটি তোমার মধ্যে জেগে ওঠা চাই। তার পরে অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রবল আস্পৃহা করতে থাকা চাই। যতবারই তোমার আমি ভাবটি এসে পড়বে ততবারই তৎক্ষণাৎ তার নাকের উপর ঘুষি মারবে। (মা আপন নাকের উপর আঙুল দিয়ে ঠুকলেন) বারে বারে এইভাবে ধাক্কা খেতে খেতে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ঐ অভ্যাসটিকে ছাড়তে বাধ্য হবে।

সাধারণত সকলেই ওকে ঘুষি মেরে না সরিয়ে দিয়ে বরং ওকে সমর্থন করে। সকল সময়েই, ঐ অহং জোরদার হয়ে উঠলে তারা বলে "ঠিকই কাজ হচ্ছে।" সেই অহংটিকে যে স্বয়ং নিজে বলেই ভাবছে, এ কথা তারা মানতেই চায় না। কিন্তু আমাদের প্রথম কাজই হবে ঐ অহং বোধকে প্রবল হতে না দেওয়া, এলেই তাকে তাড়িয়ে দেওয়া। তোমাকে নিশ্চিতভাবে বুঝতে হবে যে ঐরূপ মনোভাবটি থাকবার এখন কোনো দরকার নেই। কিন্তু তা বোঝা বড় সহজ নয়। মাথার মধ্যে যতই কেন আওড়াতে থাকো "আমি ও চেতনাকে চাই না, আমি ভগবান থেকে আলাদা হতে চাই না,"—ততবারই ভিতরে ভিতরে সেই চেতনাটি টিঁকে থাকবে, জীবন থেকে তাকে একেবারে বাদ দেওয়া যাবে না। আর হঠাৎ তুমি পূর্বস্বভাবমত অহংপূর্ণ কাজগুলোই বেমালুম করতে থাকবে, তাতে তোমার মনে তখন কোনো দ্বিধা সংকোচই আসবে না।

অতএব আগে তোমাকে ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে ওর মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে। এই চেষ্টার মধ্যে কয়েকটা বিভিন্ন ধাপ আছে। প্রথম চেষ্টা হবে এই যে আমি যেন কেবল আত্মসুখী না হই। কিন্তু একথার যথার্থতা বোঝা চাই। এ বিষয়ে ইংরেজীতে দুটি আলাদা শব্দ রয়েছে, একটি হলো selfish (অর্থাৎ স্বার্থপর), আর একটি হলো egoistic (অর্থাৎ আত্মপর)। এ দুটি একেবারে স্বতন্ত্র ভাবের ব্যঞ্জক। ফরাসীতে এমন নেই। সে ভাষাতে বলা হয় কেবল এই, "আমি আত্মপর হবো না।" কিন্তু তা বড়ো কথা হলো না। কিন্তু তারা ঐ কথা বলে মনে করে যে আমি খুব উন্নত। কিন্তু সেটা হলো নিতান্ত হাস্যকর কথাই কারণ ওর পিছনে হাস্যকর ভাবে সেই অহংটাই রয়েছে।

তুমি দেখতে পাবে যে ঐ কথা বলে ওরা নিজেকেই ভাবছে, নিজের দিকে চেয়ে আপন ক্ষুদ্রসত্তার দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে, নিজেকেই কেন্দ্র করে সারা বিশ্বকে এমন কি ভগবানকে পর্যন্ত দেখতে চাইছে, নিজেকে ঘিরেই সব কিছু,—যেন তারই মূল্য সব চেয়ে বেশি! তুমি যদি আয়নাতে দেখার মতো ক'রে নিজেকে তফাৎ থেকে দেখতে পাও তখন বুঝবে যে ওটা কতখানি আহাম্মুখী (না হেসে উঠলেন), আসলে আগে ঐটুকু তোমার বোধে আসা চাই। তখন জানবে যে কতটাই হাস্যকর তুমি হয়েছিলে।

আমার মনে পড়ছে টেগোরের রচিত একটা বর্ণনার ফরাসী অনুবাদে পড়েছিলাম, একটা বিশেষ কথাচিত্র। সেটি এক কুকুর বাচ্চার সম্বন্ধে—সমস্তটা মনে নেই—এইটুকু মনে আছে যে কুকুরটি তার মনিবের কোলে বসে ভাবছে যে দুনিয়ার মধ্যে তারই গুরুত্ব সব চেয়ে বেশি। এটা প্রকৃতই হয়ে থাকে। আমি নিজেও জানি এমন কুকুরের কথা। শুধু কুকুর কেন, প্রায় সকলের বেলাতেই তাই। তারা চায় যে সকলেই তাদের দিকে চেয়ে থাকুক ও তারিফ করুক, লোকে তাদেরকেই সর্বদা খুশি করুক, আর সে রকম ইচ্ছা সফল করেও নেয় তারা। শুধু কুকুর নয়, একটি মানবশিশুও ঠিক ঐরকম ভাবে।

তোমরা কি দেখনি যে এতটুকু একজন ছোট্ট শিশু (না নিজের হাত দিয়ে দেখালেন কত ছোটো) যেমনি সামনে এসে হাজির হলো অমনি তোমাদের সব কিছু কাজকর্ম ঘুচে গেল? আগে হয়তো তোমাদের মধ্যে বিশেষ দরকারী কোনো আলোচনা হচ্ছিল, কিন্তু শিশুটিকে দেখেই তোমাদের মুখে হাসি ফুটে উঠল, তার সঙ্গে শিশুর মতো ক'রে কথা বলে তাকে দিয়ে কথা বলাতে চেষ্টা শুরু করলে? অন্য সব প্রসঙ্গ থেমে গেল, কেবল ওকে নিয়েই তোমরা মশগুল হলে? এই দেখে সেই শিশু মনে করে যে জগতে তার উপস্থিতিটাই সব চেয়ে দামী, সকল লোকের নজর কেবল তারই দিকে। এমন হওয়া স্বাভাবিক।

কুকুর ছাড়া বিড়ালবাচ্চা প্রভৃতি অথবা ছোটো সব রকম কিছুর সম্পর্কেই এমনি হয়, অর্থাৎ নিজের চেয়ে ছোটকে ও দুর্বলকে আগ্‌লে ফুস্‌লে রাখার ইচ্ছা। ঠিক এই ভাবেই তুমি নিজের ভিতরকার দুর্বল ও ছোট ঐ অহংটিকে তোয়াজ ও তোষণ করে রাখতে চাইবে।

নিজের ভিতরকার ক্ষুদ্র ও দুর্বল এই অহং সত্তাটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে মনে সন্তোষ অনুভব করবে, মনে হবে বেচারার নিজের কিছু ক্ষমতা নেই তাই তাকে তুমি ঐভাবে আগ্‌লে রাখছ। তোমার উদার আশ্রয়ে আড়াল করে রেখে তুমি তাকে চূর্ণ ক'রে ফেলতে চাও না।

সেই উদারতার প্রথম ক্রিয়া তোমার মধ্যে এইভাবেই হবে। তারপর যখন একটু উপরে উঠবে তখন দেখবে যে আসল ব্যাপার কি, ওর পিছনে কি আছে জেনে ঐ হাস্যকর অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারবে।

এইভাবে সেই দীর্ঘ অতিদীর্ঘ অহমিকার পথটি অতিক্রম করতে পারলে তবেই শেষে অহংমুক্ত হয়ে তখনই ভগবানের চেতনার সঙ্গে মিলতে পারা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে।

নিজেকে ভগবানের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া? কিন্তু তার আগে তোমার সেই মূল ব্যক্তিত্বটুকু যদি পূর্ণ বা পাকা রকমের না হয় তাহলে সেটা কেমন করে হতে পারে? এই পুরো পাকা ব্যক্তিত্ব বলতে কি বোঝা যায় জানো—যা বাইরের সব কিছু প্রভাবকে ঠেলে ফেলতে পারে।

এই কিছুদিন আগেই একজন চিঠি লিখে আমাকে জানালে যে আজকাল নাটক নভেল প্রভৃতি পড়তে তার ভয় করে, কারণ তা পড়লেই তার চরিত্রগুলির সঙ্গে সে এমন একাত্ম হয়ে পড়ে যে তাদের সমস্ত সুখ দুঃখ, ব্যথা বেদনা ও কামনা বাসনা ও আদর্শ প্রভৃতি সে নিজের মধ্যে অনুভব করতে থাকে। এ কেবল একজনেরই ভিতরকার গলদ নয়, এখন অনেকের প্রকৃতিই এইরকম দুর্বল। যেন গলিত তরল মাখনের মতো, একটু আঙুল ঠেকালেই অমনি তার মধ্যে দাগ বসে যায়। তারা নিজেরা জানেনা যে তাদের প্রকৃতির মধ্যে নিরানব্বুই ভাগই এমনি দুর্বল ও নরম।

বস্তুত সব কিছুই ঐরকম দাগ বসাবার মতো, ঐরূপ "আঙুল" হয়ে উঠতে পারে, যেমন কোনো বইতে লেখা চরিত্র, কোনো একটা চিন্তাধারা, অথবা কোনো বাহ্য দৃশ্য, প্রতিবেশীর কোনো কর্ম বা কামনা—এ সমস্তই তোমার মনের মধ্যে ঢুকে জট পাকাতে থাকে (মা তাঁর হাত দিয়ে জট পাকানোর মতো ইঙ্গিত করলেন)। সেগুলির মধ্যে কোনটি বেশি প্রবল হচ্ছে তাই নিয়ে ভিতরে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো যাওয়া আসা করে। যেটা খুব প্রবল হয়ে ওঠে তা নিত্য ভিতরে দাপাদাপি করতে থাকে, অথচ তুমি জানোনা যে কিসের থেকে কি হচ্ছে। ঐ সব ইচ্ছাতরঙ্গ সামলানো সহজ কথা নয়।

তুমি যেন হাল্কা সোলার মতো সমুদ্রে ভেসে বেড়াও, যখন যে ইচ্ছা যেদিকে ভাসাচ্ছে সেই দিকেই ভেসে যাও, কখনো বা আকাশের দিকে চোখ ফেরাও (ইঙ্গিত করলেন)। আর কখনো বা পাতালের মধ্যে তলিয়ে যাও। অস্তিত্ব হয় এইরকম।

অতএব সর্বাগ্রে তোমাকে হতে হবে একটি সজাগ সতর্ক ব্যক্তিত্বপূর্ণ সত্তা যা সকল পরিস্থিতির মধ্যে নিজেকে নিরোট ও অটুট রাখতে পারবে, কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে সংযত হয়ে থাকবে, নির্লিপ্তভাবে সব কিছু পড়তে ও শুনতে ও দেখতে পারবে। তার মধ্যে যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা গ্রহণ ক'রে যা কিছু বর্জনীয় তাকে বর্জন করবে। যখন যেটা নিতে চাইবে শুধু সেটাই নিয়ে নেবে। এমন হলে তখন তখন ব্যক্তিত্ব হবে খাঁটি আর সেটাই তখন হবে নিবেদনযোগ্য, মিলনযোগ্য। নতুবা যা দেবার প্রকৃত অধিকার তুমি পাওনি তা তুমি দেবে কেমন করে? যা তোমার ঠিক অধিকারে আছে তাই তুমি দিতে পারো।

অস্তিত্বটা বাস্তব না হলে তাকে দেওয়া যায় না, অতএব তোমার ঐ স্বাতন্ত্র্যধর্মী মিথ্যা অহং জিনিসটা ঘুচিয়ে দিয়ে নিজেকে ভগবানের হাতে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত করতে পারা চাই। আর সমর্পিত হবার মতো অস্তিত্ব তোমার গড়ে তোলা চাই। সেই অস্তিত্ব গড়ে তুলতে তোমার ব্যক্তিত্বকে আগে সত্য করে তোলা চাই। মনে করো তোমার এই দেহটি যদি এমন চর্মবেষ্টিত ও শক্তপোক্ত সুরক্ষিত না থেকে কেবল মন ও প্রাণ থেকে প্রতিফলন নিয়ে তরল অবস্থাতে থাকতো, তাহলে এখনই জেলিমাছের মতো টল্‌টল্ করতো যে সব কিছুর মধ্যেই মিশে একাকার কাণ্ড ঘটতো। তাই প্রথমেই দরকার একটা শক্ত ও মজবুত কাঠামো। যদিও আমরা এই দেহ সম্বন্ধে নানা অভিযোগ করে থাকি যে, "একে আদৌ নমনীয় ও পরিবর্তনীয় করতে পারার কোনো উপায় নেই, ভগবানের মধ্যে মিশে যাবার মতো নরম ও তরল করা হয়নি এই দেহবস্তু।" কিন্তু তুমি যদি এই দেহ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে প্রাণরাজ্যে গিয়ে পড়তে পারো (তা অনেকে পারে যারা দেহব্যক্তিত্ব ছেড়ে প্রাণব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে) তাহলে দেখতে পাবে যে সেখানে কত রকম শক্তির তরঙ্গ ও স্পন্দন নিত্য জড়াজড়ি বা কাটা-

কাটি করছে। তারা পরস্পরকে ঠেলে হটাতে ও গ্রাস করতে বা দূর ক'রে দিতে চাইছে। ওর ভিতরে আসল যেটি ব্যক্তিত্ব তাকে খুঁজে পাওয়াই কঠিন, কারণ ওগুলি হলো যত কামনা ও বাসনা ও বিচিত্র শক্তির সাময়িক স্পন্দন।

ঐ রাজ্যে ঢুকে যারা আপন প্রাণব্যক্তিত্বকে আটুট রাখে, তারাই হলো বীর, কিংবা তারা অসুর।

তারপর আসে মনের সম্পর্কের কথা। (মা কিছুক্ষণ নীরব রইলেন) তুমি যদি কেবল দেহগত মন সম্পর্কে চেতন হও—কেউ কেউ ওকে বলেছে বারোয়ারি পার্কের মতো, সবাই নিত্য যেমন ওর মধ্যে ঢুকছে বেরোচ্ছে আর ঘুরে ফিরে আসছে। অর্থাৎ নানা মনোভাব এসে এক রাস্তায় ঢোকে, অন্য রাস্তায় বেরিয়ে যায়, কোনো শৃঙ্খলা থাকে না। একটা ভাব এসে অন্য ভাবের কাছে ধাক্কা খায়, হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, তাতে এমন কি দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারে। তখন তুমি তা দেখে বিভ্রান্ত হয়ে বলো আমার নিজের কথা কোনটা, বা নিজের মন ঠিক কোনটা ?

পরম ধৈর্যের সঙ্গে বহু বছরের সংযত সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংগত অনুশীলনের দ্বারা গঠনশীল দীর্ঘ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে উর্ধ্বগান পতনের ভিতর দিয়ে, তবেই নিজের জীবনকে নির্দিষ্ট গন্তব্যে নিয়ে যেতে পারবে।

তুমি মনে করো যে তোমার আপন ভাবনাকে তুমি ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করতে পারো। কিন্তু মোটেই তা হয় না। সবই নির্ভর করে—তুমি যে বই সম্প্রতি পড়েছিলে, যাদের সঙ্গে কথা বলেছিলে, তোমার বর্তমান মনের যেমন মুড বা মেজাজ—এই সকলের উপর। আরো নির্ভর করে অবস্থা বিশেষের উপর—তুমি রয়েছ বন্ধ ঘরে কি মুক্ত বাতাসে, যা খেয়েছিলে তা হজম হয়েছে কিনা, কিংবা বদহজম ঘটেছে,—চোখের সামনে যা রয়েছে তা সুদৃশ্য বা কুদৃশ্য, সূর্যালোক আছে না মেঘে ঢাকা বর্ষা নেমেছে ইত্যাদি। তোমার মনের সঙ্গে এই সব কিছুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকলেও তোমার মনোভাবের নানা অদলবদল ওরই দ্বারা হয়ে থাকে, অথচ তুমি জানোনা যে কিসের থেকে কি হলো।

এরই জন্য তোমার উচিত হলো সুদৃঢ় ও সংযত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রীতিতে চিন্তা করতে পারার শক্তি অর্জন করা। আর তার জন্য চাই দীর্ঘকালের চেষ্টা ও প্রস্তুতি। এবং তারই জন্য খুব দৃঢ়চিত্ত হয়ে তোমার বর্তমান ব্যক্তিত্বটিকে বলতে হবে, "এবার তুমি নিজেকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেল, তবেই ভগবানের চেতনার সঙ্গে মেশবার উপযোগী তুমি হবে।" নতুন ব্যক্তিত্বটি যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ উপযোগী হতে তুমি পারবে না। কারণ নিজেকে তুমি নিজের অধিকারের মধ্যে তখনও পাওনি, তুমি ভগবানকে তা দেবে কেমন করে ? এই কথাই আমি আগে বললাম। আবার বলছি।

বস্তুত জগতের এই বর্তমান দিনে তুমি ভগবানকে নিবেদন করতে ইচ্ছা করতে পারো তোমার ঐ দেহটিকে। যদিও কেউ তা করেনা। তুমি হয়তো করতে চাইবে নিবেদন তোমার কর্মকে। কিন্তু তাও তো ঠিক খাঁটি জিনিস হয়না, তার মধ্যে মিথ্যার অনেক ভেজাল থাকে।

তুমি এই দেহসমেতই ভগবানে মিশতে চাইছ কি ? চেষ্টা করে তাই দেখবে ? কেমন করে তা হবে ? মনটিকে আর প্রাণকেও হয়তো তুমি ভগবানে উৎসর্গ করতে পারো,

তোমার মনের ভাবগুলি ও আস্পৃহা ও অনুরাগকেও ভগবানে সমর্পণ করে দিতে পারো। কিন্তু দেহকে তেমনভাবে পারো না। কারণ ও-দেহকে তপ্তকটাহে ফেলেও নূতন করে গলানো যায় না (হেসে বললেন)। অথচ ওকেই দিতে চাইছ এবং বলছো "এটাই তো আমি"। যখন আয়নাতে নিজেকে দেখবে যদিও বিশ বছর আগেকার তুমি আর এখনকার তুমিতে এমন বিস্তর তফাৎ হয়ে গেছে যে চেনাই যায়না, তবু তুমি নিজেকে চিনে বলতে পারছ "এই তো নিশ্চয় আমি অনুকচন্দ্র যমুক" বা পিটার, লুই, আঁদ্রে প্রভৃতি যে কোনো নামে নিজের কাছে পরিচিত। (নীরব থেকে আবার বললেন)—প্রতি সাত বছর অন্তর যদি নিজেকে দেখতে চেষ্টা করো তো লক্ষ্য করবে যে আগেকার দেহের সমস্ত কোষগুলি আমূল বদ্‌লে গেছে, কেবল বরাবর অভ্যাস আছে বলেই তখনও তুমি নিজেকে সেই আমিই বলে জানছো। কিন্তু বাস্তবিকই তুমি কি এখনও সেই আমি আছো? আগেকার বয়সের ফটো যদি রাখা থাকে, দশ কুড়ি ত্রিশ বছর বয়সের ফটো, তাহলে তাতে পরিবর্তন যেমন দেখবে তা কেবল নিজেকে চেনো বলেই চিনবে, কিন্তু প্রকৃত একই লোকের ফটো বলে সেগুলিকে বলা যায় না। যখন তুমি এতটুকু মাত্র ছোটো ছিলে, আর যখন এতটা বড়ো হয়ে উঠেছ, এই দুইএর মধ্যে কতই তফাৎ হয়ে গেছে।

এত কথা বলছি তা তোমাদের মনকে ঘাবড়ে দিতে নয়, কিন্তু যেহেতু ভগবানের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দেবার কথা উল্লেখ করছো তখন এটুকু আগে ভেবে দেখতে হবেযে তুমি আসলে কতখানি কী। তোমার মধ্যে রয়ে গেছে সেই অহং যার সাহায্য নিয়েই তোমাকে বন্ধনমুক্ত ভারমুক্ত ও স্বাধীন স্বয়ংভর হতে হবে—অর্থাৎ তুমি আর সেই বারোয়ারি পার্কের মতো থাকবে না যেখানে অনবরত কত কিছুর যাওয়া আসার ভিড়। যেমন ক'রে তোমার গায়ের চামড়া তোমাকে সব কিছু থেকে স্বতন্ত্র ক'রে আগলে রেখেছে, তেমনি ক'রে তোমার ভিতরকার ব্যক্তিত্বটিকে স্বতন্ত্র ক'রে আটুট রাখবে, সেখানে অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে সংমিশ্রণ হতে দেবে না।

এর জন্য বহু বছরের প্রয়াস লাগে, যাতে তুমি শুধু আপন ব্যক্তিত্ব নিয়ে সচেতন হতে পারাই নয়, কিন্তু তাকে ভিতরকার চৈত্যসত্তার মধ্যে কেন্দ্রস্থ করা চাই—তাহলে যাকে আগে "আমি আপনি" বলে চেতন হয়েছিলে তাকে সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ সজ্ঞান সুনির্দিষ্ট এক পরিণত দিব্যসত্তা বলে অনুভব করবে। সে তখন আপনা হতেই ভগবানের কাছে নিবেদিত হবে (হাতে সেইরূপ ভঙ্গী করলেন) আর তখন তুমি ওর সঙ্গে সঙ্গে তোমার যাবতীয় সকল অংশকেই নিবেদন করতে পারবে। আর ভগবানও যেমনি দেখবেন যে তোমার ব্যক্তিত্ব পরিণতি পেয়েছে তখন তোমাকে সুযোগ ও অনুমোদন দেবেন তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। তখন তাই কেবল ভগবান ভিন্ন তুমি আর আলাদা তুমি থাকবে না।

অর্থাৎ এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত দেবার মালিক হচ্ছেন তিনি। তার আগে তুমি নিজেকে প্রস্তুত করে তুলবে, পূর্ণচেতন হয়ে তাঁর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকবে।

কিন্তু ওর পরেও অহং থেকে যায় আর সেই অহংই ক্রমশ তোমার ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলে। আর তখন ভগবানকে ডেকে তুমি বলবে, "এখন আমি প্রস্তুত, নেবে কি তুমি আমাকে?" আর তিনিও বলবেন, "হাঁ, নেবো।" ব্যস্ সব ঠিক হয়ে গিয়ে তুমি ভগবানের কাজের যন্ত্র হয়ে পড়বে। তবে যন্ত্রের মতো প্রস্তুতি চাই।

এই যে তোমাদের স্কুলে পাঠানো হয়, ব্যায়াম শিখতে বাধ্য করা হয়, এ কি তোমাদের জব্দ করা হচ্ছে বলে ভাবো ? তা তো নয়, তার দরকার হয় তোমাদের দেহ যন্ত্রকে মজবুত ও তৈরি ক'রে তোলার জন্য। সেজন্য ওগুলি অপরিহার্য, ওতেই নিজেকে তৈরি করতে শিখবে। আর যদি তা না করে স্বেচ্ছাবৃত চলতে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে ঘরের কোণে বসে কোনোদিনই কিছু পারবে না। কেমন ক'রে কোন জিনিসটা করতে হয় তা শিখিয়ে দেওয়া দরকার, নিজের থেকে কোনো কিছুই করা যায় না। তারই কারণে গোড়া থেকে ধাপে ধাপে তোমাকে অগ্রসর হতে হবে। আর নিজের থেকে তা করতে চাইলে কেবল শিখতে শিখতেই জীবন পার হয়ে যাবে। তাই যারা অনেক শতাব্দীর অভিজ্ঞতাকে একত্রে অর্জন করেছে তারাই কেবল তোমাকে বলতে পারবে, "যদি কয়েকটা বছরের মধ্যেই ফল পেতে চাও তাহলে এই এই রাস্তাকে ধরে চলো।" অতএব তোমাকে অনেক পড়তে হবে, শুনতে হবে, কার্যক্ষেত্রে শিখে নিতে হবে যে এটা এইভাবে আর ওটা ঐভাবে করা চাই (মা হাতের ভঙ্গী করলেন)। এইভাবে প্রথম খানিকটা শেখা হয়ে গেলে তখন নিজের থেকেই নিজের সমুচিত উপায় মিলে যাবে, যদি তেমন পটুত্ব থাকে। আগে পায়ের উপর দাঁড়াতে শেখো তবে তো হেঁটে চলা সম্ভব হবে। সকলের পক্ষেই এই কথা, তাই শিক্ষা নেওয়া সকলের পক্ষেই অনিবার্য।

(একটি শ্রোতার প্রতি) তোমার কিছু প্রশ্ন ছিল না ? না ? তবে আর কারো আছে ?

প্রশ্ন : না, সেদিন আপনি বললেন যে আমাদের মধ্যে একটা অন্ধকারময় কালো অংশ থাকে যা আমাদেরকে দিয়ে যত বোকামীর কাজ করিয়ে নেয়। আপনি বললেন যে চিনে নিয়ে সেই অংশকে নির্মূল করা উচিত। কিন্তু আমি যদি চিনতে পেরে জোর করে তার বোকামির নির্দেশগুলোকে প্রত্যাখ্যান করি তবে তাতেই কি তাকে ব্যর্থ বা নির্মূল করা হয়না ?

উত্তর : সেই সব বোকামির কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়ে ?

প্রশ্ন : যদি ইচ্ছার জোরে তার কথা শুনতে রাজী না হই ?

উত্তর : হাঁ, হাঁ।

প্রশ্ন : তাহলে কি বলা চলে না যে সে অংশকে ছেঁটে ফেলা হলো ?

উত্তর : ওতে কেবল তাকে চেপে রাখা হলো।

প্রশ্ন : তাহলে তাকে একেবারে ঘোচাতে পারার কি উপায় ?

উত্তর : তার জন্যে প্রথমে তাকে চিনে নিতে চোখের সামনে তাকে হাজির রেখে তোমার চেতনার মধ্যে তার যে সব শিকড়ের বাধা জড়ানো হয়েছে সেগুলিকে কেটে ফেলতে হবে। এটা হলো ভিতরকার মনস্তত্ত্বের ক্রিয়া।

খুব মনোযোগের সঙ্গে নিজেকে নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণ করতে থাকলে ওগুলো

দেখতে পাওয়া যায়। যেমন ধরো, লক্ষ করতে থাকলেই তুমি দেখবে যে কোনোদিন তুমি অত্যন্ত উদার হয়ে সকল কিছুতেই উদারতা দেখাচ্ছ আর অন্যদের সব কিছু দোষ ত্রুটি ও নোংরামিকেও ক্ষমার সঙ্গে মেনে নিয়ে বলছ, তা হোকগে যার যেটুকু সাধ্য সেই টুকুই তো সে করবে।" আর অন্য কোনোদিন অথবা কিছুক্ষণ পরেই তুমি হঠাৎ কঠিন ও নির্মম ও ক্ষমাহীন হয়ে সব কিছুরই কঠোরভাবে বিচার করছ, অন্যায়কারীকে ক্ষমা না করে শাস্তি দিতে চাইছ, তার কাজের তীব্র প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা হচ্ছে। অর্থাৎ আগে যেমন মনোভাব ছিল তার ঠিক বিপরীত। একদিন হয়তো কেউ তোমার খুব ক্ষতি করলেও বলো, "যাক সে বেচারা জানতো না", কিংবা "ঐ ছাড়া আর কি করবে", কিংবা "ঐ রকমই যে ওর স্বভাব," অথবা "না বুঝে করেছে"। আবার পরের দিনই কিংবা ঘন্টা-খানেক পরেই হঠাৎ রেগে উঠে বলতে থাকো "ওর শাস্তি হওয়া দরকার, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ওকে, ওর এটা নিজের মালুম হোক যে কী অন্যায় সে করেছে।" তখন তুমি স্বার্থপরই হয়ে উঠেছ, হিংসাদ্বেষ সংকীর্ণতা প্রভৃতি সব কিছু তোমার মধ্যে এসে গেছে।

ঐ হচ্ছে তোমার কালো অংশটা। ওটা যেমনি দেখবে অমনি তুমি বলবে, "না, এ কখনই আমি নয়," এই বলে উজ্জ্বল আলোর অংশের মুখোমুখি তাকে দাঁড় করাবে আর বলতে থাকবে, "ঐ কালো ছায়াটা সরে যাক।" তবে জোর ক'রে হটাতে চেষ্টা না করে নিজেকে শান্ত থাকতে বাধ্য ক'রে জ্ঞান ও আলোর সাহায্য নেবে আগে নিজেকেই ওর থেকে সরিয়ে নিয়ে তার পরে এমন ক'রে ওকে সরাবে যাতে আর না ফিরে আসে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওকে পাল্টে ফেলাও সম্ভব হয়, আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওর উপরে এমন জোর জ্ঞানের আলো প্রযুক্ত করা যায় যাতে তোমার ভিতরকার প্রকৃত সত্তাটি বিশুদ্ধভাবে বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু সহজে এমন হয়না, হতে পারে খুবই বিরল ক্ষেত্রে। অপরপক্ষে মন থেকে তুমি বলবে, "ও জিনিস চাইনা আমার সত্য প্রকৃতির সঙ্গে ওর সম্পর্ক নেই, ওটা চলে যাক," এই ভাবে প্রত্যাখ্যান করতে করতে শেষে নিজে ওর থেকে পৃথক হয়ে যাবে।

অবশ্য তার জন্যে গোড়া থেকেই পুরোপুরি ঐকান্তিক হয়ে ভিতরকার দ্বিধাদ্বন্দ্বকে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পারা চাই। সাধারণ মানুষ ঐগুলোর দিকে নজরই দেয় না। মনো-ভাবের একপ্রান্ত হতে বেমালুম চলে যায় অন্য প্রান্তে, অর্থাৎ একদিন ভাবি আমি তো খুব ভালো, আবার অন্যদিন ভাবি মন্দ—যেন এটাই স্বাভাবিক। এখন হয়তো উদার আবার এক ঘন্টা পরেই হয়ে গেছি কুটিল ক্রূর। সারা দিনটা হয়তো বেশ খুশিতেই কাটলো কিন্তু শেষ মুহূর্তে সব বিগড়ে গেল। কি পরিবর্তন হচ্ছে তা কেউ লক্ষ্য করতে পারে না। হঠাৎ মনের মধ্যে যত কুটিল কুচিন্তা, ঘৃণা বিদ্বেষপূর্ণ বিকৃতি এসে উপস্থিত হয়।

সাধারণ জীবনে এ সব জিনিস লক্ষিত না হলেও তোমার এগুলিকে তখনই ধরতে পারা চাই যতবার আসবে, শক্ত করে ধরে নিতে হবে মুঠোর মধ্যে (ভঙ্গী সহকারে বললেন) আর তাকে ভিতরকার আলোর সামনে তুলে ধরে বলবে, "তোমাকে আমি চাই না, চাই না, চাই না, তুমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে, আর কখনো ফিরে এসো না।"

(নীরব থেকে) এ এক রকমের অভিজ্ঞতা লাভ, যা প্রত্যহই এবং বহুবারই ঘটতে পারে...তুমি হয়তো প্রবল উৎসাহ নিয়ে আস্পৃহার জোরে ভগবান ও ভগবৎ কর্মের দিকে

স্থির লক্ষ্য রেখে তীব্র অনুরাগে ও শক্তিতে ও আনন্দে অভিভূত হয়ে কিছুক্ষণ তাতেই মগ্ন থাকবে, তারপর কয়েক ঘন্টা কেটে গেলে তখন সে ভাব জুড়িয়ে গিয়ে অনুভব করবে যে তুমি কত ক্ষুদ্র, কত সাধারণ, কত তুচ্ছ সংকীর্ণমনা, আত্মসর্বস্ব, ব্যর্থ বাসনার সমষ্টি—তোমার সেই পূর্ব অভিজ্ঞতা কোথায় তলিয়ে গেছে। দেখতে পাবে যে আগেকার সেই বিশ্রী বিকৃতিগুলো জমা হয়ে রয়েছে ভিতরে। কিন্তু তখন আর সেগুলোকে তোমার আপন চেতনার সঙ্গে মিশে যেতে দেবেনা, তফাৎ ক'রে রেখে ওর কালো ছায়ার উপর ভিতর-কার আলো নিক্ষেপ করবে। তাহলে ক্রমশ সব সোজা হয়ে আসবে।

আচ্ছা, এখন যাবার সময় হলো। আর কিছু জরুরী প্রশ্ন আছে?

প্রশ্ন মধুময়ী মা

উত্তর: হাঁ, বলো।

প্রশ্ন অন্য দিকে এই মনের তরফের ঝোঁক, আর প্রাণের তরফের ঝোঁক, যোগের পক্ষে এই দুইএর মধ্যে কোনটি বেশি মারাত্মক?

উত্তর যৌন আছে তোমার মধ্যে সেটাই মারাত্মক (হাস্য)।

৪ আগস্ট ১৯৫৪

(প্রশ্নগুলি করা হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের The Mother বইখানির ভিতরকার কতকগুলি তথ্য নিয়ে)

প্রশ্ন: মধুময়ী মা, দাস আর সেবক, এ দুইএর কি পার্থক্য?

উত্তর খুব বেশি পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। দুইই প্রায় একই জিনিস, তফাৎ কেবল মনোভাবের। দাস মনোভাবের মধ্যে স্বহস্তে সেবা করার আনন্দ আছে, আর সেবকের আছে কর্ম করতে পারার আনন্দ। আর সে কর্ম যদি হয় তাঁরই কর্ম, তাতে আরো বেশি আনন্দ।

প্রশ্ন এই "আত্মপ্রেম" কথাটির অর্থ কি?

উত্তর: ঐ কথাটা বোধ হয় অহংভাবকে একটু নরম ক'রে বলা হয়েছে। ওর অর্থ নিজেকেই সব চেয়ে বেশি ভালোবাসা। ওর ভিতরকার আত্মম্ভরিতা তখনই প্রকাশ পায় যখন তুমি দেখ যে তোমার কাজে কেউ বাহবা দিচ্ছেনা, তোমার ন্যায্য মূল্য দিচ্ছে না, গুণের মর্যাদা দিচ্ছে না, তোমার সুখ্যাতি করছে না, প্রাপ্য পুরস্কার দিচ্ছে না, তোমাকে গ্রাহ্য করছে না, তুমি যতটা মান খাতির পাবার প্রত্যাশা করেছিলে তা না পেলেই তুমি ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ো, তার থেকেই ও জিনিস প্রবল হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন মধুময়ী মা, "সক্রিয় একাগ্রতা" কাকে বলে?

উত্তর যা নিষ্ক্রিয় অলস একাগ্রতার ঠিক বিপরীত। সক্রিয় একাগ্রতা হলো উৎসাহ

আগ্রহপূর্ণ ইচ্ছার কাজ, যার জোরে তুমি সর্বদাই চেষ্টা ও উন্মুখ ভাব নিয়ে থাকো। আর কোনো কিছু কাজ না ক'রে শুধু নিশ্চল ভাবে চুপচাপ থেকেও একরূপ একাগ্রতা হয়।

প্রশ্ন মা, আপনি আপনার Words of Long Ago বইখানিতে বলেছেন যে প্রচুর আত্মবিশ্বাস না থাকলে আমরা নিজেদের দুর্বলতাকে ন্যায্য বলে সমর্থন করি। তা হয় কেন?

উত্তর হুঁ। নিজের সবরকম দুর্বলতাকে ন্যায্য বলে মনে করা? ওর কারণ আত্ম-বিশ্বাসের অভাব নয়, কিন্তু ভগবৎ কৃপার শক্তিতে যে সব কিছুই সম্ভব এই বিশ্বাসের অভাব। আর কেবল জড়তা ও অলসতাকে প্রশ্রয় দিয়ে আমরা দুর্বলতাকে ঠিক কাজ বলে মেনে নিই।

তুমি যেমন রয়েছো তার থেকে নিজেকে তফাৎ নিতে যখন চাওনা তখনই বলতে থাকো,—"তা করতে পারা অসম্ভব, সাধ্যের অতিরিক্ত তেমন শক্তিই আমার মধ্যে নেই।" ওটা গোঁড়ামি ছাড়া অন্য কিছু নয়, শুধু চেষ্টাবিমুখতা। উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে কেউ বললেই অমনি তুমি বলবে, "আমি যে অতি ক্ষুদ্র প্রাণী, কোনো সামর্থ্য নেই, অত চেষ্টা করা আমার ক্ষমতার বাইরে।" আর কিছু নয়, একটা আলস্যজনিত ভঙ্গিমা নিয়ে আপন ত্রুটিকে আগলে রেখে জড়ভাব নিয়ে বসে থাকা, পাছে কিছু পরিশ্রম করতে হয়। আর নিজেকে সমর্থন করে বলো, "আমি তো বেশেই রয়েছি, আমি এমনিই অক্ষম মানুষ, এমনি দুর্বলতায় ভরা।" এই সব বলে সাফাই গেয়ে ভগবানের কৃপার কাজকে বাধা দিয়ে তুমি প্রত্যাখ্যান করো। আর তোমার এমন কুবুদ্ধিকেই সঠিক ও ন্যায্য বলে ধরে নাও।

আর কারো কিছু প্রশ্ন আছে? নেই কি কিছু?

প্রশ্ন মধুময়ী মা, এখানে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, "যখন তুমি জানবে বুঝবে ও নিজে অনুভব করবে যে তুমি সাক্ষাৎ মায়েরই অংশ নিয়ে জন্মেছ, আর তাঁরই শক্তিকে এখানে তাঁরই লীলার বিকাশ করতে"—এই লীলা মানে কি, সে কোন লীলা?

উত্তর এই বিশ্বক্রিয়াকেই ভগবানের লীলা বলা হয়। তোমার একে কি একটা মজার খেলা বলে মনে হয় না? তা কিন্তু অনেকেই মনে করে না (হেসে বললেন), তারা বলে যে এর মধ্যে উপভোগ্য কোনো মজা নেই। তথাপি ব্যাপারটা লীলা বলেই উল্লিখিত হয়। আবার এর মধ্যে আনন্দের কিছু না থাকলেও অনেকে বলে, "এ হলো "বিভিন্ন শক্তির সংঘর্ষ ঘটিত লীলা।" যা কিছুই হচ্ছে সবই শক্তিলীলার কাজ। ও কথাটা তুমি সেই অর্থেই নেবে। আসল কথা স্বয়ং ভগবানের দিব্যচেতনাই বাইরের দিকে প্রক্ষিপ্ত ও প্রযুক্ত হয়ে বিশ্বের মধ্যে বিভিন্ন শক্তির লীলাকে প্রকাশ করছে। এ ছাড়া অন্য অর্থ নেই। তবে আমি তোমাদের খেলার মাঠে গিয়ে খেলা বা লীলা করার মতো জিনিসের কথা এখানে বলছি না অবশ্য ওর আরো নানারকম ব্যাখ্যার্থ হতে পারে।

(অন্য শ্রোতাদের প্রতি) তোমাদের কি কিছু বলবার নেই?

প্রশ্ন এর মানে কি হবে—"অহংএর সব কিছু বিকার থেকে নিজেকে তফাৎ ক'রে নেবে"?

উত্তর অহংএর বিকার মানে? (কিছুক্ষণ নীরব থেকে) ভগবানের সত্যচেতনা ও তার নিষ্কলুষতা থেকে ছেড়ে আসা মানেই তো বিকার। যেমনি তুমি অজ্ঞানতা ও অসত্যের মধ্যে নেমে এলে অমনি তো বিকার শুরু হয়ে গেল। সেই অজ্ঞানতা ও অসত্য দিয়েই সারা জগৎ ওতপ্রোত। অতএব এখানে সাধারণ চেতনাতে থাকা মানেই সেই বিকারের মধ্যে বাস করা।

প্রশ্ন না, এখানে লেখা আছে—"যদি তুমি প্রবলভাবে বোধ করো যে কাজটা সম্পূর্ণভাবে তুমি নিজেই করছ তথাপি মনে রেখো যে সেটা মায়ের কাজ মায়ের জন্য করছ তাহলে যখন বই পড়ছি কিংবা মাঠে খেলছি, তাও কি মায়ের বা ভগবানের জন্য করা হচ্ছে বলে মনে করব?

উত্তর নিশ্চয়, তাই তো...

প্রশ্ন : কেমন করে তা হবে?

উত্তর : তা বুঝতে পারা কঠিন নয়। তুমি জানবে যে নিজেকে তুমি ঐভাবে প্রস্তুত ক'রে উপযুক্ত ক'রে তুলছো যাতে ভগবৎশক্তিকে গ্রহণ ক'রে তাঁরই কাজে লাগাতে পারো, তাঁর উপযুক্ত সেবক হতে পারো, এই আশ্রমের কাজেও সাহায্য করতে পারো। ওগুলো তোমার ব্যক্তিগত সুবিধা বা সুখসমৃদ্ধিলাভের জন্য নয়, ভগবানেরই কাজের পক্ষে তৈরি হবার জন্য। তাহলে ওতে আরো যথেষ্ট আনন্দ ও সাফল্য হতে পারবে। আর সাধারণ উদ্দেশ্যের মতো ধারণা নিয়ে যদি চলো, তাতে তত বেশি শক্তির সহায়তা তুমি পাবেনা, আর তেমন আনন্দও মিলবে না।

প্রশ্ন যদি না আমি লংজাম্প দিতে প্রতিযোগিতায় আরো বেশি লম্বা লাফ দিতে পারি, তা ভগবানের কাজে লাগবে কি?

উত্তর অঁ্যা! আমায় মাপ করতে হবে, কিন্তু লম্বা লাফিয়ে তুমি খুশি হবে সেটাই বড়ো কথা নয়, কিন্তু ওতে তোমার দেহটা আরো বেশি সাবলীল ও সুপটু হয়ে উঠছে যাতে ভগবৎ শক্তিকে সাহায্য দেবার মতো যন্ত্রস্বরূপ হচ্ছো, এই কথাই ভাববে।

যা কিছুই কেন করো তা এই উদ্দেশ্যকে মনে রেখেই করবে, নতুবা তোমাদের এখানে এসে থাকার আসল অর্থটাই ব্যর্থ হবে। সেদিন তোমাদের বলেই দিয়েছি যে এখানকার সব কিছু ক্রিয়ার মধ্যে উপরের উচ্চচেতনা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে প্রকাশ পেতে চায়। আর তুমিও যদি তোমার দিক থেকে তাকে গ্রহণ ও প্রকাশ করবার জন্যই সব কিছু করছ এই ভাবে চলো, তাহলে তোমার সে কাজ আরো সুসম্পন্ন ও ফলান্বিত হবে। এটি তো নিতান্ত প্রাথমিক শিক্ষা! এ ছাড়া যে অন্য কিছু উদ্দেশ্য তোমরা ভাবতে পারো তা জেনে আমি আশ্চর্য বোধ করি। ও ছাড়া এই আশ্রমের মধ্যে এত কিছু সুযোগ ও সুব্যবস্থা থাকার অন্য কোনো মানে হয় না। নতুবা জগতে ওর চেয়ে বড়ো বড়ো আরো কত আশ্রম আছে বা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেখানে এমন উদ্দেশ্য নেই।

এখানে তোমরা থাকবার সুযোগ পেয়েছ বিশেষ কারণে, এখানে বিশেষ রকমের

চেতনা লাভ ও উন্নতিলাভের সম্ভাবনা নিয়ে। তার জন্য প্রস্তুত হবার চেষ্টা না করলে সে সুযোগ হারাবে।

এ কথা যে এতদিন এমন স্পষ্টভাবে তোমাদের বলিনি তার কারণ আমি জানতাম যে আপনা হতেই তোমরা তা বোধ করো। বুঝিয়ে বলার কোনো দরকার নেই।

প্রশ্ন : হাঁ মা, উদ্দেশ্যটি তো জানাই আছে, কিন্তু তবু কাজটি করবার সময়ে মনের ইচ্ছা অন্যরকম হয়ে যায়

উত্তর তা ঠিক নয়, কিন্তু...(নীরব থেকে) আচ্ছা, এমনি সাধারণ ভাবে তুমি কি মনে করে থাকো ? ভাগ্যক্রমে বা দৈবাক্রমে বা বাপনায়ের সঙ্গেই তোমরা এখানে হাজির হয়েছ, তাই কি ? জানিনা কি ভাবো,—(হেসে উঠে) অন্যত্র থাকতে যাওয়াও যা, এখানে আসাও কি তাই ?

তোমাদের এখন বয়স বাড়ছে, একটু আধটু বুঝতে শিখেছ। নিজেকে কখনো কি প্রশ্ন করোনি যে এখানে এলাম কেন ? আমি তো মনে করতাম যে স্বভাবতই তোমরা এটুকু বোধ করো যে এখানে থাকার বিশেষ অর্থ আছে, তাই এ নিয়ে কখনো কিছু বলতাম না। এখন জানতে ইচ্ছা হয়—(অন্য শ্রোতার প্রতি) তোমার কি মনে মনে হয় ? কখনো ভেবে দেখেছ কি ?

সেই শ্রোতা মধুময়ী মা, সেদিন আপনাকে তো বলেছি।

উত্তর বলেছ বটে, কিন্তু আবার বলা চলে। (অন্য জনের প্রতি) আর তুমি ? বাপনায়ের সঙ্গে আসতে হয়েছে তাই এসেছ ? (হাসি) আচ্ছা, আর তুমি ?

প্রশ্ন হাঁ মা, তুমি যখন তোমার সেই বাণীটা দিলে "আশ্রমের ছেলেমেয়েদের প্রতি"—তারপর আমি বুঝেছি।

উত্তর শুধু তখন বুঝলে, তার আগে নয় ?

প্রশ্ন তার আগে ঐ নিয়ে ভেবেই দেখিনি।

উত্তর তোমাদের বয়স মোটামুটি কত বছরের মধ্যে ? এই ১৫, ১৬, ২০ বছর পর্যন্ত ? তোমাদের এই লাল গ্রুপের বয়স ১৫ থেকে ২০র মধ্যে তো ? তার চেয়ে ছোটো কেউ এর মধ্যে নেই ?

প্রশ্ন না।

উত্তর : কিন্তু তোরো বছর বয়স থেকেই সকলের চিন্তার কাজ আরম্ভ হয়। সেই সব চিন্তার মধ্যে প্রশ্ন জাগতে পারে—"এই জীবন মানে কি ? আমরা বাঁচি কেন ?" আর এমনও মনে হতে পারে যখন সাধারণ স্থান ছেড়ে এমন এক নতুন জায়গাতে এসে পড়েছ যা অসাধারণ—যে এখানে কেন এলাম ? এতে কি লাভ আছে ? আরো ভাবতে পারো "এখানে এসে পড়ার কারণ কি ? এ ধরণের কথা কেউ কি ভাবোনি ? আমি জানি দুই তিন জনের কথা, তারা বলেছে আমাকে। কিন্তু বাকী সকলে ? (এ প্রশ্ন কখনো মনে হয়নি ? (হেসে উঠে) কেউ জবাব দাওনা কেন ? (হাসি)

(একজনের প্রতি) ভেবেছিলে তুমি ? কোনো জবাব নেই। কেউ কিছু বলতে চাইছ না। আচ্ছা, তাহলে একথায় আর কাজ নেই। (হেসে) এ কথা এখানেই ইতি হোক। তাই তো ?

প্রশ্ন : মা, এটাই তো জানবার কথা, আমাদের মধ্যে এমন কি ছিল যা আমাদের এখানে এনে হাজির করেছে ?

উত্তর : হাঁ, তাই তো জানা চাই যে কি জন্যে তুমি এসেছ। প্রত্যেককেই তা নিজের মধ্যে খুঁজে দেখতে হবে। তুমি তা পেয়েছ কি খুঁজে ? এখনও পাওনি ? তাও তো একটা প্রশ্ন হচ্ছে।

যদি তুমি—(নীরব থেকে)—যদি তুমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে কেন এখানে এলাম তাহলে আপন অন্তরেই তার জবাব হবে—"আমার মধ্যে নিশ্চয় এমন কিছু আছে যা এখানে টেনে এনেছে", সে জবাব বাইরের নয়, ভিতরের। অন্তরের অন্তরতম অংশে রয়েছে সুস্পষ্ট জবাব যা খুবই বিস্ময়কর, (নীরব থেকে) সবকিছু বাহ্য ছেড়ে ভিতরের নিবিড় নীরবতার মধ্যে চলে যাও, সেই গুহার মধ্যে জ্বলছে আলোর শিখা যার কথা প্রায়ই আমি বলি, দেখবে সেখানে তোমার নিয়তিকে। দেখবে যে কত জন্মের পর জন্ম নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হয়ে আসছো সিদ্ধির দিকে। হাজার হাজার বছর পেরিয়ে চলেছ চরম গন্তব্যের অভিমুখে।

তা যখন দেখতে পাবে তখন তোমার সকল দুর্বলতা, তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতার দিকে চেয়ে বলবে যে এটা আসল তুমি নও, এ বাহ্য খোলস মাত্র যা আপাতত কাজে লাগছে। এর উপর আলো পড়লে তখন বুঝবে যে আশ্পৃহা নিয়ে তুমি যুগযুগান্ত অতিক্রম করলে তা পুরো পরিণতির জন্যেই এখানে এসে পড়েছ। শুধু বুঝতে পারাই নয়, জেনো যে এতকালের প্রস্তুতি এবার সার্থক হবে। তা মাত্র এই দেহবস্তুর নয় (যা নিজের চামড়া ধরে দেখলেন) যা কেবল এবারের জিনিস, নয় কি ? কিন্তু সে তোমার ভিতরকার আসল তুমি, যে কত কিছু কাটিয়ে এগিয়ে এসেছে এখনকার এই সুযোগটি লাভ করতে।

তারপর একদিন হঠাৎ ঢুকে পড়বে এক অনির্বচনীয়ের মধ্যে যা আরো কত অসাধারণ...যার জন্যে এতকাল আকিঞ্চন ও অন্বেষণ আবেদন ক'রে আসছো তাই হঠাৎ সেই মুহূর্তে সফল ও সার্থক হয়ে যাবে।

এখানে সে মুহূর্তটি আসবার সম্ভাবনা যেন বিফল না হয়।

আগামী ১৫ই আগস্ট আমি দেবো তোমাদের শ্রীঅরবিন্দের সেই লেখাটি যা এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন The Hour of God. সেটি মন দিয়ে পড়লে সব কথাই বুঝবে।

আজ এই পর্যন্ত।*

—শ্রীমা

* Bulletin of S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

ইউজেনিও মন্তালে

সমীরকান্ত গুপ্ত

শুনুন ভার্জিলের প্রাচীন কণ্ঠ—

Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt...
(There are tears of things and mortalities that
touch the mind)

যে-ভাব শিখরে উঠে যায় তা নিয়ে এ হল চূড়ান্ত ক্লাসিকালের অনবদ্য দৃষ্টান্ত—সকল নশ্বর বস্তুর অন্তরে অশ্রুর প্রলেপ. এই অশ্রু শুধু ভাবেরই বিষয়ে জমাট বাঁধে নি. ভাষাতেও তেমনি সমান ঘনীভূত জমাট—কোথাও শব্দের হেলাফেলা নেই, শুধু শিথিল কিছু নেই. কিছু উনত বা আধিক্য কোথাও নেই. একটি হীরকখণ্ড যেন—পরিপাটি, সর্বাঙ্গসুন্দর, নিখর অশ্রুর এক অপরূপ রূপ। আবার শুনি আর এক ক্লাসিকাল কবির কণ্ঠে ধ্বনিত—

Io no piangeva: si dentro
impietrai: piangevan elli...

আমি অশ্রুপাত করিনি—ভিতরে ভিতরে পাথর হয়ে গিয়েছিলাম—কেঁদেছিল তারাই...

অথবা,

All'alta fantasia qui manco possa
Ma già volgeva mio disiro e'l velle,
Si come ruota che ignalmente è mossa,
L'amor che muove'l sole e l'altre stelle.*

এখানে ভার্জিলেরই সুর টেনে চলেছেন দান্তে—ফরাসীতে এ-পথের পথিক মনে হয়েছে রাসীন (Jean Racine)। ইংরাজীতে এ-রীতির পূজারী মিলটন এবং আমাদের বোধ-হয় মাইকেল। এ এক রীতি—বলা যেতে পারে গ্রীক ভাস্কর্যরীতির সবগোত্রীয়—স্বচ্ছ, সুঘন; অসীমকে সুস্পষ্ট সসীমের মধ্যে ধরে দেখান (প্রাচীন ভারতীয় রীতি এর বিপরীত —সসীমকে অবলম্বন করে সে উঠে গিয়েছে অসীমে), একটা নির্বিকল্প আত্মপ্রত্যয়ে।

---

* Here vigour failed the towering fantasy:
But yet the will roll'd onward, like a wheel
In even motion, by the love impelled,
That moves the sun in heaven and all the stars.

কিন্তু তারপর এল এক বিপর্যয়—রোমান্টিক কালাপাহাড়ের দল। এরা কাব্যজগৎটাকেই ধরে উল্টে দিল। বিষয়কে সম্মুখে রেখে নয়, তাকে স্থাপিত করল অন্তরালে—কবিদৃষ্টি হয়ে উঠল অন্তর্মুখী, ক্লাসিকালে যেখানে ছিল অন্তর্ভেদী। কবি-চেতনায় এবার অনুভূতি জাগ্রত হল যুগপৎ তার পঞ্চতন্ত্রী নিয়ে, চিত্রলিখনে যেমন তুলিকাটিতে শুধু-বর্ণের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে নিল সপ্তবর্ণের বিচিত্র বৈভব। এ-ধারার নবীকবির কণ্ঠে কি আবেগ আবেশ ঘনীভূত শুনুন—

We look before and after,
And pine for what is not:
Our sincerest laughter
With some pain is fraught;
Our sweetest songs are those that tell of
saddest thought.
(শেলী)

এই পর্যায়ে আর এক সুরের অপূর্ব কণ্ঠ শুনুন—

The winds come to me from the fields of sleep.
(ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ)

এ-ধারারই উত্তরসূরী হয়ে এসেছেন ইতালীর নবযুগের কবিরা। উচ্চ প্রশংসিত উদ্গারোক্তি গেয়েছেন—

Il carnato del cielo
sveglia oasi
al nomade d'amore*

কিংবা আরো,

Ma ben sola e ben nuda
senza miraggio
porto la mia anima†

অথবা এই আর একজন আধুনিক কবির—

Antico, sono ubricato della voce
che esce dalle tue bocche quando si schiudono

---

* The incarnadine sky
awakes oases
to the nomad of love

† But how lonely and how naked
without mirage
do I carry my soul

come verdi campane...*

(D'Annunzio)

মিষ্টতা, কমনীয়তা, মাধুর্য, পেলবতা এখানে ছড়িয়ে রয়েছে প্রায় উপচিত মাত্রায়। সমসাময়িক গোৎসানো (Gozzano), কাম্পানা (Campana), সাবা (Saba), স্বারবারো (Sbarbaro) সকলেই এরকম আকুল হৃদয়ের পসারী হয়েছেন। আমাদের কবির স্মরণ করা যাক—

হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে
খুঁজে না পাই কূল...
(রবীন্দ্রনাথ)

সব দেশের কাব্যেতিহাসেই যেমন দেখা যায় ইতালীর কাব্যেও এই রোমান্টিকতায় এক সময়ে ভাটা পড়ে, শুরু হয় গতানুগতিকের পুনরাবৃত্তি এবং ফলত: একটা কৃত্রিমতা। এমন সংকটক্ষণে মন্তালের আবির্ভাব। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত লক্ষ করে দৃষ্টি দেওয়া যাবে তাঁর পুনরুজ্জীবনী প্রতিভার উজ্জ্বল সাক্ষরে।

ইউজেনিও মন্তালে (Eugenio Montale) ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে উত্তর-পশ্চিম ইতালীর সমুদ্রতীরে জেনোয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন অবশ্য কর্তব্য হিসাবে তিনি সামরিক বিভাগে দুই বছরের জন্য যোগ দেন তখন তাঁর বাণিজ্য ও সংগীতবিদ্যা অধ্যয়নে ছেদ পড়ে। তারপর তিনি আরো উত্তরে তুরিনে বসবাস করতে চলে যান, সেখানে গোবেত্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব ঘটে—ইনিই ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ Ossi di Sappia (Bones of Cuttlefish) মুদ্রিত করান। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আসেন নুখর সংস্কৃতির কেন্দ্র ফ্লোরেন্সে এক প্রকাশন-প্রতিষ্ঠানে কাজ পেয়ে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞান-সাহিত্য সভার প্রধান নিযুক্ত হন; ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ফাসিষ্টদলের সদস্য হন নি বলে তাঁর চাকরি যায়। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ Le Occasione (Occasions) ১৯৩৯ সালে মুদ্রিত হয়। ফ্লোরেন্সের মুক্তির পর লোরিয়া ও বেসান্তির সঙ্গে পাক্ষিক পত্রিকা Il Mondo-র যুগ্ম-সম্পাদক হন; ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মিলান থেকে জাতীয় দৈনিক পত্রিকা Corriere della Sera-র (Evening Mail) সংগীত ও সাহিত্য সমালোচক এবং বিশেষ সংবাদদাতা নিযুক্ত হয়ে। বর্তমানেও তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত। তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ La Bufera e Altro (The storm and Others) ১৯৫৬ এবং চতুর্থ গ্রন্থ Xenia নিভৃতে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ বিবিধ প্রবন্ধের Farfalla di Dinard (১৯৬০), Auto da Fé প্রথম খণ্ড (১৯২৫-২৬) শিল্প সাহিত্যের উপর প্রবন্ধমালা (১৯৬৬)। বিদেশী সাহিত্য থেকে কিছু অনুবাদও তিনি করেছেন। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কেম্ব্রিজের সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি পান। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মন্তালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

---

* Ancient one, I am drunk with the voice
that escapes from your mouths when they lift open
like green bells...

ইতালীর কাব্যজগতে মন্তালের আবির্ভাব একটা প্রকৃত সন্ধিক্ষণে। তিনি এক-দিকে রোমান্টিকদের সমসাময়িক—তাদের মতোই লাবণ্যময়ী সৌন্দর্যময়ীর পূজারী—

Your restlessness makes me think
of birds of passage that dash at lighthouses
on stormy evenings:
your mildness, too, is a storm,
it whirls and does not show it,
and its calm are even more rare.*

কিন্তু যে-কারণে তিনি বিশিষ্ট হয়েছেন তা হল এই লাবণ্যের মাধুর্যের কোমলতার মধ্যে তিনি এনে দিয়েছেন একটা দৃঢ় সামর্থ্য—ভাষায় ভঙ্গিতে তাত্ত্বিল-দাস্তের ঐতিহ্য ধরে একটা তপঃসিদ্ধ নিরণ্ড নির্বিকল্পতা—

No senses have I; nor sense. I have no limits.

কিংবা,

So bring me the plant that takes you right
where the blond hazes shimmering rise
and life fumes to air as spirit does...†

অথবা এই আরো Waste Land-এর কবির চংয়ে—

...in air,
was silence high above in the gathered
cry of noon and another morning,
only longer, was evening, the great turmoil
was great rest.

এখানে কবির কলাকৌশল পর্যন্ত নূতন ধারায় চলেছে। এলিয়ট এনেছিলেন যে অসম পংক্তির শাসন তার ভিতরে এক একটা খণ্ড অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ উপলব্ধির প্রবেগ ভরে দিয়ে, গোটা পংক্তিটাকেই একটা অচ্ছেদ্য rhythmয়ে বেঁধে, একটা সত্যের পদক্ষেপ

---

* La tua irrequitudine mi fa pensare
agli uccelli di passo che urtano ai fari
nelle sere tempestose:
è una tempesta anche la tua dolezza,
turbina e non appare,
e i tuoi riposi sono anche più rari.

† Portami tu la pianta che conduce
dove sorgono bionde transparenze
e vapora la vita quale essenza...

যেন—অনুরূপ নবসৃষ্টি মন্তালে দেখিয়েছেন ইতালীয় কাব্যে। এলিয়টের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা শুধু আঙ্গিকের অভিনবত্বেই নয়, ভাবের গূঢ় আকর্ষণেও।

তবে আমার মনে হয়েছে মন্তালের মহত্ত্ব অন্যত্র কোথাও। তাঁর কাব্যে যে গাঢ় গভীরতম সুর বেজে উঠেছে তার কারণ উত্তম রহস্যের মূল ধরে তিনি টান দিয়েছেন। জন্মমৃত্যু বোধ হয় জীবনের চরম জিজ্ঞাসা। আর জীবন মৃত্যুর অন্তরালে তারও উৎস হয়ে আছে কি কোনো জিনিস? এই জিজ্ঞাসা কবিকে ভাবিত করেছে—তাঁর কবিসত্তাকে দিয়েছে এক অনন্য রূপ। তার কাছে স্পষ্ট প্রশ্ন এসেছিল, "Do you know where God is?" ("Sai dove Dio?") উত্তর তিনি জানেন বলেছেন কিন্তু তা লিপিবদ্ধ নেই। রহস্যাবৃত থেকে এই রকমে সিদ্ধ না হয়ে তিনি সাধক হয়ে পড়েছেন—আপ্তকাম না হয়ে পাত্র, ব্রতী ও দীক্ষার্থীর ভূমিকা নিয়েছেন, বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে পথ চলেছেন—

Nowadays we can tell you only this,
what we are *not*, what we do *not* want.*

অথবা,

I am no more
than a spark from a beacon.

কিংবা এখানে এই আরো অকুণ্ঠ ভাষায়—

you belong to him
and don't know it. You're he and you think you're
you.

এই চেতনা নিয়ে কতখানি কবিত্বময় ব্যঞ্জনাময় হয়েছে তাঁর কণ্ঠ—

In the future that opens, the mornings
are anchored in the roadsteds like one fleet.

আবার এখানে,

they deny that the tortoise
may outstrip the lightning's flash.
You alone knew that motion
is nothing different from rest,
that the void is fullness and a clear sky
the most extended of clouds.

---

* Codesto solo oggi possiamo dirti,
ciò che *non* siamo, ciò *non* vogliamo.

এই কবিচেতনা অতৃপ্ত অভীপ্সুর চেতনা, লক্ষ্যসন্ধানীর চেতনা—যা কোথাও থামতে চায়না, যা নিভৃতে অন্তরে বহন করে চলে এক বিরহেরই সুর—

my dream of you has not ended...

আমাদের বৈষ্ণবকাব্যে এই সুরটি তীব্রতম মধুরতম হয়ে উঠেছে। সাধনায় ইষ্ট-প্রাপ্তি শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও সার্থকতা, কিন্তু কবি যিনি তাঁর ভাবলোকে বিরহে যে স্মরণ ও আকুলতা তাতে এনে দেয় এক রকম নিত্যসান্নিধ্য—পূজারের চেয়ে বিরহের পদাবলী তাই এত মর্ম-স্পর্শী—তাতে অভাব এবং ভাবের অপরূপ সম্মীলন। ইংরাজীতে ফ্রান্সিস টমসন এবং ডন্ (Donne) প্রমুখ মেটাফিজিক্যাল কবিরা তার দূর প্রতিধ্বনি। ইতালীর কাব্যে এ-ভাব তার প্রায় আর একটা renaissance—নবজন্ম।

আশ্রমের খেলার মাঠে দীনা—৩য়ে মে, ১৯৫৪

আশ্রমের ফুটবল

সমীরকান্ত গুপ্ত

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে যখন পণ্ডিচেরীতে প্রথম আসি তখন শহরের এই শ্রী ছিল না। দু'চারটি প্রধান সড়ক ছাড়া বেশির ভাগ রাস্তাই খোয়া-বিছানো। এরকম পারদ-বাষ্পের (mercway lamp) আলোর প্রাচুর্য ছড়িয়ে পড়েনি পথে ঘাটে। দূরে দূরে কমশক্তির বৈদ্যুতিক আলোর বালব মলত টিমটিম করে। গভর্ণরের বাড়ির (তখনো রাজভবন নাম হয়নি) সামনে 'প্লাস'টা নিতান্তই অকৃত্রিম গাছপালার সমাবেশ এবং জনতার যদৃচ্ছা ব্যবহারের ক্ষেত্র। সমস্ত শহরে সর্বশাকুল্যে ৩।৪টির বেশি মোটরগাড়ি রাস্তায় চোখে পড়ত না—তার মধ্যে রায়ের একটি সেকালের ক্যানভাস-ছড়ের 'রেনো' (Renault) ছিল। তবে সমুদ্রের বুকে অনেকখানি ছড়ে ছিল সেকালের পীয়েরটি (Piere) জেটি। তাতে বসে হাওয়া খাবার সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। সকাল-সন্ধ্যায় এখানেই ভ্রমণেচ্ছুদের কিছু ভিড় হতো। বলাবাহুল্য এটি আমাদেরও প্রিয় স্থান হয়েছিল। জ্যোৎস্নারাতে এই পীয়েরে বসে সমুদ্রের এক অপরূপ রূপ দেখা যেত—ঢেউয়ের মাথায় ফস্‌ফরাসের উচ্ছ্বাস যেন অসংখ্য দীপ জেলে দিয়েছে। সেই অশ্রান্ত গর্জন আর অনির্বাণ গতির বুঝি তুলনা নেই। এই সাগর-সংগীত সহজেই কবির মন কেড়ে নিতে পারে।

সেই প্রথম যাত্রায় আমরা এসেছিলাম ছ'জন। আমাদের বন্ধু সুরকার ও সঙ্গীতজ্ঞ সুনীল ও তার মা ইন্দুমুখী দেবী, সত্যজিৎ রায়ের মামি স্বচ্ছন্দময়ী কুণ্ডিলি বা প্রতিভা দত্ত, প্রণব, সুনীলের মাসতুতো ভাই অনিল এবং এবং গরীব স্বয়ং। সেকালে মাদ্রাজ মেল হাওড়া থেকে আড়াইটে নাগাদ ছাড়ত। আমরা মাদ্রাজে স্পেন্সারের আতিথ্যে সকালটা কাটিয়ে প্রায় এগারটা নাগাদ এগমোর থেকে ছোট লাইনের ট্রেন ধরে তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় পণ্ডিচেরী পৌঁছাই। আশ্রমে তখন জনসংখ্যা প্রায় শ'চারেক—লণ্ড্রীতে আমার নম্বরছাপ পড়েছিল ১২৫। দেখলাম সকলেরই গায়ে শুভ্র স্বল্পবাস—ধুতি, ফতুয়া বা গেঞ্জীর উপর হাল্কা উড়ুনি। অধিকাংশেরই দীর্ঘকেশ। অনেকের দাড়িও ছিল আবক্ষলুণ্ঠিত—চম্পুলাল, চম্পকলাল, বংশীধর, নন্দগোপাল, কানাই, যোগানন্দ, নরেনদা, বিমল, হীরেন, চারুদা, বই বাঁধাইয়ের বীরেন পালিত, জ্ঞানবাবু, নরেন প্রভৃতি। পরবর্তীকালে খেলাধূলার ঝড়ে এই লম্বা চুল-দাড়ির ঝাড় প্রায় উড়ে গেল। আর এসে সাক্ষাৎ পেলাম দুটি মাত্র বালকের—শান্তিকর ও আগামীর বাবা চোদ্দবছরের দয়াকর এবং পাঁচ বছরের কিট্টু। কিট্টু তখন নাবালকেরও অধম বলে ধ্যানের সময়ে বিকেলে আশ্রমে ঢুকতে পেত না। গেটে অপেক্ষমান তার হাত এড়িয়ে যাবার জন্য নিত্য নানা উপায় উদ্ভাবন করতে হত। সেটা অবশ্য সহজ হত না, যেহেতু বয়স কম হলেও তার বুদ্ধির কমতি ছিলনা আদৌ।

১৯৪৩-য়ের এপ্রিলে যখন দ্বিতীয়বার পণ্ডিচেরী আসি তখন ২।৪জন বালক আশ্রমে এসে পড়েছে—যুদ্ধে আশ্রয়প্রার্থী পরিবারদের অন্তর্ভুক্ত তারা। ১৯৪৪ সালে এপ্রিলের

দর্শন উপলক্ষে যখন ঘরবাড়ির জন্য আশ্রমে এলাম তখন বেশ একটা বালকদল গড়ে উঠেছে। তবে নিয়মবদ্ধ সুশৃঙ্খল খেলাধুলা তখনো নয়। এখন আমাদের যে প্লে-গ্রাউণ্ড তার মাত্র দুই তৃতীয়াংশ আমাদের দখলে—বাকীটা জনৈক ফরাসী পরিবারের সম্পত্তি বা বাস-স্থান ছিল। প্রথমে ওটি বোমা আক্রান্ত চন্দননগরের গভর্ণর ভাদিভেলের পরিবারদের আস্তানা এবং পরে আমাদের সময়ে বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক জুভো দ্যুব্রেইর (Juveau Dubreuil) বাসস্থান ছিল। ওই ছোট্ট মাটিতে প্রচুর কুচিপাথর এবং কাঁচের টুকরো ছিল। সেগুলো সাফ করা হল। কিন্তু পশ্চিমপ্রান্তে গুটি তিনেক পেঁপে গাছ ছিল গোলের দিকে—সেগুলি কাটা বারণ ছিল। সেগুলিকে এড়িয়েই আমাদের খেলতে হত। তবে বলের আঘাত লেগে কিছুদিনের মধ্যেই তারা ধরাশায়ী হল। বলাবাহুল্য গোলপোষ্ট আমাদের হয়েছিল দুটি করে কাঠি এবং ক্রসবার টানা দড়ি। এখানেই আমাদের আশ্রমের খেলা শুরু। প্রায় সকলেরই প্রথম ফুটবল খেলা।

এই মাঠেই আমাদের প্রথম ম্যাচ হল তরুণ আর প্রবীণদের মধ্যে। প্রবীণদের অনেকেরই স্নেহভাজন ছিলাম আমি। তাঁদের পক্ষেই দাঁড়ালাম আমি তাঁদের বিপক্ষে আমার ন্যায্য স্থান ছেড়ে দিয়ে। সেই স্টোরুমের দেয়ালে মেরে অদ্ভুত কৌশলের খেলায় প্রবীণদের হার হল ঘোল গোলে। আমরা একটি কি দুটি গোল পরিশোধ করতে পেরে-ছিলাম। পরে আবার একটি ম্যাচ হয় উভয় দলের মধ্যে—এবার শহরের প্রমাণ মাপের মাঠে, বিখ্যাত Circle Sportif মাঠে (যেখানে একযুগে সক্রা, রয়, বসাক টাউনের লাল-সাদা জার্সিতে অলঙ্কৃত হয়ে করতালি পেয়েছেন)। খেলার ফলাফল হয়েছিল ড্র। বস্তুত প্রবীণরাই একটি গোল দিয়েছিলেন—সেটা অফ্‌সাইডের অজুহাতে নাকচ হয়ে যায়। বলতে পার কে দিয়েছিলেন এই গোল?- আমাদের নীরদদা। কল্যাণদা, ঋষভচাঁদদা, কালীকুমারদাও সুন্দর খেলতেন। উদার, বুলাদা, রাজেনদাও খেলেছেন।

প্লে-গ্রাউণ্ডের ওই তিন চতুর্থাংশ মাঠে—ওখানে ঘাস ছিল না কখনো—আমাদের আর স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। আমরা মাঝে মাঝে খেলতে লাগলাম টেনিস গ্রাউণ্ডে। টেনিস কোর্টের গেট থেকে উইলফির ঘর পর্যন্ত হল আমাদের মাঠ—তবে এখানের কে কোর্টের মতই প্লে-গ্রাউণ্ডের মত অত বালি না থাকলেও ঘাসের চিহ্ন নেই।

এই সময়ে ঘটে বাইরের সঙ্গে আমাদের প্রথম ম্যাচ। প্রফেসর সারাভান (Lambert Saravan), বেড্‌ডিয়ার পালয়মের ধনিক্ষু জমিদার এবং ফ্রেঞ্চ কলেজের অধ্যাপক। এই জাতীয়তাবাদী ভদ্রলোকটি তখন আশ্রমে যাতায়াত করতেন এবং আমাদের সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা ছিল। তাঁরই আমন্ত্রণে তাঁর গ্রামে তাঁর দলের সঙ্গে আমরা খেলতে যাই। আমাদের প্রথম ফুটবল ইউনিফর্ম হল সাদা শর্টস এবং হাতকাটা সাদা সার্ট—সেই সার্টের বাঁহাতে একটি লাল 'ভি' (V) এবং পকেটের উপর একটি লাল পদ্ম। খেলায় আমরা চার-এক গোলে হেরে গেলাম। আমাদের খেলোয়াড়রা অনেকেই এই বড় মাঠে প্রথম নামলেন এবং মারাত্মক গ্রীষ্ম ও খটখটে মাঠও সহজেই তাদের হাঁপিয়ে তুলল। আমাদের এই প্রথম দলের অধিনায়কত্ব করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই প্রথম খেলাটির চাক্ষুষ বিবরণ লিখে মায়ের নির্দেশে তাঁর কাছে পেশ করেছিলেন সেকালের বিপ্লবে শ্রীঅরবিন্দের অনুগামী আমাদের নরেনদা—দর্শনের অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। সেই ইস্কুল

কলেজে একদা প্রচুর খেলেছি, তারপর এক-দেড় বছর বাদে এই আবার শুরু। হার দিয়ে শুরু হলেও কিছুদিন বাদে আবার পালটাম্যাচে ওই মাঠেই আমরা জয়লাভ করি। সেদিন প্রায় আরম্ভেই আমরা এক গোল খাই। এই সময়ে না গিয়ে উপস্থিত হন। বিরতির আগেই আমরা প্রতি আক্রমণ করে সে গোল পরিশোধ করি। খেলা শেষ হবার আগেই মা ফিরে আসেন। তার মধ্যে আমরা আর একটা গোল দিতে পারি।

বলেছিলাম টেনিসগ্রাউণ্ডে ফুটবল খেলার কথা। সমস্ত জায়গাটাই আবর্জনা ফেলবার ক্ষেত্র ছিল। উঁচুনীচু লোনা সমুদ্রতীরে কয়েকটা ছোট গাছ ছিল। সেসব সংস্কার করে আজকের এই মাঠ—তবে ফুটবল ওখান থেকে সরে এসেছে।

আমাদের ফুটবলের ম্যানেজার ছিলেন বাঁজামাঁ (Benjamin)—তিনি থাকতেন 'সাইকেল হাউসে'। আম্রমের সাইকেল বিভাগের কর্তা, ফিলটার জলের কর্তা এবং ছাতা ও তোষক বালিসের কর্তা তিনি। বহুদিনের পুরনো লোক—এককালে সের্কলের সভ্য ও খেলোয়াড় বলেও শহরে বেশ পরিচিত। ফরাসী মহলেও তাঁর জানাশোনা ছিল। বাঁজামাঁ-ই মায়ের অনুমতি নিয়ে আমাদের জন্য পুলিসের মাঠটি সপ্তাহে দু'দিনের জন্য আদায় করলেন, আর দু'একদিন পাওয়া গেল রোডিয়ার মিলের মাঠ। দুটি মাঠেই কিছু ঘাসের আবরণ ছিল—একেবারে নেড়া নয়। পুলিসের মাঠটি (Terrain Militaire) অপেক্ষাকৃত ভালো।

এবার আমাদের খেলা বেশ জমে উঠল। আমরা বাইরের দলের সঙ্গে দু'চারটে ম্যাচ খেলতে লাগলাম এবং বেশ কিছু সুনামই অর্জিত হল। আর একটি এইরকম ম্যাচের কথা মনে পড়ছে—স্থানীয় মুসলিম একাদশের (Jeunesse Musulmane) সঙ্গে (১৮-৩-৪৭)। সেই খেলায় আমাদের দলে ছিলেন অরুণ ও (হৃদয়) দ্যাকর ও সুধীর; নরেন সিং, অভয় সিং ও রবি গুপ্ত, রঞ্জু, হৃদয়কুমার, সুনীল কণক ও অমিয়রঞ্জন। খেলাটিতে আমাদের জয় প্রথম থেকেই। মধ্যে একটি ঘটনা ঘটে। আমাদের ব্যাকে খেলছিল হৃদয়—তার খেলা ছিল ক্ষিপ্রতার, সাহসের ও শক্তির। সে হঠাৎ জনৈক প্রতিপক্ষের একটা অবৈধ আক্রমণে আহত হল—বুড়ো আঙুলের অনেকটা কেটে রক্ত ঝরতে লাগল। তাকে ছুটি নিতে হল। খেলা শেষবার কিছু আগে আমার সঙ্গে একটি হেডিং ডুয়েলে ওই খেলোয়াড়টির কপালের পাশে জখম হল, তারও রক্তপাত, এই খেলাতেও পুলিশ-মাঠে (Terrain Militaere) মা উপস্থিত ছিলেন। খেলার শেষে খেলোয়াড়রা জড়ো হলে মা প্রতিপক্ষের ওই খেলোয়াড়কে বললেন, "Ce nest pas si facile !" অর্থাৎ দেখলে তো, অত সহজে পার পাওয়া যায় না।

আর একটি খেলার স্মৃতি মনে জাগরূক আছে (৮-৬-৪৭)। সেটি ছিল কাডালোরের একটি স্থানীয় দলের সঙ্গে। এবার আমাদের দলে হৃদয়ের বদলে রঞ্জু রাইট আউটে খেলতে নামল। খেলা আরম্ভ হবার পরে মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কালেক্টর ছুটোছুটি করে একটা সামিয়ানা জোগাড় করেছিলেন—পূর্বপ্রান্তে মাঠের মাঝ-বরাবর সেটি খাটানো হয়েছিল। এই ম্যাচেও আমরা বিজয়ী হয়েছিলাম। বড় খেলার কৌশল ইতিমধ্যে আমাদের খেলোয়াড়রা রপ্ত করে নিয়েছে—দমেও তারা অভ্যাসে ও চর্চায় অনেক উন্নতি করেছে। এ সময়ে আমরা আর একটি মাঠ পেয়েছিলাম যথেচ্ছা ব্যবহারের জন্য

স্বদেশী মিলের মাঠ। ভবাপুরীয়ারা এই মিলটি কিনে নেন—ওই ভদ্রলোকের দুই পুত্র রামলাল এবং বাবুলাল আমাদের সঙ্গে খেলতেন এবং সদাশয় ছিলেন।

দুটি টুর্ণামেন্টে আমরা সেকালে যোগ দিতাম। একটি পুলিশের। আমরা যেবার প্রায় নিশ্চিত কাপজয়ী সেবার সেমিফাইন্যালে গিয়ে হোঁচট খেলাম। আমরা জনাকয়েক বুট পরে খেলতাম। পুলিশের কর্তৃপক্ষ (তার মধ্যে শ্বেতাঙ্গ কাপিতান দ্যুদেজের (Dudesert) অত্যধিক উৎসাহী। ইনি আমাদের খেলায় রেফারী হতেন আর অদ্ভুত অদ্ভুত সিদ্ধান্ত দিতেন—গোড়ালি দিয়ে ব্যাকপাস দিলেও ফাউল দিতেন। কিন্তু এদের প্রধান লিওতেনাঁ বুয়ার (Lieuteuant Bouard) ছিলেন যথার্থ সমঝদার এবং সুদক্ষ গোলরক্ষক। তিনি আমাদের পছন্দ করতেন এবং আমাদের ভেটারেনদের দলের গোলকীপার হতেন। বিপদ বুঝে হঠাৎ টুর্ণামেন্টের কর্তারা নিয়ম করলেন যে কেউ বুট পায়ে খেলতে পারবে না। সুতরাং প্রতিবাদ হিসাবে সেই প্রতিযোগিতা থেকে আমরা সরে এলাম। আর কটি টুর্ণামেন্ট ছিল টাউন ক্লাবের (Cercle)। এখানেও আমরা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছি, আমাদের দলের অনেকে সহরের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

আর দুটি খেলার উল্লেখ করবো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় একাদশের সঙ্গে আমাদের নিজস্ব মাঠে। কলকাতার দলরা প্রায় অপ্রস্তুত ছিল—তারা মাঠে নেমে পড়ল। তাদের গোলকীপার, মিত্র এবং এস ব্যানার্জির খেলা মনে আছে। খেলা হিসাবে বোম্বাই দলের সঙ্গে ম্যাচটিই বেশি চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। কলকাতার সঙ্গে আমরা জিতেছিলাম আর বোম্বাইয়ের সঙ্গে হয়েছিল গোল শূন্য ড্র। আমাদের জার্সিরও ততদিনে বদল হয়েছে—ফিকে নীল গা আর সাদা হাতা এবং পকেট। ইতিমধ্যে টেনিস গ্রাউণ্ড থেকে এখনকার স্পোর্টস গ্রাউণ্ডে আমরা পৌঁছে গিয়েছি। এই মাঠ ছিল জলদদার চীনাবাদামের ক্ষেত। ছেলেদের অনুরোধে জলদদাও রাজি হয়েছিলেন ওটার কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে। কী করে ছেলেমেয়েরা অক্লান্ত খেটে এই মাঠ গড়ে তুলেলেন পুরনো বুলেটিনে তার ছবি দেখলে কিছুটা বুঝতে পারা যায়। তারও পরে হল আমাদের দ্বিতীয় ফুটবল মাঠ—Annexe, যে-মাঠে আমাদের সঙ্গে দুর্ধর্ষ বাংলাদল খেলে গিয়েছে। কলকাতার খাতনামা মোহনবাগান যখন প্রথম পুলিশ মাঠে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে স্থানীয় দলের সঙ্গে তখন প্রধান অতিথি হিসাবে যা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সে-দলে ছিলেন খগরাজ, শৈলেন মান্না, শরৎ দাস, অনিল দে, নায়ার, আমার কলেজের সহপাঠী মানস দাসগুপ্ত। আমাদের খেলার সঙ্গে মায়ের পরিচয় ছিল—তাতে এত চোটজখম তাঁর নজরে আসত প্রায় প্রতিদিন, যে সেই আনাড়ি খেলার একসনর আখ্যা দিয়েছিলেন—গুণ্ডামী খেলা (jeu brutal)। মোহনবাগানের এমন পরিচ্ছন্ন কৌশলী সংঘবদ্ধ খেলা দেখে মা মন্তব্য করলেন—C'est un jeu artistique—এ একটা শিল্পসমৃদ্ধ খেলা। খেলার পরে খেলোয়াড়দের সস্নেহ উপহার দিয়েছিলেন তিনি। নেতা অনিল দে খেলাশেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পরে ঘোষণা করেছিলেন দলের সঙ্গে মিলিত কণ্ঠে, Three cheers for our Ma. বলা বাহুল্য মা বেশ প্রীত হয়েছিলেন ভক্ত খেলোয়াড়দের আচরণে।

আদিযুগে যাঁরা খেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে গোলে ছিলেন অরুণ—একান্ত নির্ভরযোগ্য

তাঁর খেলা। ব্যাকে হৃদয় এবং চট্টগ্রামের সুধীর (উভয়ের নাম দাঁড়িয়েছিল স্থানীয় উচ্চারণে যথাক্রমে 'এহৃদে' এবং 'সটগোপন')। পরে যোগ দেন কলকাতা থেকে কালী দাস—তিনি ছিলেন বয়ঃজ্যেষ্ঠ। হাফে খেলেছেন বীর সিং অভয়সিং, ন্যাকর, কুঞ্জবিহারী (তামিলে 'গুঞ্জেখালী'), রবি গুপ্ত। পুরোভাগে সুনীল, অনিয়, কণক, জয়ন্ত, মন্টু গুপ্ত, লেখক স্বয়ং। সুনীল বহুবার দলের নেতৃত্বও করেছেন। তাঁর খেলায় ছিল সাহস, ক্ষীপ্রতা এবং জোরালো সট এবং হেডিং; সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসাবে উপযুক্ত, আজকাল যাকে বলা হয় স্ট্রাইকার। কণকের খেলায় ছিল নিপুণ পাসিং—ইন্‌সাইড ফরোয়ার্ড হয়ে অন্যদের খেলিয়ে চালানো। তার খেলার প্রধান গুণ শৃঙ্খলা। পরে যাদের নাম উল্লেখযোগ্য তারা রথীন, কালু, বনা, প্রভাকর, অবরেন্দ্র, কিট্টু, দেবু, মনোজ, অরবিন্দবাবু, শৈলেশ, অশোক নন্দলাল, অবনী শা। বনার খেলায় সর্বগুণের সমাবেশ—দুপায়ে সমান শুটিং, বল কন্ট্রোল, হেডিং, স্বাস্থ্য, দম এবং গতি। পিভট বা সেন্টার হাফের আদর্শ। ইচ্ছা করলে সে কোনো টেট খেলোয়াড় হতে পারত। দেবুর খেলাও ছিল মারাত্মক সুন্দর। কিন্তু সে খেয়ালী, যতখানি তার প্রতিভা ও সম্ভাবনা ছিল, প্রয়োগে, অনুশীলনে তাকে অনুষ্টিত বা প্রতিষ্টিত করার অধ্যবসায় তার ছিল না। সে কম খেলেছে কিন্তু তা দিয়েই সমস্তদারের চিত্ত জয় করেছে। কিট্টু ও প্রভাকর সুন্দর খেলেছে।

আমাদের আর একটি উৎসবের খেলা হত (festival match) ভেটারনদের সঙ্গে তরুণদের। এর এক খেলার একটি ছবি আছে বুলেটিনে—খেলার প্রারম্ভে বলটাকে বা চরণস্পর্শ দিয়ে চালিয়ে দিচ্ছেন, পাশে ভেটারেনদের অধিনায়ক শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত।

এটা হল নিতান্তই আমোদের খেলা—নতুনদের পক্ষে প্রবীণ খেলোয়াড়দের সঙ্গলাভ খেলার মাঠে।

সেযুগে আমাদের খেলার সংজ্ঞা ছিল ২।৩।৫ এটাই ছিল সেকালের রীতি—রক্ষণ আর আক্রমণের দুই ভাগ ছিল। ব্যক্তিগত কৌশল, কৃতিত্ব, প্রতিভার আলো ছড়িয়ে পড়ত মাঠে, অন্যান্যদের সঙ্গে যথাসম্ভব যোগাযোগ রেখে। এখন খেলার ধরণটাই আমূল বদলে গিয়েছে। মানসম্মানের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখন অর্থকরী প্রশ্ন—আন্তর্জাতিক বা বিশ্বপ্রতিযোগিতায় এসে পড়েছে ব্যবসা (Commercialism) মোটা অঙ্কের বেট (bet) বাজি পর্যন্ত। সুতরাং খেলায় ঢুকেছে আত্মরক্ষার প্রভাব। ৪।২।৪ বা ৪।৪।২ ব্যূহ defence-ভিত্তিক। আমরা আগে বলতাম অমুক লেফট আউটে কি তীরবেগে ছোটে এবং বাঁ পায়ে কি নিখুঁত বল ফেলে গোলের সামনে, অমুক যাদুকর কি চমৎকার 'ক্যারি' (carry অর্থাৎ dribbling) করে পাঁচ-ছয় জনকে কাটিয়ে চলে যায়, অমুকের কেমন দুর্ধর্ষ চার্জ বা tackling—তাকে পেরিয়ে প্রতিপক্ষের সীমানায় ঢোকাই যায় না, ব্যাকে অমুকের কি দূর পাল্লার মনোরম সট। আজকাল এরকম specialisation বাতিল। আজ সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতায় সকলেই সব জায়গায় খেলতে পারে—এক সঙ্গে গোটা দলটাই এগিয়ে আক্রমণের বা পেছিয়ে প্রতিরক্ষণের ভূমিকা নেয়। খেলাটা হয়ে উঠেছে গাণিতিক বা জ্যামিতিক—আধুনিক পরিভাষায়, scientific—দাবার চালের মতো মাপা তার পদক্ষেপ। এর মধ্যে ব্যক্তিগত মহিমা কিছু ফুটিয়ে তুলতে পারেন একমাত্র superstar কয়েকজন—পেলে, গারিঞ্চা, বেকেনবাওয়ার, ইউসেবিও,

আলবার্তো, ববি মুরের মতো মুষ্টিমেয় নামী যাঁরা। কিন্তু এরা হলেন নিয়মের ব্যতিক্রম—ব্যতিক্রমই প্রমাণ করে দেয় নিয়মটি, ইউনিটি এবং ইউনিফর্মিটি, খেলোয়াড়দের এবং খেলার।

আমাদের ফুটবল এখন বৃহত্তর শারীর শিক্ষণের অঙ্গ হিসাবে এক সুশৃঙ্খল ক্রীড়া-ব্যবস্থা, সামান্য অবস্থা থেকে প্রায়-নিশ্চিহ্ন আরম্ভ থেকে এই সুন্দর শৃঙ্খলা বেড়ে উঠেছে। এর মূলে আমাদের ডিরেক্টর প্রণবের যে অক্লান্ত অধ্যবসায় উৎসাহ ও সবল প্রয়াস তা আমাদের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। অন্যান্য নানা রকম খেলাধূলা, সাঁতার লাফঝাঁপ এবং ব্যায়ামচর্চার সঙ্গে আজ নানা বয়েসের প্রায় তিনশ ছেলেমেয়ে ফুটবল খেলে। আমাদের খেলাধূলা খেলাধূলার দক্ষতায় চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছবার জন্য নয়। আমাদের যে প্রোগ্রাম বা পরিকল্পনা তাতে সকলকে খেলাধূলায় যথাসম্ভব সমান সুযোগ দিতে হয়। এত খেলোয়াড়দের মধ্যে সময় ভাগ করলে যে সুযোগ থাকে তাতে খেলাধূলার মাধ্যমে সুন্দর শরীর ও স্বাস্থ্য গঠনেরই সাহায্য করা যেতে পারে। একেবারে ছোটরা—বারো বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা সপ্তাহে কি একপক্ষে একদিন ফুটবলের মাঠ পায়। বড়রা সপ্তাহে একদিন কি দু'দিন পর্যন্ত ফুটবল খেলতে পারে। স্পেশালাইজেশনের পক্ষে এর দাম বেশি কিছু নয়। তবে আমরা নিয়েছি যথাসম্ভব বিস্তৃত উন্নতির পথ—অল রাউণ্ডারের পন্থা। শরীরচর্চা বা খেলাধূলা আমরা নিয়েছি সাধনার অঙ্গ হিসাবে—এর ভিতর দিয়েও যোগী হয়ে উঠবার জন্য। আর আমাদের সাধনা বা শ্রীঅরবিন্দের যোগ তো অপটু বা অসমর্থ দেহ ফেলে রেখেই নয়। দেহকে সুপটু সচেতন সবলঙ্ক একাগ্র করে তুলতে পারে প্রত্যক্ষভাবে খেলাধূলা ও শরীরচর্চা—এখানে তাই শেখানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে। বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে উপস্থিত সুযোগের ক্ষেত্রে শিক্ষক ও কোচরা লক্ষ্য রাখেন গোড়া থেকেই basic techniqueটি শিখিয়ে দিতে, ছাত্রদের ভুলভ্রান্তি শুধরে দিতে—প্রত্যেককে নিজের নিজের মত বেড়ে উঠতে। নিজের নিষ্ঠা অনুপাতে, আন্তরিকতা ও প্রযত্নের মাত্রায় প্রত্যেকে এগিয়ে যায়। কারণ তার সেই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা চলে মায়ের উপস্থিতি ও সাহায্য কেন্দ্র করে। সকল সার্থকতা সকল সাফল্যের অন্তরালে তো ভগবতী জননীরই অঘটনঘটন-পটিয়সী শক্তি।

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field :
Sreepore Bagharghole
P.O. Bonhooghly, 24 Parganas

Head Office :
34: 1, Puddapukur Road
Calcutta-20

Phone : 47-2869

With the best Compliments from :—

Ellora Enterprise

Paper & Board Merchants

57/2A, College Street
Calcutta-12

Phone: 34-3720

Our Homage to Sri Aurobindo and The Mother

Mitra Engineering & Construction Co.

(ENGINEERS OF REPUTE)

Phone 46-3957

Specialist in Insulation Work, Air Conditioning & Refrigeration, Electrical Engineers & Builders.

16/1, Chandranath Chatterjee Street
Calcutta—25

রমেন সেনগুপ্তের

শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মায়ের চরণে নিবেদিত

প্রণতি

(কাব্যগ্রন্থ)

মূল্য ৩·০০ টাকা

সমীরকান্ত গুপ্তের

কাব্যলোকে

বাংলা কাব্যের মনোজ্ঞ আলোচনা
প্রাচীন থেকে আধুনিক পৌঁছনোর চিত্তকর্ষক প্রকৃতি-বিশ্লেষণ

মূল্য ৮·০০

স ম গ্র

র চ না ব লী

শ্রীমলিনীকান্ত গুপ্ত

চার খণ্ড প্রকাশিত—প্রতি খণ্ডের মূল্য ২৫·০০ টাকা।

পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, মনোরম বাঁধাই, সুশোভন সংস্করণ

অমলেশ ভট্টাচার্যের

নিঃসঙ্গ আকাশ

নিঃসঙ্গ আকাশের মতোই উদার উন্মুক্ত চেতনার সুরে
রচিত অভিনব কাব্যগ্রন্থ।

আমার দৃষ্টিতে

শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু গুহের অনুবাদ

প্রথম	খণ্ড :	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—২·০০
দ্বিতীয়	খণ্ড :	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	২·০০
তৃতীয়	খণ্ড :	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	২·০০
চতুর্থ	খণ্ড :	নবম ও দশম অধ্যায়	২·০০
পঞ্চম	খণ্ড :	একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়	২·০০
ষষ্ঠ	খণ্ড :	ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়	২·০০
সপ্তম	খণ্ড :	পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ অধ্যায়	২·০০
অষ্টম	খণ্ড	সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়	২·০০
		প্রথম খণ্ড থেকে অষ্টম খণ্ড একত্রে বাঁধাই	২০·০০

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

১-১-১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম বুলেটিন সংগ্রহ

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

৭/৮২ চাঁপাতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের জন্ম-শতবার্ষিকী। শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির বিশেষ গুরুত্বসহকারে জয়ন্তী পালন করবে। অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ পালিত হবে শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র রচনা প্রকাশনের মাধ্যমে। শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র রচনা মূল কলেবরে এবং ইংরেজী থেকে বাংলায় অনূদিত ১৩ খণ্ডে প্রকাশ হবে। তাতে থাকবে তাঁর লেখা বাণী ও প্রার্থনা, ছোটো লেখা, গ্রন্থ [illegible] প্রবন্ধ, পত্রাবলী ইত্যাদি।

প্রাক [illegible] টাকা ([illegible] টাকা [illegible] জন্য)।
প্রকাশ টাকা ([illegible]

[[illegible] ও প্রকাশ
করা হবে [illegible] ও সুন্দর কাপড়ে মজবুত বাঁধাই [illegible] ছাপানো হবে।]

[illegible] 1978

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী—

১। ৩৫ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।

২। প্রতিটি খণ্ড প্রকাশ হলে গ্রাহকদের অগ্রিম জানানো হবে এবং ২৫ টাকা দিয়ে বই সংগ্রহ করতে হবে।

৩। শেষ দুই খণ্ড অর্থাৎ ১২ ও ১৩ খণ্ড প্রকাশ করবার সময় গ্রাহকের জমা ৩৫ টাকার সঙ্গে হিসাবনিকাশ করা হবে।

যোগাযোগ করার স্থান

(ক) শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির,
১৫ বঙ্কিম চাটার্জি [illegible]

(খ) শ্রীঅরবিন্দ ভবন,
৮ [illegible] কলিকাতা-[illegible]

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্তিকা

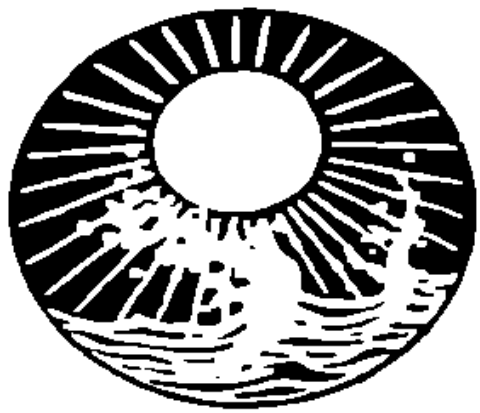

২৪শে এপ্রিল, ১৯৭৮

Statement about ownership and other particulars about the Quarterly B A R T I K A to be published in the first issue every year after the last day of February.

FORM IV

(See Rule 8)

1.	*Place of Publication* ...	PONDICHERRY
2.	Periodicity of its publication	QUARTERLY
3.	Printer's Name	Amiyo Ranjan Ganguli
	Nationality	Indian
	Address	Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry-2
4.	Publisher's Name	H. K. Niyogi
	Nationality	Indian
	Address	Sri Aurobindo Pathamandir, Cal.-73
5.	Editor's Name	Nolini Kanta Gupta
	Nationality	Indian
	Address	Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry-2
6.	Names and addresses of individuals and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital	Sri Aurobindo Pathamandir 15, Bankim Chatterjee St., Calcutta-73

I, H. K. Niyogi, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/-
H. K. Niyogi
Signature of Publisher

Date: 24 April 1978

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৪শে এপ্রিল, ১৯৭৮)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—৭৩

লৌহশৃঙ্খল	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৫
সাবিত্রী (অনুবাদ)	শ্রীঅরবিন্দ	৭
ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৪
বায়ের আলাপ	...	১৮
বেদ ও শ্রীঅরবিন্দ	গৌরী ধর্মপাল	৩০
শতাব্দীর স্মরণে	সমীরকান্ত গুপ্ত	৪৩

বার্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

সম্পাদক
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by : **Nolini Kanta Gupta**
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-73
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry-2

It is good to read
a Divine Teaching.
It is better to learn it.
The best is to live it.

লৌহশৃঙ্খল

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

কতজন তোমরা আরম্ভ থেকে এখানে আছ—অর্থাৎ একদম শিশুশ্রেণী থেকে? তেমন কেউ আছ? একজন—দুজন, তিনজন—চার...ওঃ বেশ অনেকে! খুব কৃতিত্বের কথা, অবশ্যই বিশেষ কৃতিত্বের কথা যে এতজন এত দীর্ঘকাল ধরে এখানেই পড়াশুনা করে এসেছ এবং তা সমাপ্ত করেছ—সত্যসত্যই এ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়।

এই প্রসঙ্গে আমি তোমাদের একটা গল্প বলি। এক তরুণ, এক অভীপ্সু সে, আধ্যাত্মিক বা ধর্মজীবনের আশ্পৃহা তার—সে এক সময়ে গান্ধীজীর কাছে গিয়েছিল। সেখানে থাকার অভিপ্রায় তার। সে বললে "আমি আধ্যাত্মিক জীবনের অভীপ্সু, আপনার সঙ্গে আমি থাকতে চাই।" গান্ধীজী মানুষটিকে দেখে গ্রহণ করেন। তিনি বলেন "ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখতে পার।" সে সেখানে কিছুদিন থাকল, বেশ কিছুদিন, বোধহয় এক বৎসরেরও বেশি। কিন্তু বৎসরের শেষে সে গান্ধীজীর কাছে গিয়ে বলল, "আমাকে এখান থেকে চলে যাবার অনুমতি দিন। কেন জানি না বোধ হচ্ছে আমি আর এখানে থাকতে পারব না।" তারপর সে চলে এল, চলে এল—বল তো কোথায়? এখানে, আশ্রমে। আশ্রম তার খুব ভাল লেগে গেল এবং সে এখানেই থেকে গেল—থেকেই চলল। কয়েক বৎসর পর গান্ধীজীর মনে হয় সেই তরুণটির কথা, "সে কোথায়? সুন্দর মানুষ ছিল সে। কোথায় গেছে সে?" তখন তিনি জানতে পারলেন যে সে এখানে রয়েছে, এই শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে। কত বৎসর? "সাত বছর?" গান্ধীজী হতবাক। "কি করে হল? আমি তাকে চিনি। আমি জানি সে অস্থির প্রকৃতির মানুষ—নিজের সম্বন্ধে, নিজের গতিবিধি সম্বন্ধে এত অনিশ্চিত—সে কোন এক জায়গায় বা এক কাজে বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারত না। আর সে কি না শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে রয়েছে সাত বৎসর! শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের পক্ষে এ মস্ত কৃতিত্ব যে তাকে এতদিন ধরে রাখতে পেরেছে! আমি আরও যোগ করতে পারি যে তোমরা যারা এতদিন ধরে এখানে থেকে এসেছ তারা নিশ্চয়ই তাদের সে কর্মের জন্য কিছু কৃতিত্ব দাবি করতে পার, না কি কৃতিত্বটা আশ্রমের প্রাপ্য?

একটা কথা আমার মনে এল। তোমরা অনেক শুনেছ সেই স্বর্ণশৃঙ্খলের কথা যা মা পরিয়ে দেন যে-ই তাঁর কাছে আসে বা তাঁকে স্পর্শ করে তাকে—এই চিরন্তন অচ্ছেদ্য শৃঙ্খল-বন্ধনী আমরা সবাই চিনি, সবারই অভিজ্ঞতা আছে—এ সুবর্ণশৃঙ্খল দিয়ে মা বেঁধে রাখেন প্রত্যেককে যে-ই তাঁর আলিঙ্গনে ধরা দেয়। এখন আমার অনুভব হচ্ছে যে তাঁর ঝুলিতে আরও একটি শৃঙ্খল আছে—হাতকড়া ও লোহার শিকল—তা দিয়ে তিনি কাউকে কাউকে শারীরিকভাবেও বেঁধে রাখেন তাঁর কাছে, তাঁর জড় সান্নিধ্যের সঙ্গে। তার দেহগত নিয়তিও তিনি তুলে নেন নিজ হাতে। সুবর্ণশৃঙ্খলটি অবশ্যই অন্তরাত্মার—শাশ্বত সুন্দর বহির্ময় এবং এমনি আরও গুণভূষিত সে অন্তরাত্মা সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু এমনকি এই দেহ, এই জড় বাহ্য আধারটিও সমানভাবেই মায়ের হতে পারে। সুবর্ণশৃঙ্খলে বাঁধা যখন, তুমি

তখন মায়ের ভালবাসার ধন কিংবা তিনিই তোমার ভালবাসার ধন লৌহশৃঙ্খলে বাঁধা তুমি হয়ে ওঠ দৈহিকভাবে তাঁর ক্রীতদাস। হাঁ, আমি ইঙ্গিতে বলতে চাইছিলাম এই কথাটিই তোমরা যারা এতদিন ধরে এখানে আছ, অনেকেই একান্ত শৈশব থেকেই, তারা লাভ করেছ একটি বিশেষ গুণ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র, এই অবিচ্ছিন্নতা। আমি আরও বলি, এ হল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এ একটা সিদ্ধি। এমনকি যদি তোমরা কোন ক্লাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না-ও হয়ে থাক, অর্থাৎ উপরের ক্লাসে ওঠা, প্রমোশন পাওয়া এক ক্লাস হতে অন্য ক্লাসে কঠিন পরীক্ষার শেষে, তার বদলে যদি তুমি শুধু এর মধ্য দিয়ে বেড়িয়ে এসে থাক, স্বচ্ছন্দে হেসে খেলেই কাটিয়ে থাক, তাই যথেষ্ট। একটা কিছু থেকে যাবে, এমন কিছু যা অতি মূল্যবান, তা লেগে থাকবে তোমার চেতনায় —সে সম্বন্ধে তুমি এখন সচেতন না-ও হতে পার, কিন্তু একদিন নিশ্চয়ই তুমি তা জানবে এবং চিনবে। সুতরাং আমি তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি, তোমাদের সবাইকে, এই সুন্দর কৃতিত্বের জন্য—এ বস্তুতঃ মায়ের বিশেষ করুণার পরিচায়ক।*

* ২৯-১০-৭৭ তারিখে শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রের বিদায়ী ছাত্রদের প্রতি ভাষণ।

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

৭ম পর্ব—যোগসাধনা

১ম সর্গ—মিলনের আনন্দ :
ভাবী মৃত্যুর অপেক্ষায় অগ্নিপরীক্ষা—অন্তরের মহাশোক

(২)

প্রথমে তার কাছে সুনীল গগনতলে
বনানীর নির্জনতা মনে হল যেন বিপুল স্বপ্নশোভা,
নিদাঘের খররৌদ্র আর অগ্নিদাহ দেবতার বেদী যেন,
দেবতাদের প্রাসাদ এক নভস্বলী চূড়া তার দোলে যেন পুষ্পস্তবক,
চারিদিকে দৃশ্যাবলী সব পূর্ণ পুলকের ওষ্ঠে মৃদুহাসা যেন
আর কণ্ঠে যত সুখী চারণকবিদের।
মধুচ্ছাগত বাতাসে উঠেছে যেন স্তোত্রপাঠ,
ক্ষীণতম কিরণলেখা ধরে যেন মহিমা এক,
রজনী মরকতমণি ঘলে যেন মধ্যদিনের পরে,
আশ্রয়তলে অন্ধকার যেন অথবা গভীরে চাঁদের আলো
দিনমান গাঢ় রক্তবর্ণ সমারোহ এক কিংবা পুণ্য উদ্‌গীথ,
আলোর কলহাস্য তরল, এক উদয় হতে অস্ত অবধি।
সত্যজ্ঞানের অনুপস্থিতি স্মৃতিভরা স্বপ্ন এক,
সঙ্গ তার দেবতার সাম্রাজ্য।
পৃথিবী ও স্বর্গের সুখ মিশে গিয়েছে যেন,
বাসর-রভসের দীপ্ত স্পন্দন বয়ে গেল যেন,
দুটি অন্তরাত্মা ছুটে চলে যেন হয়ে যাবে এক,
দুটি দেহ ঘলে যেন এক অতিন্দ্র শিখায়।
খুলে গিয়েছে দুয়ার অবিস্মরণীয় পরমানন্দের :
দুটি জীবনধারা আলিঙ্গনে দৃঢ়বদ্ধ একই পার্থিব স্বর্গে
কাল-নিয়তি আর দুঃখশোক অন্তর্হিত সে প্রজ্বলন্ত মুহূর্ত হতে।
কিন্তু অনতিবিলম্বে স্তিমিত হয়ে গেল নিদাঘের অগ্নিশ্বাস
ঘনঘোর মেঘরাশি ধীরে উঠে এল আকাশ ছেয়ে
বর্ষা দ্রুতপদে ধেয়ে যায় তার অশ্রু ঝরিয়ে পত্রাবলী হতে,
ঝঞ্ঝা গর্জে বনানীর দানবকণ্ঠস্বরে।

কান পেতে শোনে সাবিত্রী ঘোর বজ্রপাতধ্বনি
আর বর্ষাধারার পলাতক ক্রমক্ষীণ পদধ্বনি
আর বাতাসের সুদীর্ঘ অতৃপ্ত প্রশ্বাস,
দুঃখের অস্ফুট আরাব ধ্বনি-জর্জরিত রাত্রির কোলে,
বিশ্বের শোকতাপ যত সন্নিকটে এল তার
রাত্রির অন্ধকার ধরে দিল তার কাছে যেন ভবিষ্যতের আশঙ্কাসঙ্কুল মুখের চিত্র।
তার প্রিয়তমের কালান্তক নিয়তির করাল ছায়া এল উঠে,
ভীতি অধিকার করে বসল তার মর্ত্য হৃদয়।
মুহূর্ত সব নির্মম রুদ্রবেগে ছুটে যায় : তরঙ্গসঙ্কুল
চিন্তা তার, স্মরণে আসে ঋষি নারদের নির্দিষ্ট দিনক্ষণ।
বিচলিত শঙ্কান্বিত হিসাবী রক্ষক যেন আপন সম্পদের,
গণনা করে চলে সে কটি দিবস এখনও রয়েছে সম্মুখে তার
ক্রূর প্রত্যাশা এক করাঘাত করে যেন অন্তরে তার
নিদারুণ আসে কাছে কালক্রমের পদধ্বনি
এল শোক পরম প্রবেগে অপরিচিত অতিথি তার দুয়ারে
অদৃশ্য তখন যখন প্রিয়জনের আলিঙ্গনবদ্ধ, নিদ্রাভঙ্গে তার
প্রত্যূষে উঠে আসে দৃষ্টি হানে তার মুখপানে।
বৃথা সে ছুটে আশ্রয় গ্রহণ করে পুলকের অতলে,
অস্তিত্বের পূর্বচায়া অনুসরণ করে তারে।
যত সে ডুবে যায় আপন ভালবাসার মাঝে ততই হয় অধিকতর তার বেদনা:
গভীরতর সন্তাপ তার উঠে আসে মধুরতর অতল হতে।
স্মৃতি হয়ে ওঠে মর্মন্তুদ যাতনা, অনুভব করে
প্রতিটি দিবস যেন সোনার পাতা অকাতরে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে
তার প্রেমের আনন্দের অতি ক্ষুদ্রতম পুষ্টিকা হতে।
তার সেই যত পুলকের বিপুল উদ্বেল হিল্লোল
আর তার সন্তরণ ভাবী বিপদসঙ্কুল ঘোর তরঙ্গমালার মাঝে
দুঃখকে ভীতিকে খাদ্য দিয়ে পুষে রাখে যেন আপন হৃদয়ে,—
এখন এসব আসন গ্রহণ করেছে তার বক্ষতলে অতিথিরূপে
অথবা অন্তরে কক্ষে এক একান্তে করে বিচরণ,—
নয়ন তার অন্ধ যেন দৃষ্টিপাত করে ভবিষ্যতের রজনী অভিমুখে।
বিচ্ছিন্ন আত্মা তার সাক্ষীরূপে দেখে যায়,
করে বিচরণ অচেতন যত প্রিয়জন চারিদিকে তার তাদের মাঝে,
মনে অপরিচিত সে, হৃদয়ে তবু এত কাছে,
জ্ঞানহারা বিশ্ব হাসিমুখে পাশ দিয়ে চলে যায় সুখে
অজানা অস্তিত্বের অভিমুখে পথ বেয়ে,
বিস্মিত দেখে মানুষের অবহেলাময় জীবনধারা।

বিভিন্ন জগতের অধিবাসী তারা যেন ভিন্ন তবু নিকটে,
নিশ্চিত তারা দেখবে পুনরাবর্তিত সূর্যকে,
নিজেদের রেখে রেখেছে তারা ক্ষুদ্র নিত্যনৈমিত্তিক আশা আর কর্মাবলী দিয়ে,—
সাবিত্রী কিন্তু একক তার নিদারুণ জ্ঞান নিয়ে।
একদিন গন্ধ সুখময় গুপ্তরহস্য
ঘিরে রেখেছিল তারে যেন রূপালী এক কুজ্ঝটিকে
নিরালায় চিন্তার স্বপ্নের এক উদ্ভ্রান্ত নীড়নাঝে,
তার পরিবর্তে এল এখন নিঃসঙ্গ তার করুণ কালক্রম
যার সঙ্গীহারা শোকভার—জানে না কেহ, কেহ ভারগ্রহণ করে না তার,
জীবদেহ এক দেখে সে তার যানসের অন্তিম অনতিবিলম্বে,
তার মর্ত্য ভালবাসার ভঙ্গুর স্বস্তির অবশেষ।
প্রশান্ত আনন তার এখনও অবিচল মধুর অচঞ্চল,
মাধুর্যময় দৈনন্দিন কর্মাবলী তার এখন হয়েছে মুখোশ এক
বৃথাই সে চেয়ে দেখে আপন অন্তরের গভীরে
নাই কোথাও আশ্রয় সুকৃতার আর অন্তরাত্মার শান্তির।
অন্তরালে তখনও রয়েছে অন্তরতম তার নীরব চিন্ময়পুরুষ
সাক্ষীরূপে অক্ষুব্ধ দৃষ্টি নিয়ে দেখে চলেছে জীবন নাট্য
সহ্য করে চলে মনের প্রাণের বেদনাভার,
বহন করে মানুষী বক্ষতলে বিশ্বের, নিয়তির ভার।
আভাস বা আলোক চমক আসে যায়, সান্নিধ্য তার অন্তর্হিত।
ক্ষুদ্র হৃদ্যাবেগ কেবল আর উদ্বেল সঙ্কল্প তার
সম্মুখে এসে দাঁড়ায় অকাট্য নিয়তির সাক্ষাতে
নিরাশ্রয়, নিরাবরণ, আবদ্ধ মানুষী ভাগ্যশৃঙ্খলে
এসব বৃত্তির নাই কোন কর্মসামর্থ্য, নাই রক্ষণের পথ।
সংযত করেছে সে সকলে, বাহিরে চিহ্ন নাই কোন
এখনও সে রয়েছে সকলের কাছে সেই পরিচিত প্রিয় সরল শিশুটি,
দুঃখিনী নারী অন্তরে যে তারা দেখে না তারে
পরিবর্তন নাই কোন তার বাহিরের সুষম অঙ্গভঙ্গে
এখনও উচ্চ রাজরাণী যে সকলে উদ্‌গ্রীব যার সেবার তরে,
আপনাকে সে ধরে দিয়েছে সকলের অশ্রান্ত সেবিকারূপে,
সম্মার্জনী অথবা কলসী অথবা জলাধারের ক্ষুদ্র কর্মে বিরতি নাই তার
নিপুণ সযত্ন রক্ষণাবেক্ষণ ও অগ্নির প্রজ্বালনে
পূজাগৃহে অথবা রন্ধনশালায়, অতি তুচ্ছ কর্তব্যটিও
ন্যস্ত করে না সে অপরের হাতে নিজের নারীসুলভ সামর্থ্যে সম্ভব যা।
সকল কর্মে সমুজ্জ্বল অপরূপ দেবত্ব এক :
অতি সামান্য গতিভঙ্গিও তার এনে ধরে দেয়

একত্ব এক পৃথিবীর অনন্ত আলোকবৃত্তের সঙ্গে,
উর্ধ্বে তুলে ধরে যেন ভালবাসার বলে দৈনন্দিন কর্মাবলী যত।
সব ভালবাসা তারই, একমাত্র স্বর্গীয় বন্ধনসূত্র
বেঁধে রেখেছে সকলকে মিলিয়ে তার সঙ্গে সোনার বন্ধনী যেন।
কিন্তু বেদনা যখন তার ভেঙে ওঠে উপরে ধরে গাঢ় আলিঙ্গনে,
তখন এ সকল বস্তুই, ছিল যারা এক সময়ে তার আনন্দের মধুর উপকরণ,
এখন হয়েছে অর্থশূন্য তার কাছে, উজ্জ্বল খোলস শুধু,
অথবা রয়ে যায় তারা শূন্য যন্ত্রের পুনরাবর্তনমাত্র
শরীরের ক্রিয়াবলীর ভাগী হয় না তার সঙ্কল্প।
তবুও নিরন্তর এই অদ্ভুত বিচ্ছিন্ন জীবনধারার পশ্চাতে
অন্তশ্চেতনা তার সমিদ্ধ আগুনের সাগর যেন
ধরে রেখেছে প্রিয়জনকে তার, তার শরীরের সঙ্গে সংলিপ্ত সে,
অবিচ্ছিন্ন আশ্লেষে রক্ষা করে তার বিপন্ন প্রিয়জনকে।
জেগে রয় সে সারা রাত যন্ত্র নীরব প্রহরক্রম পার হয়ে
যখনে জাগে তার বুকের ধন আর প্রিয় মুখখানি
নিরন্তর আনত যাননপদ্ম ললাটচুম্বনার পরে
অথবা রাখে উত্তপ্ত গাঢ় তার প্রিয়তের চরণপরে।
প্রত্যূষে জাগরণে সাবিত্রীর ওষ্ঠাধর যুক্ত নিরন্তর সত্যবানের ওষ্ঠাধরের সঙ্গে,
চাহে না পুনরায় বিযুক্ত হতে কখন
অথবা হারিয়ে বসতে বিলম্বিত পুলকের মধুময় ধারাপ্রবাহ
চায় না হারাতে সত্যবানের দেহ আপনার বক্ষ হতে,
ভালবাসার এই যত সামান্য মধুময় পরিচয়স্পন্দন।
কালের কার্পণ্য সহে না তার—
হৃদয়াবেগে প্রতিটি পলাতক মুহূর্ত তার ধরে রাখবে সে
শতাব্দীর প্রয়োজন একদিনে সে মিটিয়ে দেবে
ঢেলে তার অবাধ প্রেম আর উছল আনন্দ ;
অথবা প্রয়াস তার বর্তাকালের আশ্রয়ে
গড়ে তুলতে ক্ষুদ্র কক্ষ এক কালাতীতের তরে
দুটি মানুষী জীবনধারার গভীর মিলন দিয়ে,
সাবিত্রীর অন্তরাত্মা একান্তে বন্ধ করে রেখে সত্যবানের অন্তরাত্মার মাঝে।
সবই পেয়েছে সে তবু সাবিত্রী চাহে আরও আরও ;
তার দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ তবু অতৃপ্ত সে,
উচ্চকণ্ঠে তার চায়, বলে ফুকারি : "মধুময় সত্যবান,
অন্তরের প্রিয়তম তুমি, দাও মোরে আরও আরও দাও
তোমার প্রেম যতক্ষণ পার দিতে এখনও তোমার এই প্রিয়জনে।
দৃঢ় আলিঙ্গনে বাঁধ আমারে প্রতিটি নাড়ী ধরে রাখে যেন

আমার হৃদয়বারতা বয়ে নিয়ে যায় যত শিহরণ তোমার অভিমুখে।
আমাদের বিচ্ছেদ আসন্ন, কে জানে কোন সুদূরে
এই বিশাল নিদারুণ চক্রটি তার আবর্তনে
ফিরিয়ে আনবে আমাদের পরস্পরের কাছে পুনরায়, ফিরিয়ে দেবে
আমাদের ভালবাসা।"

ভালবাসা তার সেই দুঃখবহ বাক্যটির উচ্চারণে বাধা দিল এসে
বাধা দিল আপনার দুর্ভার নাবিয়ে দিতে সরল সুন্দর সত্যবানের শিরোপরে :
দমন করে রাখে সে বুকের তলে উদ্বেল শোকভার তার
রবে সে অন্তরে নীরব, সহায়বর্জিত, নিঃসঙ্গ।
তবুও সত্যবানের কখনও-বা অর্ধবোধগম্য হয় কিছু,
অথবা অনুভব করে কখনও-বা চিন্তাচ্ছন্ন হৃদয়ের
অস্পষ্ট প্রত্যুত্তরে তার অনুচ্চারিত প্রয়োজন,
যে অভাব রয়েছে সাবিত্রীর গভীর অতল আবেগতলে।
ধরমান দিবসরাজির যতখানি উদ্বর্তন রয় তার
অরণ্য হতে কাষ্ঠ-আহরণ পরিশ্রমের পরে
অথবা খাদ্যের অন্বেষণ শেষে ঘোর বনানীর পথে পথে
অথবা অন্ধ পিতার দৈনন্দিন সেবা করে
দিয়েছে সে সাবিত্রীর তরে, দিয়েছে বাড়িয়ে কালের যাত্রা
তার অন্তরঙ্গ সান্নীধ্যের, তার আলিঙ্গনের কল্যাণে,
অবাধে ঢেলে দিয়েছে হৃদয়পিপাসু বাক্যাবলীর মধুরতা
আর সংলগ্ন দুটি হৃদয়ের স্পন্দন অন্তরঙ্গতা।
কিছুই পর্যাপ্ত নয় তবু সাবিত্রীর অমেয় প্রয়োজনের তুলনায়।
সত্যবানের সান্নিধ্যে ভুলে যদি যায় সাবিত্রী কখনও,
তার অনুপস্থিতি নিয়ে আসে বেদনার অসহ্য দংশন,
চেয়ে দেখে সম্মুখে আগামী দিবসরাজির প্রসারিত মরুভূমি
অঙ্কিত প্রতিটি নির্জন নিমেষের মধ্যে।
যদিবা মিথ্যা এক কাল্পনিক আনন্দ
অগ্নিদীপ্ত সম্মেলন এনে দেয় তার মৃত্যুরূপী মুক্তিপথ ধরে
স্বপ্ন দেখে সে দেহ তার ধারণ করেছে পোশাক যেন লেলিহান চিতার আগুন,
জানে সে এ সুখভোগ সাজে না তারে
সত্যবানের মৃত্যুসাথী হতে, তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে তার বস্ত্রাঞ্চল ধরে
পার হয়ে যেতে দেশ দেশান্তর, সুখীসব যাত্রী যেন
সেই পরপারে—মধুর হোক, হোক-বা ভীতিকর।
দুঃখী জনক-জননীর এখনও যে প্রয়োজন তাকে
সহায় হতে তাদের শূন্য শেষ জীবনে।
কখনও মনে হয় তার যুগযুগান্তরের বেদনাভার

চাপিয়ে দিয়েছে সারাংশ তাদের, তার একক একান্ত দুঃখের পরে
তার অন্তরে সংহত করে ধরেছে আর্ত বিন্দু এক।
এইভাবেই তার অন্তরাত্মার নীরব কক্ষমাঝে
রুদ্ধ করে রেখেছে তার ভালবাসা, আপন গোপন দুঃখের সঙ্গী হয়ে
বসবাস তার মূক পূজারী যেন প্রচ্ছন্ন দেবতাদের সঙ্গে
অতৃপ্ত তারা তার দৈনন্দিন নির্বাক নিবেদনে
আপনার শোক তুলে ধরে সে তাদের সম্মুখে ধূপের শিখা যেন,
আপন জীবন বেদী, আপনি বলিদান।
তবু উভয়ে তারা একের মধ্যে অপরে যেন অধিকতর মিশে চলেছে
মনে হয় অবশেষে কোন শক্তির সাধ্য হবে না তাদের বিচ্ছিন্ন করে ধরতে;
কারণ শরীরের দেওয়াল অবধি এখন আর বিভক্ত করে না।
সত্যবান যখন বিচরণ করে বনের মাঝারে
সাবিত্রীর সচেতন সত্তা চলে বেড়ায় তার সঙ্গে সঙ্গে
চেয়ে দেখে তার সকল কর্মাবলী, যেন সাবিত্রীরই আপনার মধ্যে সে চলে ফেরে;
সত্যবান আপনি, যদি-বা তত নয় সজ্ঞানে, দূর হতে তবু তার স্পর্শে যেন
শিহরিত হয়ে ওঠে।
ক্রমে সাবিত্রীর প্রেমাবেগ বর্ধিত হয়ে ওঠে,
শোক, আশঙ্কা হয়ে উঠল বিপুল প্রেমের সমিধ।
ক্লেশতাপে উপচিত হয়ে সমগ্র বিশ্বে সে ব্যাপ্ত হল,
প্রেমই হল তার সমস্ত জীবন, হয়ে উঠল তার সমগ্র পৃথিবী আর স্বর্গ।
যদি-বা জীবনজাত, কালধারার সন্তান
তবুও চলে ফেরে সে অহল্যা যেন অমর দেবতার মত:
চেতনা তার প্রসারিত অপরিমেয় দিব্য সামর্থ্যে এক
স্থূণা যেন নিয়তির, মহাকালের আঘাত আশ্রয়
অথবা শ্রান্ত যখন দুঃখের উদ্বেগ-বিলাসে
মূর্ত শোক হয়ে ওঠে প্রশান্ত, স্তিমিত-নয়ন দৃঢ়চিত্ত
অপেক্ষায় রয় তার নিদারুণ সংঘর্ষের পরিণাম তরে,
কোন কর্মতরে শেষের বিরতি নিয়ে আসবে যে,
পরমবিজয়ী আপনার পরে, মৃত্যুর পরে আর অশ্রুধারা পরে।
আসন্ন ঋতু নিয়ে আসে পরিবর্তন।
ঝড়ঝঞ্ঝা চলে না আকাশ বেয়ে মেলে তাদের পক্ষ নিদারুণ,
বজ্রের ক্রুদ্ধ নির্ঘোষ আর ভূমণ্ডল পার হয়ে যায় না,
তবুও আকাশে শোনা যায় অস্ফুট আরাব এক
বর্ষার ক্ষীণ মন্থর ধারা ঝরে পড়ে বিষণ্ণ আকাশ বেয়ে
ধূসর মন্থরগতি মেঘরাজি আবদ্ধ যেন পৃথিবীর পরে।
তেমনই শোক ভারাক্রান্ত আকাশ বদ্ধ হৃদয়ে তার।

তত্ত্ব সত্তা এক রয়েছে নেপথ্যে প্রচ্ছন্ন কিন্তু দেয় না কোন আলো
কোন কণ্ঠ নেমে আসে না বিস্মৃত সব ঊর্ধ্বের শিখর হতে :
তবু আত্মমগ্ন বেদনার গোপন তলে
তার মানুষী হৃদয় বলে তার কথা দেহের নিয়তির কাছে।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত

ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র

(ঋগ্বেদ)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৩য় মণ্ডল—৯ম সূক্ত

(অষ্টম সূক্তটি শ্রীঅরবিন্দ অনুবাদ করেননি, তাই বাংলায় অনুবাদ দেওয়া হল না।)

১। সখায়স্ত্বা ববৃমহে দেবং মর্তাস উতয়ে।
অপাং নপাতং সুভগং সুদীদিতিং সুপ্রতূর্তিমনেহসম্ ॥১॥

সখায়ঃ—সখাসকলে
ত্বা—তোমাকে
ববৃমহে—বরণ করি
দেবম্—দেবতা (তোমাকে)
মর্তাসঃ—মর্ত্যজন (আমরা)
উতয়ে—রক্ষণের জন্য
অপাম্—জলের, জলধারার
নপাতম্—সন্তান
সুভগম্—পরম সুখময়
সুদীদিতিম্—পরম দীপ্তিময়
সুপ্রতূর্তিম্—পরম তারণ
অনেহসম্—অপাপবিদ্ধ, অনাহত

সখা আমরা মর্ত্যজীব দেবতা তোমাকে বরণ করি সুরক্ষণের জন্য, জলরাশির সন্তান তুমি পরম সুখময়, পরম দীপ্তিময়, পরম তারণ, অপাপবিদ্ধ তুমি ॥১॥

২। কায়মানো বনা ত্বং যন্মাতৃরজগন্নপঃ।
ন তত্তে অগ্নে প্রমৃষে নিবর্তনং যদ্দূরে সন্নিহাভবঃ ॥২॥

কায়মানঃ—পরিহার করে
(সায়ণ—কানয়মানঃ)
বনা—বনরাজি
ত্বম্—তুমি
যৎ—যখন
মাতৃঃ—মাতা
অজগন্—চলে গিয়েছে
অপঃ—জলমধ্যে
ন—নয়
তৎ—সেই
তে—তোমার
অগ্নে—হে অগ্নি
প্রমৃষে—বিস্মৃতির জন্য অথবা
নিধনের জন্য
নিবর্তনম্—প্রত্যাবর্তন
যৎ—যখন
দূরে—দূরে
সন্—রয়েছ
ইহ—এখানেই
ভবঃ—রয়েছ

বনরাজি পরিহার করে তুমি যখন ফিরে গিয়েছ তোমার মাতা জলরাশির মধ্যে, সেই প্রত্যাবর্তন তোমার বিস্মৃতি নয়, যখন দূরে তুমি তখনই তুমি নিকটে চলে এসেছ ॥২॥

৩। অতি তৃষ্টং ববক্ষিথাথৈব সুনবা অসি।
প্রপ্রায়ো যন্তি পর্যনা আসতে যেষাং সখ্যো অসি শ্রিতঃ ॥৩॥

অতি—অতিক্রম করে
তৃষ্টম্—কর্কশভূমি অথবা তৃষ্ণা
ববক্ষিথ—বহন করে নিয়েছ
অথ-এব—তখনও
সুনবাঃ—সুনবা (তুমি), সত্যবান
অসি—রয়েছ
প্র-প্র (+যন্তি)—সম্মুখে এগিয়ে চলে; এগিয়ে চলে যায়
অন্যে—অন্য সকলে
যন্তি (প্র-প্র+)—সম্মুখে এগিয়ে চলে, এগিয়ে চলে যায়
পরি—চারিদিকে
অন্যে—অন্যেরা
আসতে—আসীন
যেষাম্—যাদের
সখ্যে—সখিত্বে
অসি—তুমি রয়েছ
শ্রিতঃ—আশ্রয় করে

যখন তুমি বহন করে চলে গিয়েছ কর্কশ ভূমির ওপারে, তখনই তুমি হয়ে উঠেছ সত্যবান একেলা এগিয়ে চলে যায়, অন্যেরা যাদের সখারূপে তুমি ধরে রয়েছ, তারা চারিদিকে আসন গ্রহণ করেছে ॥৩॥

৪। ঈয়িবাংসমতি স্রিধঃ শশ্বতীরতি সংচতঃ।
অন্বীমবিন্দন্নিচিরাসো অক্রহোঽপ্সু সিংহমিব শ্রিতম্ ॥৪॥

ঈয়িবাংসম্—চলন্ত, গমনশীল
অতি—অতিক্রম করে
স্রিধঃ—ধ্বংসাত্মক (শোষক, ক্ষয়কারী—সায়ণ)
শশ্বতীঃ—শাশ্বতী
অতি—অতিক্রম করে
সংচতঃ—যারা ধরে থাকে, লেগে থাকে
অনু—অনুসরণ করে
ঈম্—একে
অবিন্দন্—আবিষ্কার করল
নি-চিরাসঃ—চিরন্তন, চিরকাল
অক্রহঃ—অক্ষত
অপ্সু—জলের মধ্যে
সিংহম্-ইব—সিংহের মত
শ্রিতম্—আশ্রিত, আশ্রয় লাভ করেছে

ধ্বান্তিকর শক্তিদের অতিক্রম করে গিয়েছে সে, অতিক্রম করে গিয়েছে চিরকাল যারা সঙ্গে লেগে থাকে, তখন চিরকাল যারা অক্ষত রয়ে যায় তারা তাকে অনুসরণ ক'রে আবিষ্কার করল জলরাশির মধ্যে সিংহের মত আশ্রয় নিয়েছে ॥৪॥

৫। সস্রবাংসমিব স্বনাদ্রিমিথা ভিরোহিতম্।
এনং নয়ন্মাতরিশ্বা পরাবতো দেবেভ্যো মথিতং পরি ॥৫॥

সস্রবাংসম্-ইব—প্রস্থিত যেন
স্বনা—আপনা হতে
এনম্—একে
আ+নয়ৎ—নিয়ে এসেছে

অগ্নিম্—অগ্নি
ইধা -সমাক
তিরঃ-হিতম্ -তিরোহিত
মাতরিশ্বা—মাতৃক প্রাণবায়ু
পরাবতঃ—লোকান্তর হতে
দেবেভ্যঃ—দেবতাদের জন্য
মথিতম্—মথিত
পরি—চারিদিকে

এই যে অগ্নি আপনা হতে সবেগে চলে গিয়েছিল, সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, দেবতাদের উদ্দেশ্যে চারিদিক হতে যাকে মন্থন করা হয়েছে তাকে লোকান্তর হতে নিয়ে এসেছে মাতৃক প্রাণবায়ু ॥৫॥

৬। তং ত্বা মর্তা অগৃভ্ণত দেবেভ্যো হব্যবাহন।
বিশ্বান্যদাজ্ঞ্যা অভিপাসি মানুষ তব ক্রত্বা যবিষ্ঠ্য ॥৬॥

তম্—সেই
ত্বা—তোমাকে
মর্তাঃ—মর্ত্যলোকেরা
অগৃভ্ণত—ধরে এনেছে
দেবেভ্যঃ—দেবতাদের জন্য
হব্যবাহন—(তুমি হলে) হব্যবাহক
বিশ্বান্—যাবতীয়
যৎ—কারণ
যজ্ঞান্—যজ্ঞ
অভিপাসি—ধরে রক্ষা কর
মানুষ—(তুমি হলে) মানুষী
তব—তোমার
ক্রত্বা—সত্য প্রেরণা দিয়ে
যবিষ্ঠ্য—তুমি হলে যুবতম

মর্ত্যলোকেরা তোমাকে গ্রহণ করে নিয়েছে দেবতাদের জন্য, তুমি হলে হব্যবাহক, যাবতীয় যজ্ঞকে তুমি রক্ষা করে থাক তোমার সত্য প্রেরণা দিয়ে, তুমি হলে মানুষী, তুমি হলে তরুণতম ॥৬॥

৭। ভদ্রং তব দংসনা পাকায় চিচ্ছদয়তি।
ত্বাং যদগ্নে পশবঃ সমাসতে সমিদ্ধমপিশর্বরে ॥৭॥

তৎ—সেই
ভদ্রম্—কল্যাণ
তব—তোমার
দংসনা—কর্ম
পাকায়—অজ্ঞান হতে
চিৎ—নিশ্চিতার্থে
ছদয়তি—ঢেকে রাখে, আবৃত করে রাখে
ত্বাম্—তোমাকে
যৎ—যখন
অগ্নে—হে অগ্নি
পশবঃ—পশুকুল
সম-আসতে—ঘিরে আসন গ্রহণ করেছে
সমিদ্ধম্—সমিদ্ধ, প্রজ্বলিত
অপি-শর্বরে—সম্মুখে রাত্রির, সম্মুখে রাত্রিমধ্যে

সেই পরম কল্যাণকে তোমার কর্মরাজি ঢেকে রাখে অজ্ঞান হতে যখন, হে অগ্নি, পশুকুল তোমাকে ঘিরে সমাসীন রাত্রিমুখে প্রজ্বলিত তুমি যখন ॥৭॥

৮। আ জুহোতা স্বধ্বরং শীরং পাবকশোচিষম্।
আশুং দূতমজিরং প্রত্নমীড্যং শ্রুষ্টী দেবং সপর্যত ॥৮॥

আ-জুহোত—আহুতি দান কর
সু-অধ্বরম্—সবাক যজ্ঞসাধক
শীরম্—তীব্র, তীক্ষ্ণ
পাবকশোচিষম্—শোধনকর জ্যোতি যার
আশুম্—বেগবান
দূতম্—দূত
অজিরম্—ক্ষিপ্রগামী
প্রত্নম্—প্রাচীন
ঈড্যম্—পূজনীয়
শ্রুষ্টী—অবিলম্বে
দেবম্—দেবতাকে
সপর্যত—সেবা কর

এই যে যজ্ঞচালক, তীক্ষ্ণ দ্যুতি যার শুদ্ধ করে তোলে তাঁকে আহুতি দাও, ক্ষিপ্রগামী ধাবমান দূত তিনি, সুপ্রাচীন পরমপূজ্য দেবতা তিনি, অবিলম্বে তাঁর সেবারত হও ॥৮॥

৯। ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণ্যগ্নি ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্যন্।
ঔক্ষন্ঘৃতৈরস্তৃণন্বর্হিরস্মা আদিদ্ধোতারং ন্যসাদয়ন্ত ॥৯॥

ত্রীণি—তিন
শতা—শত
ত্রী—তিন
সহস্রাণি—সহস্র
অগ্নিম্—অগ্নিকে
ত্রিংশৎ—ত্রিশ
চ—আর
দেবাঃ—দেবতারা
নব—নয় সংখ্যক
চ—আর
অসপর্যন্—সেবা করে
ঔক্ষন্—অভিষিক্ত করেছে
ঘৃতৈঃ—ঘৃতধারায়
অস্তৃণন্—প্রসারিত করেছে, বিস্তৃত করেছে
বর্হিঃ—যজ্ঞাসন
অস্মৈ—এর জন্য
আৎ-ইৎ—তারপরে, অনন্তর
হোতারম্—হোতাকে
নি+অসাদয়ন্ত—অন্তরে স্থাপন করেছে

তিন সহস্র তিন শত ত্রিশ এবং নয় সংখ্যক দেবতা অগ্নির সেবা করে, ঘন আলোকের ধারায় তাকে অভিসিক্তিত করে তারা, তারই জন্য বিস্তৃত করে যজ্ঞাসন, অন্তরে স্থাপন করে তাকে হোতারূপে ॥৯॥

মায়ের আলাপ

২৫ আগষ্ট ১৯৫৪, বুধবার

(পড়া হচ্ছিল শ্রীঅরবিন্দের The Mother বইটির শেষ অধ্যায়ের শেষের কয়েকটি পৃষ্ঠা। তাতে এক জায়গায় শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, ভগবৎ জননীর যে চারটি প্রধান ব্যক্ত-রূপের কথা তিনি আগে বলেছেন, তাছাড়াও অন্যান্য আরও মহারূপ আছে কিন্তু তাঁদের এই পৃথিবীতে নামিয়ে আনা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। পার্থিব সত্তার ক্রমবিকাশের ধারায় তেমন স্পষ্ট আকারে তাঁরা আত্মপ্রকাশ করেন নি। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের আবির্ভাব অতিমানস সিদ্ধির জন্যে বিশেষ দরকার। আবার তাঁদের মধ্যেও যাঁকে একেবারে না হলেই নয়, তিনি হলেন অপার আনন্দের বিগ্রহস্বরূপ, দুর্জ্ঞেয় রহস্যে ভরা মহাশক্তি। তাঁর আনন্দধারা দিব্যপ্রেমের উৎস থেকে উৎসারিত। এক দিকে অতিমানস চেতনার অভ্রচুড়, আর এক দিকে জড়ের নিম্নতম সুগভীর খাদ। এ দুয়ের মাঝের অলঙ্ঘ্য ব্যবধান দূর করতে একমাত্র তিনিই পারেন, কারণ তাঁরই আনন্দের মাঝে ধরা আছে অনুপম দিব্য-জীবনের গোপনমন্ত্র। আর এখনও, পৃথিবীর এই বর্তমান অবস্থাতেও, এই আনন্দময়ীই তাঁর গোপন উৎস থেকে বিশ্বের আর সব মহাশক্তির খেলাকে নীলায়িত করে চলেছেন। কিন্তু মানুষের প্রকৃতি সীমাবদ্ধ, অহংসর্বস্ব, অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাই সে এই বিরাট আবির্ভাবকে ধারণ করতে বা তাঁদের প্রচণ্ড কর্মপ্রবাহকে সহ্য করতে পারে না।

এই অংশটিকে অবলম্বন করে, আজকের ক্লাশের প্রশ্ন শুরু হল।)

প্রশ্ন মা, ভগবৎজননীর সেই বিশেষ রূপটি কী? কবে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন?

শ্রীমা এর উত্তর আমি লিখে এনেছি। কারণ জানতাম তোমাদের মধ্যে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, যেহেতু আজকের পাঠ্যাংশের মধ্যে ওটিই হল সব চেয়ে বেশী চিত্তাকর্ষক। ওটির সঙ্গে আরও একটি প্রশ্নের উত্তর লিখে এনেছি। তবে আগে এইটিই পড়ি, শোন।

তোমরা জানতে চাইছ, সেই দিব্যরূপটি কী, এবং কবে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন? (মা কিছুক্ষণ নীরব রইলেন) তার উত্তরে আমি বলছি,

"সেই মহাশক্তি পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন এবং সঙ্গে করে এনেছিলেন তাঁর অনুপম ভাস্বর শক্তি ও প্রেম আর তাঁর একান্ত তীব্র দিব্য-আনন্দ, যা এ পর্যন্ত জগতে অজ্ঞাত ছিল।

স্থূল জগতের আবহাওয়া তার দ্বারা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল, যার সব কিছু হয়ে উঠেছিল নতুন এবং সম্ভাবনায় ভরপুর।

কিন্তু এখানে, এই মর্তলোকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কাজ করবার জন্যে তিনি চেয়েছিলেন যৎসামান্য গ্রহণ-সামর্থ্যসম্পন্ন আধার। অন্তত এমন একজনকে পেলেও তাঁর চলত, যার দেহে এবং প্রাণে তাঁর কাজের উপযোগী অবশ্য-প্রয়োজনীয় গুণগুলি বর্তমান,

অর্থাৎ এমন এক আদর্শ বীরপুরুষ, যে হবে অখণ্ড পবিত্রতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিমূর্তি, সেই সঙ্গে তার দেহটি হবে শৌর্যে বীর্যে এমনই বলীয়ান যে তাঁর আনন্দের ভাগীরথীধারাকে অবিকম্পিত ভাবে সাম্যের অবস্থায় ধারণ করতে পারবে।

কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর ঠিক যেমনটি দরকার তেমন আধার তিনি পেলেন না। মানুষ মানুষই থাকতে চায়। একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে যেমনকার তেমনটিই থাকতে চায়। উর্ধ্বের মানুষ হতে তারা চায় না, হয়ত বা পারেও না। যে প্রেম তাদেরই সমস্তরের তাকেই তারা ধরতে বুঝতে প্রকাশ করতে পারে, অর্থাৎ মানুষের প্রেম। কিন্তু দিব্য আনন্দের যে অপরূপ মাদকতা, তা তাদের উপলব্ধির বাইরে।

তাই মাঝে মাঝে তাঁর ফিরে যেতে ইচ্ছা হয়, কারণ দেখেছেন যে পৃথিবী তাঁকে গ্রহণ করবার জন্যে এখনও তৈরী নয়। কিন্তু তাঁর তিরোধান হবে পৃথিবীর পক্ষে মর্মান্তিক পরাজয়। অবশ্য একথা সত্যি যে বর্তমানে তাঁর আবির্ভাব নামে মাত্রই বলা চলে, কারণ কার্যকারিতার দিক দিয়ে তা বিশেষ কিছুই নয়, যেহেতু তাঁর আত্মপ্রকাশের কোন সুযোগই নেই। কিন্তু তা হলেও, জগতের দিব্যকর্মের জন্যে এভাবেও তাঁর সহায়তার শক্তি বিপুল কারণ মানব দেহকে রূপান্তরিত করবার জন্যে ভগবৎ-জননীর সকল প্রকাশরূপের মধ্যে একমাত্র এঁরই আছে সবচেয়ে বেশী শক্তি। বাস্তবিক যে মানুষের দেহকোষগুলি দিব্য-আনন্দের সংস্পর্শে স্পন্দিত হয়ে উঠতে পারে, সেই আনন্দকে গ্রহণ এবং ধারণ করে রাখতে পারে, সে কোষগুলি হবে নতুন জীবনের চেতনায় সঞ্জীবিত, অমরত্ব লাভের পথে সেই মানুষরাই হবে অগ্রদূত। কিন্তু দিব্য-আনন্দের স্পন্দন আর সাধারণ জীবনের ভোগতৃপ্তির স্পন্দন, একই সঙ্গে প্রাণ ও দেহগত মানব-আধারে স্থান পেতে পারে না। তাই যে আধার সেই দিব্য আনন্দকে গ্রহণ ও ধারণ করতে পারার মতন অবস্থা লাভ করতে চায়, তাকে পার্থিব সকল ভোগলিপ্সা একেবারে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে হবে।

কিন্তু যারা জীবনের সাধারণ ভোগলিপ্সা নিঃশেষে ত্যাগ করতে পারে অথচ সেই সঙ্গে কর্মময় জীবন থেকেও একেবারে সরে দাঁড়ায় না এবং কঠোর বৈরাগ্য সাধনে লেগে যায় না, তেমন লোকের সংখ্যা জগতে অতিশয় বিরল। আবার যারা বোঝে যে কর্মময় জীবনের মাঝেই রূপান্তরের সিদ্ধি লাভ করতে হবে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ অল্পবিস্তর বিপথগামী হয়ে, পার্থিব ভোগের তৃপ্তিকেই দিব্য আনন্দের একটা প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তি বলে গ্রহণ করতে সচেষ্ট, এবং এই ভাবে ব্যক্তিগত ভোগের সন্ধানকেই ন্যায্য বলে সমর্থন করে নিজেদের রূপান্তরের পথে প্রায় অলঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করে বসে।"

আজ যদি এখানেই থামা যায়, ত কেমন হয়? পরের বারে শেষ করা যাবে। আমি তাহলে অনুসন্ধান করার সময় পাব।

বেশ, তাহলে সেই ভাল। এখন যদি তোমরা কেউ কিছু জানতে চাও (মা অনেকক্ষণ নীরব) কই, বল।

আজ কেবল ছাত্ররাই নয়, যে কেউ কিছু বলতে চাও বলতে পার....ছোটবড় নির্বিশেষে যে কেউ বলতে পার।

বয়োজ্যেষ্ঠদের একজন মা, যদি কেউ আগে সাফল্য লাভ করতে না পেরে থাকে, সে আবার চেষ্টা করতে পারে ত?

শ্রীমা চেষ্টা সর্বদাই করতে পার। ...পৃথিবী প্রতিমুহূর্ত নিজেকে নতুন করে সৃষ্টি করছে। তুমি এই মুহূর্তে এক নতুন জগত সৃষ্টি করতে পার, যদি জান কেমন করে তা করতে হয় অর্থাৎ যদি নিজের প্রকৃতিকে আমূল বদলে ফেলতে পার।

আমি ত বলিনি, সেই দিব্য-শক্তি অন্তর্ধান করেছেন। আমি বলেছি, মাঝে মাঝে তাঁর ইচ্ছা হয় ফিরে যেতে, যখন দেখছেন লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করবার জন্যে মোটেই ব্যস্ত নয়।

কনিষ্ঠদের একজন কিন্তু মা, অবতরণ তিনি যখন একবার করেছেন, তার মানেই ত সম্ভাবনা তিনি দেখেছিলেন বলেই করেছেন?

শ্রীমা হ্যাঁ তিনি অবতরণ করেছিলেন, কারণ সম্ভাবনা একটা ছিল, তখন সব কিছুই একটা বিশেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল এবং তাঁর অবতরণের কাল পূর্ণ হয়েছিল।

যথার্থত তিনি অবতরণ করেছিলেন, তার কারণ, আমি ভেবেছিলাম মানুষের জীবনের রূপান্তর, তার আমূল পরিবর্তন, তখন সম্ভব, ভেবেছিলাম তিনি সফলকাম হতে পারবেন। (নীরব) সম্ভাবনা ত সর্বদাই থাকে, সব সময়েই...(এখানে একটু থেমে, যেন চুপিচুপি মা বললেন) তবে সে সব বাস্তবে পরিণত করা চাই। তোমাদের ওই যে কাল পূর্ণ হবার কথা বললাম, তার একটা প্রমাণ, এমন বিশেষ একটা সময়ে সেই মহাশক্তি অবতরণ করেছিলেন যখন দু-তিন সপ্তাহ ধরে শুধু এই আশ্রমেই নয়, বিশ্বময় সর্বত্র আকাশ বাতাস দিব্য আনন্দের এমন এক প্রচণ্ড শক্তিতে ভরপুর হয়ে উঠেছিল, আর তা এতই প্রগাঢ় ছিল এবং এমনই অদ্ভুত শক্তি সৃষ্টি করেছিল, যে তার ফলে, আগে যে সব জিনিস করতে দারুণ কঠিন বোধ হত তখন তা চোখের নিমেষেই করা সম্ভব হতে লাগল।

কিন্তু ঠিক তার পরেই শুরু হল প্রতিক্রিয়া, আর তা সমগ্র বিশ্বময় ছড়িয়ে গেল। কিন্তু আমার ত মনে হয় না তোমাদের মধ্যে একজনও কেউ এটা লক্ষ্য করেছিলে। তোমরা হয়ত বলতেই পারবে না, কবে সেটা ঘটেছিল।

ছোটদের একজন মা, কবে ঘটেছিল? (প্রশ্ন শুনে সবাই হেসে উঠল)

শ্রীমা তারিখগুলো আমার মনে নেই। অবশ্য কাগজপত্র নিলিয়ে খোঁজ করলে তারিখটা খুঁজে পেতে পারি। তবে আমার কাছে ও ভাবে হিসেব করার কোন মূল্য নেই। কেবল এইটুকু বলতে পারি, শ্রীঅরবিন্দের দেহরক্ষার আগে এই অবতরণ হয়েছিল এবং তিনি ঘটনাটি আগে থেকেই জেনেছিলেন এবং বাস্তবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

(নীরব)

তারপর নিশ্চেতনার (inconscient) সঙ্গে দুর্দান্ত সংঘর্ষ বেধে গেল। কারণ আমি যখন দেখলাম, মানুষের মধ্যে যে গ্রহণ-সামর্থ্য থাকা উচিত তা নেই, তখন আমি নিশ্চেতনাকেই তার জন্যে দায়ী করলাম এবং সেখানে যুদ্ধের জন্যে তৈরী হতে লেগে গেলাম। বলছি না যে এর ফলে লাভ কিছু হয়নি। তবে যতটা আশা করা গিয়েছিল, আর যতটা পাওয়া গেল তার মধ্যে তফাৎ অনেক।

কিন্তু তোমাদের যে এ সব কথা বলছি তার কারণ, তোমরা রয়েছ আমার এতই কাছে,

এই পরিবেশে দিনরাত মানুষ হচ্ছ, কিন্তু...বলতে পার, তোমাদের মধ্যে কেউ কি কিছু লক্ষ করেছিলে? তোমরা তোমাদের প্রতিদিনকার ক্ষুদ্রজীবন নিয়েই মশগুল, নয় কি?

বয়স্কোটদের একজন মা, আমার মনে হয় ১৯৪৬ সালে এটা ঘটে, কারণ সে সময়ে তুমি আমাদের অনেক কথাই বলেছিলে।

শ্রীমা ঠিক তাই।

(মা অনেকক্ষণ নীরব রইলেন)

ছোটদের একজন আচ্ছা মা, এখন তাহলে আমাদের কি করা উচিত, এই মহাশক্তি যখন এসেছেন?

শ্রীমা কি করা উচিত তা জান না? তুমি... (মা নীরব) চেষ্টা কর তোমার চেতনাকে বদলে ফেলতে।

(মা অনেকক্ষণ নীরব রইলেন)

বেশ, এখন তোমরা কে কি জানতে চাইছিলে বল? (ছোটদের একজনের দিকে তাকিয়ে মা বললেন), কি, কোন প্রশ্ন নেই?

শিশুটি আচ্ছা মা, একজনও নেই?

শ্রীমা (তখনও আমস্থ ছিলেন, তাই ভাল শুনতে পান নি), অঁা, কি বলছ?

শিশুটি (আবার) একজনও কি নেই?

শ্রীমা জানি না তা!

শিশুটি তার মানে, আশ্রমে এখন এত লোককে নিয়ে তুমি বৃথাই সময় নষ্ট করছ?

শ্রীমা ওঃ! তবে কি জান, সূক্ষ্মদৃষ্টির দিক থেকে আশ্রমটি হল একটি নির্বাচিত কেন্দ্র। বাইরের দিক থেকে দেখলে তুমি আমাকে বলতে পার, জগতে এমন ঢের লোক আছে যারা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত, এবং আমি তোমার সে কথার প্রতিবাদ করব না। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টির দিক থেকে এ আশ্রম হল একটি নির্বাচিত কেন্দ্র। এখানে... ছোটদের মধ্যে বেশীর ভাগই যারা রয়েছে তাদের সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে বলা চলে, আগে তাদের কথা দেওয়া হয়েছিল যে পূর্ণসিদ্ধির দেবদুর্লভ তারা সবাই উপস্থিত থাকবে। অবশ্য তাদের সে কথা এখন মনে নেই। (বলে মা হাসলেন) আমি ত আগে তোমাদের কতবার বলেছি, মানুষ যখন পৃথিবীতে অবতরণ করে, তখন সে মাথাটা নিচের দিকে করে সোজা পড়ে যায়। তাই তারা বোকা বনে যায়। (সকলের উচ্চ হাস্য) অবশ্য সেটা দুঃখের বিষয়। কিন্তু তাহলেও এই হতবুদ্ধির অবস্থা কাটিয়ে ওঠা যায়, নয় কি? সে জন্যে চেষ্টা করা দরকার, অর্থাৎ নিজের অন্তরে প্রবেশ করা এবং সেখানে নিজের মধ্যে সেই অমর চেতনাটিকে আবিষ্কার করা। সেটি করতে পারলেই পরিষ্কার দেখতে পাবে, তখন ঠিক মনে পড়বে সেই অবস্থার কথা, যখন তোমরা আকুলভাবে প্রার্থনা করেছিলে, যেন দিব্যসিদ্ধির সময় সবাই এখানে উপস্থিত থাকতে পার। তবে, সত্যি বলতে কি জান, তোমরা এখানে এতই সহজে ও সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করছ যে নিজেরা একটু কষ্ট সহ্য করতে রাজী নও! বল দেখি

তোমরা ক-জন আছ, যাদের অন্তরে তোমাদের অন্তর্দেবতাকে জানবার, তাঁকে আবিষ্কার করবার জন্যে একটা সত্যিকারের তীব্র ব্যাকুলতা জেগেছে? যথার্থই তোমরা কি, তোমাদের প্রকৃত কাজ কি, কেন তোমরা এখানে রয়েছ, তা জানবার তা বুঝবার জন্যে অদম্য উৎসাহ কার হয়েছে? দিনগুলো তোমাদের দিব্যি নির্ভাবনায় কেটে যাচ্ছে, বরং সব কিছু যদি ঠিক ঠিক মনোমত না হয় তোমরা প্রতিবাদ কর। তারপর গয়ংগচ্ছ চালে পা ভাসিয়ে দাও। তবে যদি ওরই মধ্যে কখন অন্তরে একটা ব্যাকুলতা জেগে ওঠে, যদি নিজের ভিতরে কোন বাধাবিঘ্ন অনুভব কর, তখন মনে মনে বল, "যাক, মা আছেন, তিনিই আমার সব ঠিক করে দেবেন" আর পরক্ষণেই অন্য কিছুতে মন দাও।

তরুণটি আবার আচ্ছা না, আগেকার দিনে ত আশ্রমে খুব কড়াকড়ি ছিল, আজ কাল আর তা নেই কেন?

শ্রীমা ঠিক কথা, কেন নেই? আমিও ত সর্বদা সেই কথাই বলি। এ ব্যাপারটা কবে থেকে শুরু হয়েছে জান? যবে থেকে আশ্রমে আমরা শিশুদের থাকতে দিতে বাধ্য হলাম। এতটুকু টুকু বাচ্চাদের (মা হাতের ভঙ্গি করে দেখালেন) ত আর তুমি কৃচ্ছ্র-তার জীবন পালন করতে শেখাতে পার না, সেটা মোটেই সম্ভব নয়। এ হল গত মহাযুদ্ধের উপহার! লোকেরা যখন টের পেল, পণ্ডিচেরীই হল পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে নিরাপদ স্থান, তখন তারা দলে দলে বাচ্চাদের নিয়ে আসতে আরম্ভ করল এবং তাদের এখানে রাখবার জন্যে আশ্রয় চাইল। কি করে আর তখন তাদের না বলা যায় বল!...ঠিক এই ভাবেই ব্যাপারটা ঘটল, অন্য কোনভাবে নয়।

গোড়ার দিকে সর্বপ্রথম শর্তই ছিল, এখানে যে আসবে তার সংসারের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক থাকবে না। কেউ যদি বিয়ে করে থাকে, তাকে সেই মুহূর্ত থেকে ভুলে যেতে হবে তার স্ত্রী বা ছেলেপুলে ছিল। তাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে, কোন সংশ্রবই আর থাকবে না। যদি কখন কারুর স্ত্রী, তার স্বামী এখানে আছে বলে আসবার অনুমতি চাইত, তাকে উত্তর দেওয়া হত, "এখানে তোমার কোন প্রয়োজন নেই।

আগেকার দিনে এখানে যে কত কড়াকড়ি ছিল তা আর বলবার নয়। সুদীর্ঘ কাল ধরে প্রথম অনুশাসনই ছিল, "এখন থেকে তোমার আর সংসারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রইল না।" কিন্তু এখন ত আমরা তা থেকে বহু দূরে সরে গেছি, নয় কি? তবে, ওই যে বললাম, এই সরে যাওয়ার সূত্রপাত হল ওই ভাবে। কিন্তু ভেব না যে আগেকার ওই নিয়মটার এখন আর কোন দরকার নেই বলে সাব্যস্ত হয়ে গেছে। ও অনুশাসনটির বিশেষ দরকার আছে। যে সব যোগাযোগ তোমাকে সাংসারিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রাখবে, তোমাকে সাধারণ জীবনের দাসানুদাস করে তুলবে, সেগুলি যতদিন বজায় রাখবে, ততদিন কি আর বলা চলে একমাত্র ভগবানই তোমার অবলম্বন? সেটা ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছুই নয়। ও কখনই সম্ভব হতে পারে না। তবে যদি কষ্ট করে একবার আশ্রমের সেই গোড়ার নিয়ম-কটা একটু পড়ে দেখ, দেখতে পাবে, সাধকে সাধকে মেলামেশা করা পর্যন্ত তখনকার দিনে বিপদজনক এবং বাঞ্ছনীয় নয় বলে বিবেচিত হত। আশ্রমের পরিবেশটি তখন এমন ভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল যে একমাত্র দিব্যজীবন ছাড়া অন্য কোন

বস্তুতই সেখানে স্থান ছিল না। কিন্তু, ওই যে বললাম, আস্তে আস্তে...সেটি বদলে গেছে।

তবে এরও একটা লাভের দিক আছে। আগে লোকেরা বড় বেশী জীবন থেকে তফাতে ছিল। জীবনের অনেক সমস্যা আছে যেগুলো তখন ভাল ফুটে ওঠেনি। অথচ সাধনার পূর্ণ আত্মবিকাশ যখন লাভ হয়, তখন হঠাৎ সেগুলো সামনে এসে দাঁড়ায়ই। তবে সমস্যাগুলোকে একটু বেশী তাড়াতাড়ি আসতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এগুলোর সমাধান ত একদিন করতেই হত। তাই এভাবে অনেক জিনিসই শেখা যায়। অনেক বাধাবিঘ্ন কাটাতে পারা যায়। কেবল ব্যাপারটা বড় বেশী জটিল হয়ে দাঁড়ায়, এই যা। আর হয়ত বর্তমান অবস্থায় যখন নানারকমের লোকের সংখ্যা এত বেশী বেড়ে গেছে অথচ যাদের কিছুমাত্র ধারণা নেই, কেন তারা এখানে রয়েছে তখন সাধকদের পক্ষে আদর্শের প্রতি আগের চেয়েও ঢের বেশী অভিনিবিষ্ট হওয়া দরকার বৈকি।

গোড়ায় আমরা আরম্ভ করেছিলাম জন পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ জনকে নিয়ে, তারপর সেটা বাড়তে বাড়তে গিয়ে দাঁড়াল দেড়শ-তে। কিন্তু তখনও, যখন সংখ্যা হয়েছে ১৫০ তখনও সব মিলিয়ে এমন একটা পূর্ণ অখণ্ডতার ভাব ছিল, আমার চেতনায় সবাই ছিল ঠিক যেন একটি ডিম্বকোষের মধ্যে ধরা। আমার এত কাছে সবাই ছিল ঠিক যে আমি তাদের প্রত্যেকের জীবনের অন্তরের এবং বাহিরের সকল গতিধারা সর্বক্ষণ পরিচালিত করতে পারতাম। সবাই ছিল আমার সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে, আর তা প্রতিদিন প্রতিক্ষণ প্রতিটি মুহূর্তে। আমার বিশ্বাস তারা তখন সাধনায় বেশ দ্রুত উন্নতি করছিল, আর সেটাই ত স্বাভাবিক। আমিই যে তখন তাদের জন্যে সারাক্ষণ ধরে সাধনা করতাম, এ একেবারে প্রত্যক্ষ সত্য।

কিন্তু তারপর যখন দলে দলে সবাই, তিন-চার-পাঁচ বছরের প্রায় দুগ্ধপোষ্যদের নিয়ে এসে হাজির হতে লাগল, তখন কি আর তাদের নিয়ে সাধনা করা যায়? সে প্রশ্নই ওঠে না। যেটা করা সম্ভব এবং আমি যা করছি, তা হল, এদের সকলের উপর চেতনাকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং চেষ্টা করা, যাতে এরা সবচেয়ে ভাল অবস্থায় থেকে বড় হয়ে উঠতে পারে।

অবশ্য এরও একটা লাভের দিক আছে। সেটা কি জান, আগে যেমন সবাই আমার উপর সম্পূর্ণরূপে এবং একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে নির্ভরশীল ছিল, এখন থেকে তার বদলে প্রত্যেককেই খাটতে হবে, প্রত্যেকের ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকুকে কাজে লাগাতে হবে, আর সত্যিই এটা খুবই ভাল।

মনে নেই, কাকে যেন আজই সকালে বললাম...তার ছিল জন্মদিন, বললে, আজ আমার আঠার বছর পূর্ণ হল...মনে পড়ছে না, তাকেই বললাম কিনা...

আমি বললাম আমার আঠার থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে আমি সচেতন ভাবে এবং অনুক্ষণ ভগবৎ সান্নিধ্যের সঙ্গে ঐক্য উপলব্ধি করি। সম্পূর্ণ একাএকাই আমি এই অবস্থাটি লাভ করি, জনপ্রাণীও কেউ আমাকে সাহায্য করবার ছিল না, এমন কি ও সম্বন্ধে একখানা বই পর্যন্ত ছিল না। এর কিছু কাল পরে আমার হাতে একখানা বই এসে গেল, বিবেকানন্দের "রাজযোগ"। কি অপূর্ব সম্পদই না পেয়ে গেলাম বলে মনে হল তখন। কেউ যে

একজন এভাবে আমাকে বুঝিয়ে দেবার রয়েছে...। তার ফলে, কয়েক মাসের মধ্যেই আমি এত সব বস্তু লাভ করলাম, যা ওভাবে না হলে আমার পেতে অনেক বছর লেগে যেত।

এর পর একদিন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। আমার বয়স তখন বোধহয় কুড়ি কি একুশ। লোকটি ভারতবাসী, এখান থেকেই গিয়েছিল। সে আমাকে গীতার বিষয় বলে। গীতার একটি ফরাসী অনুবাদ সে আমাকে পড়তে দেয়। অনুবাদটি অবশ্য তেমন ভাল ছিল না, কাঁচা হাতের কাজ। কিন্তু তখন গীতার ফরাসী অনুবাদ ও ছাড়া আর ছিল না, আর আমিও অন্য ভাষা তখন ভাল করে বুঝতাম না। ইংরিজী অনুবাদগুলিও তথৈবচ। তাছাড়া শ্রীঅরবিন্দ তখন গীতার ভাষ্য লেখেনই নি।

লোকটি আমাকে বইখানি পড়তে বলে এবং পড়ার কৌশলটি বলে দেয়,—অবশ্য সেটা তার নিজেরই কৌশল,—বললে, গীতার এই অনুবাদটি পড়ুন এবং শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরে অবস্থিত ভগবানের প্রতীক বলে গ্রহণ করুন, যে ভগবান আপনার নিজের মধ্যে রয়েছেন তিনি।" মাত্র এইটুকুই লোকটি আমাকে বলে, "এই অনুবাদটি পড়ুন আর এই নির্দেশটুকু মনে রাখবেন, যে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ হলেন অন্তরে অবস্থিত ভগবান, যে হৃষীকেশ হৃদয়ের মধ্যে রয়েছেন।"—এর পরে এক মাসের মধ্যে আমার যা কিছু পাবার ছিল পেয়ে গেলাম।

এখন ধর তোমাদেরই কথা, তোমরা এখানে রয়েছ, কেউ কেউ খুব ছোটটি থেকে, সমস্ত কিছুই তোমাদের পাশ্চি পড়ানর মতন করে বলে, বুঝিয়ে, যেন চিবিয়ে পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে, আর শুধু কথায় নয়, চৈত্যপুরুষের সাহায্যে এবং যত রকমে পারা যায় তোমাদের এই অন্তরের আবিষ্কারের পথে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ তোমরা দিব্যি আছ, হেসে খেলে বেড়াচ্ছ। ও সব জিনিসের...যখন হবার হবে, তখন হবে তা খানা এই রকম....অবশ্য যদি কখন সে চিন্তাটাও মনে উদয় হয়।

তাহোক, এতে আমি মোটেই নিরাশ হই না, বরং এ সবে বেশ মজাই লাগে। তবে অন্য কতকগুলো জিনিস আছে যে গুলোকে আমি বিশেষ ভাবে গুরুতর মনে করি। (এখানটাতে মা খুব আস্তে আস্তে খুব স্পষ্ট করে বলতে লাগলেন) তা হল, যখন তোমরা নিজেকে নিজে ঠকাতে চেষ্টা কর!... সেগুলো কিন্তু মোটেই ভাল নয়, একেবারেই অশোভন। এক-কে আর বলে চালাতে যেও না, সেটা কখনই উচিত নয়। যেমন, কথায় বলে, বেড়ালকে বেড়ালই বলবে এবং কুকুরকে কুকুর। তেমনি মানুষের বৃত্তি-প্রবৃত্তিগুলোকে মানুষের বৃত্তি-প্রবৃত্তিই বলবে। যেগুলো নিছক মানুষের জন্যে, আমার কাছে এসে বোল না, সেগুলো ভগবানের জন্যে। এই হল আমার কথা। যখন সম্পূর্ণ সাধারণ চেতনায় জীবনে বাস করছ, তখন অতিমানসিক অভিজ্ঞতা অর্জন করছ বলে ভান করতে যেও না।

যাক্ যদি নিজেকে স্পষ্ট করে নিজের চোখের সামনে দেখ, আর যদি জান, তুমি কি রকমের, আর যদি দৈবাৎ একটা সংকল্প করতে পার...

সত্যিই আমি অবাক হয়ে যাই, (এবার মা খুব জোরে জোরে বলতে লাগলেন) যে তোমরা এর জন্যে অন্তরে একটা তীব্র আকুলতা অনুভব কর না,—"কি করে সে বস্তুকে জানা যায়?" এ আগ্রহ কেন যে তোমাদের অন্তরে জাগে না, তা বুঝতে পারি না। কারণ তোমরা যে জান, তোমাদের বলা হয়েছে, বার বার করে বলা হয়েছে, শুনে শুনে তোমাদের

কানে ভালো লাগার মতন অবস্থা হয়েছে—তোমরা জান যে তোমাদের অন্তরে বিরাজ করছে এক দিব্যচেতনা অথচ তোমরা দিনের পর দিন, খেলা করে বেড়াচ্ছ, লেখাপড়া শিখছ, রাতের পর রাত ঘুমিয়ে কাটাচ্ছ, কিন্তু অন্তরে এমন একটা উৎসাহের তীব্র ইচ্ছা জেগে উঠছে না যে তোমরা নিজের সঙ্গে সংযুক্ত হতে, হাঁ৷ তোমাদের সত্যিকারের আপনার সঙ্গে, এই এখানে (মা তাঁর নিজের বুকের মাঝখানটাতে আঙুল দিয়ে দেখালেন) সংযুক্ত হতে চাও। সত্যিই এ একেবারে আমার বোধের অগম্য।

জীবনে যে দিন প্রথম আমি জানলাম, কেউ আমাকে বলে দেয় নি, শিখিয়ে দেয় নি, জানলাম একটা অভিজ্ঞতার ফলে, যে আমাকে আমার নিজের মধ্যেই একটি বস্তুকে আবিষ্কার করতে হবে, তখন প্রায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে সেটিই হয়ে দাঁড়াল আমার জীবনের সবচেয়ে প্রধান, সবচেয়ে প্রথম বস্তু। সবার আগে সেটাই করতে হবে। (এখানে মা আরও জোরে বললেন) তারপর—যে কথা তোমাদের এইমাত্র বললাম—যখন পেলাম একখানা বই, একজন লোককে, পেলাম সামান্য একটু ইঙ্গিত—"যদি এইভাবে চল, পথ তোমার সামনে দেখতে পাবে"—একথা শোনামাত্র আমি ঝড়ের বেগে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, পৃথিবীতে কার সাধ্য তখন আমাকে আটকায়।

আর তোমরা, আজ কত বছর থেকে এখানে আছ? আধঘুমন্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছ! হয়ত মাঝে মাঝে মনে জাগে, বিশেষ করে আমি যখন তোমাদের এই সব বিষয়ে বলি, অথবা কখন যদি এ সম্বন্ধে কিছু পড়, তখন। কিন্তু কোথায় সেই তীব্র অনুরাগ, সেই সর্ববিদ্রবিকারী ইচ্ছা কোথায়...সেই একান্ত একমুখী সমর্পণ কই...যা সব কিছুতেই জয়ী হয়?

একটু আগে তোমাদের মধ্যে কে যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, এখন কি করতে হবে?" (ছাত্রীটি সাড়া দিয়ে বলল, আমি!) মা বললেন, এই হল তার উত্তর বাছা! এইটিই করতে হবে।

আর একটি ছাত্রী আচ্ছা মা, কি করে আমরা নমনীয় হতে পারি, যাতে তোমার স্পর্শ ঠিক ঠিক আমাদের উপর কাজ করতে পারে?

শ্রীমা নমনীয় হওয়া? যখন তোমার মনটি শুভইচ্ছায় পূর্ণ থাকবে, যখন তুমি স্থির জেনেছ যে তুমি কিছুই জান না এবং সবই তোমাকে শিখতে হবে, যখন তুমি একেবারে নিঃসন্দেহ যে তুমি কিছুই করতে পার না, সে ক্ষেত্রেও সব কিছু কি করে করতে হয় তা তোমাকে শিখতে হবে, তখন তুমি খানিকটা নমনীয় হতে শুরু করবে, আর যখন তোমার উপর একটা শক্তির চাপ অনুভব করবে তখন তুমি সাড়া দেবে। শ্রীঅরবিন্দের ওই লেখাটি বই খুলে পড়বে, ওই যে একেবারে শেষের পৃষ্ঠায় তিনি বর্ণনা করেছেন, মানুষ যে অবস্থায় বাস করে তার নিখুঁত ছবিটি তিনি এঁকে দিয়েছেন, তার দেহগত চেতনার বর্ণনা, তার মনের বর্ণনা, তার প্রাণের বর্ণনা রয়েছে এর মধ্যে। আর এ সব ত তিনি কত কতবারই বলেছেন।

(অনেকক্ষণ নীরব থেকে, শ্রীমা নিজে The Mother বইখানির শেষের দিকের

পাতা উল্টে উল্টে বের করলেন সেই অংশটি, এবং পড়তে লাগলেন) এই যে রয়েছে, শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন

"কিন্তু সাবধান, তোমার ক্ষুদ্র মন দিয়ে ভগবৎ-জননীকে বুঝতে, বিচার করতে যেও না। যে সব বস্তু মনের নাগালের অতীত, সে সবকে পর্যন্ত মানুষের মন চায় নিজের ছাঁচে ফেলতে এবং নিজের মাপকাঠি দিয়ে তার পরিমাপ করতে, তার সংকীর্ণ যুক্তি আর ভ্রান্তিবহুল ধারণা দিয়ে যাচাই করতে, তার উদ্ধত আর শূন্যগর্ভ অজ্ঞান এবং ক্ষুদ্র কুটিলতা-পূর্ণ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে চায়।..."

এইটি মাঝে মাঝে পড়া উচিত, তাহলে দেখবে তোমাদের সুবুদ্ধি গজাবে।
যাক, আর কারুর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি ? বলেছি আজ যে কেউ প্রশ্ন করতে পার।

বয়স্কদের একজন কঠোর নিয়ম পালন কি আসক্তি ক্ষয় করতে আমাদের সাহায্য করে না ?

শ্রীমা, একটুও না, ওর দ্বারা তোমার গর্বকেই করে তোলে পর্বতপ্রমাণ, আর তা ভেঙে বসে তোমার মধ্যে।

প্রশ্ন কিন্তু তুমি ত ভোগলিপ্সা ত্যাগ করতে বলেছ, তাহলে ?

শ্রীমা অবশ্যই ভোগলিপ্সা ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু কঠোর তপস্যার দ্বারা কেউ ভোগলিপ্সা কাটাতে পারে না। তুমি তোমার অন্তরের উদ্ভাসিত আলোর দ্বারা এবং সত্তার শুদ্ধির দ্বারা তোমার ভোগের আসক্তিকে কাটাতে পার। কারণ ভোগের মধ্যে যা কিছু স্থূল, অন্ধকারাচ্ছন্ন, তমোময় এবং অপ্রীতিকর তা তখন তুমি প্রত্যক্ষ করবে এই জ্যোতি এবং শুদ্ধির দ্বারা।

প্রশ্ন : কিন্তু আমরা যদি স্থূল উপভোগ নিয়েই থাকি, তাহলে সেগুলোকে কাটিয়ে উঠব কি করে ?

শ্রীমা আমার ত মনে হয় না তোমরা এখানে শুধু স্থূল উপভোগের জন্যেই বাস করছ। কারণ, আমার বিশ্বাস, তাহলে তোমরা এখানে টিকতেই পারতে না।

প্রশ্ন : কিন্তু সবই ত স্থূল উপভোগ, নয় কি ? আমরা আছি আরামে, খাচ্ছি-দাচ্ছি মজা করছি, এ সব কি স্থূল উপভোগ বলব না ?

শ্রীমা (সবিস্ময়ে) এ সব করছ স্থূল উপভোগের জন্যেই কি ? হয়ত তোমার ধারণা তাই, তাহলে আর তোমায় এর উত্তরে আমি কি বলব ! একটা কিছু, যা উর্ধ্বের জীবনের জন্যে উন্মুখ হয়, আর অন্য একটা, যা সাধারণ জীবনের মধ্যেই সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, এ দুয়ের মধ্যে যে তফাৎ আছে তা যদি তুমি বুঝতে না পার, তাহলে আমি আর তোমাকে কি সাহায্য করতে পারি ? আগে নিজের মধ্যে সেটাকে খুঁজে পেতে হবে।

প্রশ্ন কিন্তু সাহিত্যিক কিছু নিয়ম সংযমের কি কোন সার্থকতা নেই ?

শ্রীমা তুমি নিজে যদি কোন নিয়ম মেনে চলতে চাও, আর সেটা যদি অতিমাত্রায় বোকার মতন না হয়, তাহলে তার দ্বারা তুমি লাভবান হতে পার। আমার বক্তব্য হচ্ছে, নিয়ম নীতি তপস্যা প্রভৃতি কৃচ্ছ্র সাধনার যে সব বিধিনিষেধ সাধারণত লোকেরা পালন করে থাকে, সেগুলো কেবল তোমার অহঙ্কারকেই স্ফীত করে তোলার এক উৎকৃষ্ট উপায়। ও সবের দ্বারা তোমার অহং এতই দুর্দান্ত হয়ে উঠবে, যে জীবনে কোন দিন আর তোমার স্বভাবের পরিবর্তন সম্ভব হবে না। তাই সবার আগে ও সব বস্তুকে ভেঙে গুঁড়িয়ে সাফ করে ফেলা চাই।

আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম শর্তই হল, এক সুস্থ সবল বিনয়ের ভাবকে অধিগত করা, যার দ্বারা তুমি পরিষ্কার দেখতে পাবে যে একমাত্র ভগবান যদি তোমাকে ধরে না থাকেন পুষ্ট না করেন সাহায্য না করেন আলোর পথ দেখিয়ে পরিচালিত না করেন তাহলে তুমি একেবারে কিছুই নও, তোমার কোন মূল্যই নেই। এটা যখন তুমি অনুভব করবে, তখনই তোমার জ্ঞানের উন্মেষ হতে থাকবে, কিন্তু তার আগে নয়।

আগের একটি শিশু না, আর একটি কি যে তুমি লিখে এনেছ বললে ?

শ্রীমা হাঁ, ভেবেছিলাম তোমরা কেউ আমাকে ওটা জিজ্ঞাসা করবে, বলবে, "তোমার ডাকেই ত সেই শক্তি নেমে এসেছেন তবে কেন তোমারই জন্যে তিনি পৃথিবীতে অবস্থান করবেন না ?" কিন্তু তোমরা ত কেউ তা জিজ্ঞাসা করলে না।

শিশুটি বাঃ, সে কি কথা ! আমরা ত অপেক্ষা করছি কখন ফাঁক পাব বলে। এখন বল না, সেটি কি ? আমাদের জানার খুবই আগ্রহ হচ্ছে।

শ্রীমা (প্রথমে পড়লেন তাঁর লেখাটি। খুবই ছোট্ট)

"সেই শক্তির কাছে আমার এই দেহটি হল একটি যন্ত্র মাত্র, অমন আরও কত অসংখ্যের মাঝে একটি, অনন্তকালের যাত্রাপথে অনাগতের দিকে এটি একটি। সেই মহাশক্তির কাছে এ দেহটির যদি কোন মূল্য থাকে ত তা হল, যে মূল্য পৃথিবী এবং পৃথিবীর লোকেরা একে দেয় এবং যে পরিমাণে এ দেহটি ওই দিব্যশক্তির অভিব্যক্তির ও প্রসারের কাজে সাহায্য করবার উপযোগী সেতুবন্ধ হয়ে উঠতে পারে।"

(এটি পড়ার পরে মা বলতে লাগলেন) আমি যদি এমন সব লোকেদের দ্বারা পরিবৃত হই, যারা ওই শক্তিকে গ্রহণ করতে পারে না, তাহলে আমি তাঁর কোনই কাজে লাগলাম না, এ একেবারে পরিষ্কার। তাই আমার দেহটি তাঁকে ধরে রাখতে পারে না, এবং নিঃসন্দেহেই নিজের কোন স্বার্থের জন্যে আমি তাঁকে পৃথিবীতে থাকতে বলতে পারি না। আর তা ছাড়া, এই সব শক্তি, এই সব ব্যক্তিত্ব, অনুক্ষণই ত অভিব্যক্ত হচ্ছেন। কিন্তু সে সব কখন কোন ব্যক্তিগত কারণেই আত্মপ্রকাশ করছেন না। ওই শক্তিদের মধ্যে একজনও আমার দেহকে সাহায্য করবার কথা কোনদিন ভাবেন নি, এবং আমিও তাঁদের সে কথা বলি না, কারণ তাঁরা সেজন্যে আসেন না। কিন্তু এ একেবারে ধ্রুব সত্য, যে আমার পরিবেশে যারা থাকে, তাদের যদি গ্রহণসামর্থ্য থাকত, আর উক্ত শক্তি যদি অনুক্ষণ অভিব্যক্ত

হতে পারতেন,—কারণ গ্রহণ-সামর্থ্য সম্পন্ন আধার যে এখানে রয়েছে,—তাহলে তা আমার দেহকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করত। কারণ তাহলে ওই সব দিব্য স্পন্দন আমার দেহের মধ্যে দিয়ে অবিরাম প্রবাহিত হতে থাকত এবং সেটাই আমার দেহটিকে খুব সাহায্য করত। কিন্তু উক্ত শক্তির অভিব্যক্তির কোন সুযোগই মিলল না...একেবারেই কোন সুযোগ হল না...। কেবল সেই সব লোকেদের সঙ্গেই তাঁর দেখা হয়, যারা মোটে অনুভবই করতে পারে না যখন তিনি আমার দেহে বিরাজ করেন, তারা লক্ষই করে না। তাদের কাছে তাঁর থাকা বা না-থাকার মধ্যে কোন তফাৎই নেই। সুতরাং কি করে তিনি নিজেকে অভিব্যক্ত করবেন?

আর আমিও তাঁকে এ কথা বলতে যাব না, "দয়া করে এসে আমার দেহটাকে বদলে রূপান্তরিত করে দিন।" সে ধরণের সম্বন্ধই আমাদের নয়। ...আর আমার দেহ নিজেই তা চাইবে না। ...সে কোন দিন নিজের কথা ভাবে নি, কোন দিন নিজের জন্যে মাথা ঘামায় নি। আমার দেহ কেবল কাজের দ্বারাই নিজের রূপান্তর ঘটাতে পারে। হাঁ, এ একেবারে নিশ্চিত যে যখন তিনি অবতরণ করলেন, তখন যদি একজনও কেউ তাঁকে গ্রহণ করতে পারত, আর যে শক্তি তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তা যদি তিনি প্রকাশ করতে পারতেন, তাহলে...

এমন কি তাঁর আসার অনেক কাল আগেও...একটি ঘটনার কথা তোমাদের বলতে পারি। সেটা হল, যখন আমি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যোগের জন্যে নামতে শুরু করলাম, মন থেকে প্রাণে নামতে আরম্ভ করলাম, অর্থাৎ যখন আমাদের যোগকে মনের স্তর থেকে প্রাণের স্তরে অবতরণ করালাম, আমার বয়স তখন চল্লিশ, চেহারা এমন কিছু বুড়িয়ে যায় নি, দেখতে আমায় চল্লিশের কমই লাগত। সে যাই হোক, আমার বয়স তখন চল্লিশ বছর আর ঠিক একমাসের যোগের পর আমাকে দেখতে যেন আঠার বছরেরটি বলে বোধ হতে লাগল। সেই সময়ে একজন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সে আমাকে আগে দেখেছিল, জাপানে আমার সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করত। সে এসে আমাকে দেখে প্রথমটা চিনতেই পারে নি। জিজ্ঞাসা করল, "সত্যই, এ কি সেই আপনিই?" আমি বললাম, "বোধ হচ্ছে ত তাই।"

কেবল যখন আমরা প্রাণ থেকে দেহের স্তরে নামলাম, তখন ও বস্তু সরে গেল, কারণ দেহের স্তরের কাজ ঢের বেশী কঠিন, এখানে অনেক কিছুই বদলাতে হল। কিন্তু ওরকম একটি শক্তি যদি তখন প্রকট হতেন এবং তাঁকে ধারণ করবার আধার যদি থাকত, তাহলে তার ফল সুদূরপ্রসারী হত। যাক, এ সব তোমাদের বললাম, কারণ জানতাম তোমরা কেউ প্রশ্নটা করবে, নইলে...আমার সঙ্গে তাঁর সে ধরনের সম্বন্ধই নয়।

আচ্ছা, ধর আমার এই দেহটার কথাই, যেটার এই দেহটা—এ অতিশয় নিরীহ, কোনদিন এ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে না, কোন শক্তিকেও আকর্ষণ করে না। নিজের কাজ ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর যতদূর সম্ভব ভাল করে সে তার কাজ করে। আর ঠিক এটাই ত হবার কথা, নয় কি? কর্মক্ষেত্রে তার যদি কোন মূল্য থাকে, ত সেটা নির্ভর করে তার প্রয়োজনীয়তার উপর, আর জগত তার যে মূল্য দেয় তার উপর, কারণ কাজ ত জগতের জন্যেই। নিছক দেহের দিক দিয়ে দেখলে, অসংখ্য দেহের মাঝে এটিও একটি—

(উঠে দাঁড়িয়ে মাঠ থেকে তাঁর ঘরের দিকে যেতে যেতে, সামনের শিশুদের মা বললেন) তোমরা যদি অন্তরে একটি ছোট্ট সংকল্প করতে পারতে, যে তোমাদের চৈত্যপুরুষকে তোমরা অনুভব করতে চাও, তাহলে আমার বৃথা সময় নষ্ট হত না।

আচ্ছা, তাহলে আজকের পালা এইখানেই শেষ।

(Bulletin, February 1978, Entretiens-র অনুবাদ)

বেদ ও শ্রীঅরবিন্দ

বেদের দেবতা

গৌরী ধর্মপাল

যেমন বৈদিক মন্ত্র নিয়ে তেমনি বেদের দেবতা নিয়েও ভুল বোঝাবুঝির অন্ত নেই। যেহেতু এই দেবতারা সংখ্যায় অনেক সেই হেতু বৈদিকরা হলেন বহুদেববাদী, অদ্বৈত একের ধারণা করতে অক্ষম। এবং যেহেতু এই সব দেবতাদের অনেকের রূপগুণকর্মের বর্ণনায় প্রাকৃতিক ঘটনার ছবি দেখতে পাওয়া যায়, সেহেতু এঁরা হলেন প্রাকৃতিক শক্তির পুরুষী-ভাব অর্থাৎ Personification মাত্র, এবং বেদের উপাসনা নামান্তরে প্রকৃতিরই বিভিন্ন শক্তির উপাসনা তাদের তুষ্ট করে স্বার্থসিদ্ধি করার জন্যে, বহুদেববাদী বৈদিক মন ক্রমে ক্রমে শেষের দিকে একের মহিমা বুঝতে পেরেছে এবং বহু ছেড়ে একের দিকে ঝুঁকেছে — এই ধরণের কতগুলি ভুল ধারণা পণ্ডিত এবং অপণ্ডিত দুই মহলেই এখনো পর্যন্ত চলছে। অথচ বহু দেবতার আড়াল থেকে একই দেবতা যে বারবার উঁকি দিচ্ছেন প্রত্যেক দেবতাই যে স্বরূপে সেই পরম দেবতা —এর পরিচয় ঋগ্বেদের প্রতি মণ্ডলে প্রতি সূক্তে প্রতি ঋকে, এই অখণ্ড একরস সাহিত্যের প্রতিটি বাক্-অণুতে ছড়ানো রয়েছে।

The Rigveda is one in all its parts, whichever of its ten Mandalas we choose, we find the same substance, the same ideas, the same images, the same phrases. The Rishis are the seers of a single truth, and use in its expression a common language. (On the Veda, p. 62).

'ঋগ্বেদ তার প্রতি অংশেই এক। তার দশটি মণ্ডলের মধ্যে যেটিকেই আমরা বাছি না কেন, দেখব, একই বস্তু, একই ভাব, একই রূপকল্প, একই কথার ধরণ। এক অনন্য সত্যের দ্রষ্টা হলেন ঋষিরা, এবং তা তাঁরা উচ্চারণও করেছেন একই ভাষায়।'

কি এই অনন্য সত্য, যার দ্রষ্টা বেদের ঋষিরা ?

In such hymns as this of Vamadeva's the ritualistic veil so elaboratcly woven by the vedic mystics vanishes like a dissolving mist before our eyes and there emerges the *Vedantic truth*, the *secret of the Veda* (*ibid*, pp. 110-11).

'বামদেবের এই সূক্তটির (ঋ ৪।৫৮) ধরণের সূক্তগুলিতে হয় কি, বেদের বরমীয়াদের এমন জমজমাট করে বোনা যজ্ঞের ওড়নাখানা যেন আমাদের চোখের সামনে ফিকে হতে-থাকা কুয়াশার মতোই মিলিয়ে যায়, আর তার জায়গায় ফুটে ওঠে বেদান্তের সেই সত্য—বেদের যা মর্মরহস্য।'

অর্থাৎ বেদান্তের সত্য এবং বেদের মর্মরহস্য—এ দুটি এক এবং অভিন্ন। সে

সত্যটি, সে রহস্যটি কি? সংক্ষেপে তা হল এই—সৃষ্টির যে বহুরূপ সহস্ররূপ অনন্তরূপ আমরা দেখি, তা হল এক অরূপ অপরূপ রূপকারের আত্ম-প্রতিকৃতি—self-portrait. এই বিপুল চরাচর জুড়ে আছেন শুধু সেই এক অনন্য অদ্বৈত একমেবাদ্বিতীয়ম্। তিনিই সব কিছু হয়ে আছেন, হয়ে চলেছেন, নিজেকেই গড়ছেন নিত্য নতুন করে, ভাঙছেনও নিজেকেই। প্রতিটি অণুপরমাণুতে তিনিই রয়েছেন তাঁর পরিপূর্ণ সত্তা নিয়ে। তিনিই আমি। আমিই তিনি। অহং ব্রহ্মাস্মি। সোঽহম্।

এই সত্যের আলোতেই, এই রহস্যের আলো-আঁধারিতেই বুঝতে হবে বেদের দেবতাকে।

সব দেবতাই অদিতি, বললেন বেদ—

বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা
অদিতির্ জাতম্ অদিতির্ জনিত্বম্ (ঋ ১।৮৯।১০)

সব দেবতাই অদিতি, পঞ্চজনও,
যা হল, যা হবে—অদিতি, সবই অদিতি।

অদিতি মানে কি? অ-দিতি, যাকে খণ্ডিত করা যায় না। 'দো' ধাতুর অর্থ অবখণ্ডন, টুকরো করা। তাহলে মনের বুদ্ধির যুক্তির কোন দা দিয়েই যাঁকে টুকরো টুকরো করা যায় না, সেই অখণ্ডিতা অসীমা অদ্বৈতা Indivisible Infinityই হচ্ছেন অদিতি। এই বিশ্বসংসারের যাবতীয় বস্তু ভাব কল্পনার স্বরূপ-কথা হল যে, সে অসীম অনন্ত অখণ্ড এক। তার যে খণ্ডিত রূপ আমরা দেখি, তা হল তার বি-রূপ—হয় বিকৃত রূপ, না হয় বিশেষ রূপ। বিশেষ রূপ হলে ক্ষতি নেই, কেননা অনন্তের রূপবৈচিত্র্যও অনন্ত। বিকৃত রূপ হলেই ভাবনার কথা। বৈদিক দেবতাদের বিশেষ বিশেষ রূপের মধ্যে এই অসীমা অদিতি কেমন করে ফুটে উঠছেন, সেইটি দেখতে হবে। সীমার দোষারোপ লাগাতে গেলেই তাঁদের রূপ হয়ে যাবে বিকৃত।

The Vedic deities are names, powers, personalities of the universal Godhead and they represent each some essential puissance of the Divine Being (*One the Veda*, p. 393)

'বেদের দেবতারা হলেন বিশ্বদেবতার এক একটি নাম, শক্তি, রূপ। তাঁর প্রত্যেকেই সেই একদেবের এক একটি বিশিষ্ট মহিমার মূর্তি।'

এই কথাটি বেদ যে কতভাবে বলেছেন তার ইয়ত্তা নেই—

বহূন্ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্ (ঋ ৩।৫৫।১)

সব দেবতা সেই এক মহা দেবতা।

এক এবাগ্নির্ বহুধা সমিদ্ধ
একঃ সূর্যো বিশ্বম্ অনু প্রভূতঃ।
একৈবোষাঃ সর্বম্ ইদম্ বি ভাতি
একং বা ইদং বি বভূব সর্বম্ (ঋ ৮।৫৮।২)

একই সে আগুন সবখানে যাকে জ্বালো।
একই তো সূর্য বিশ্বনিখিলে রূপিত।
একই উষা এই সমস্ত করে আলো।
একই হয়েছেন এই বিচিত্র সবি তো।

সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভির্
একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি (ঋ ১০। ১১৪। ৫)

সোনার আলোর পাখামেলা সেই ব্যাপ্তমা শুধু আছে।
স্থানে স্থানে তার নব নব রূপ বিপ্র-কবিরা রচে।

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণম্ অগ্নিম্ আহুর্
অথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানম্ আহুঃ (ঐ ১। ১৬৪। ৪৬)

ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি—সবি তার ডাক-নাম,
সেই তো আবার স্বর্ণপক্ষ আলোকবিহঙ্গম।
সেই একই আছে, নানা নামে তাকে ডাকছে আবেগে কবিরা
কখনো অগ্নি, মাতরিশ্বন্, কখনো বলছে যম।

প্রতিটি দেবতাই যে সেই পরম দেবতারই প্রতিরূপ, যে-দেবতা সর্বত্র রয়েছেন অনুস্যূত হয়ে, এ-সত্য ঋষির মনে বুদ্ধিতে অনুভূতিতে দর্শনে এতই স্পষ্ট যে বৈদিক ঋষি দেবতার কোন বাহ্য প্রতিমা গড়েন নি। তিনি তাঁকে দেখছেন অনল অনিলে চিরনভোনীলে ভূধর সলিলে গহনে বিটপিলতায় ভূলতের গায় শশিতারকায় তপনে, আর দেখছেন আপন অন্তরে দেহে প্রাণে মনে বিজ্ঞানে আনন্দে হৃদয়ে। তাঁর এক চোখ আছে বাইরে মেলা, সেটি তাঁর অধিদৈবত দৃষ্টি। আর এক চোখ আছে ভেতরে খোলা, সেটি তাঁর অধ্যাত্ম দৃষ্টি। এই দুই চোখ ভরে তিনি দেবতাকে প্রত্যক্ষ দেখছেন অন্তরে বাহিরে। দেখছেন—

চিত্রং দেবানাম্ উদ্ অগাদ্ অনীকং
চক্ষুর্ মিত্রস্য বরুণস্য-অগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং
সূর্য আত্মা জগতস্ তস্থুষশ্ চ (ঐ ১। ১১৫। ১)

কি আশ্চর্য সূর্য উঠেছে জ্যোতির পুঞ্জ
মিত্র বরুণ অগ্নি সবার চক্ষু ওই যে
দেখতে দেখতে দ্যুলোক ভূলোক ছাইল, ছাইল অন্তরিক্ষ
দাঁড়িয়ে আছে যা, চলছে—সবার আত্মা সূর্য।

ঐ সূর্যের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে ঋষির সত্তা। সূর্যোদয় তাঁর কাছে শুধু অনন্ত একটি বাষ্পপিণ্ডের একঘেয়ে অবধারিত হাজিরা নয়, এ হল এক জ্যোতির্ময় প্রাণময় চিন্ময় আনন্দময় আবির্ভাব। একই সঙ্গে বিশ্বকে এবং ঋষির হৃদয়কে এক অভূতপূর্ব প্লাবনে প্লাবিত করে দিচ্ছে, আর তিনি গেয়ে গেয়ে উঠছেন—

আজ আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও।
আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও॥

যে জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের ছলে
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
এই অরুণ-আলোর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দাও।

স্থাবর-জঙ্গমের গভীর গুহায় যে-যারা যে আপনজন ঘুমিয়ে আছে অঘোর ঘুমে, সূর্য হলেন তার ঘুম-ভাঙানোর সোনার কাঠি। তাহলে এ সূর্য কোন সূর্য? শুধু প্রাকৃতিক সূর্যের তো এত ক্ষমতা নেই? তাহলে একি সেই বিশ্বের অন্তর্যামী অন্তশ্চর পরমগুহ্য পরমগোপ্য মহাসূর্য যাঁর কথা বলতে গিয়ে উপনিষদ দিশাহারা হয়ে গেলেন—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়ম্ অগ্নিঃ।
তম্ এব ভান্তম্ অনু ভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বম্ ইদং বি ভাতি।

সূর্য জ্বলে না, জ্বলে না সেখানে তারকাচন্দ্র
জ্বলে না তো এই বিদ্যুতেরাও, কোথা এ অগ্নি?
সেই জ্বলে তাই জ্বলে সে-সঙ্গে বিশ্বনিখিল
তার বিভাতেই আলো হয়ে আছে এই সবস্ত।

হাঁ তাই। অলঙ্কারের ভাষা ধার করে বলি, এই প্রাকৃতিক সূর্য হলেন ঋষিচিত্তের উদ্দীপনবিভাব, অর্থাৎ এই সূর্যকে দেখে তাঁর হৃদয়ে উদ্দীপন হচ্ছে সেই পরমসূর্যের, মহাসুরের। এই সূর্যকে ছাপিয়ে অনন্তে উধাও হয়ে যাচ্ছে তাঁর সত্তা, সীমা বিসীর্ণ হয়ে যাচ্ছে সীমার বন্ধন, সব টুকরো টুকরো-টুকরো হতে হতে অণরোণীয়ান্ হতে হতে মিশে যাচ্ছে মহতো মহীয়ান-এ অদিতিতে অনন্তশীর্ষ অনন্তবাহু অনন্তচরণ আদিত্যবর্ণ পুরুষে। সেই অপরূপ রাখালে, যিনি মহাগগনতলে চরান তাঁর আলোকধেনু সূর্য তারা দলে দলে। আর কোথায় বসে বেণু বাজান। সেই নটরাজে, যাঁর পদযুগ ঘিরে জ্যোতিরঙ্গীরে বাজছে কোটি কোটি চন্দ্রভানু।

আবার যেহেতু সেই পরমের অধিষ্ঠান সর্বত্র, সে-হেতু উদ্দীপনই হয়ে ওঠে আলম্বন। ঋষির আদিত্যহৃদয়ের ছোঁয়ায় সব কিছুই অদিতি হয়ে যায়। তখন যিনি সিন্ধু, তিনিই বিপ্রু; আবার যিনি বিপ্রু, তিনিই সিন্ধু।

উতেয়ং ভূমির্ বরুণস্য রাজ্ঞ
উতাসৌ দ্যৌর্ বৃহতী দূরেঅন্তা।
উতো সমুদ্রৌ বরুণস্য কুক্ষী
উতাস্মিন্নুল্প উদকে নিলীন (অথর্ববেদ ৪। ১৬। ৩)

ওই যে বিরাট দূর-দীয়ানা আকাশ আলোয়-ভরা এবং এই পৃথিবী—এ-ও বরুণ রাজার।

উপর যে তাঁর জোড়াসাগর-জোড়া
অল্প জলেও আছেন তিনি আবার।

বৈষ্ণবের ভাষায় তখন যাঁহা যাঁহা দৃষ্টি পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে। সবই দেবতা। সবই মহিমময় জ্যোতির্ময় শক্তিময় চৈতন্যময়। যজ্ঞের সোম-ছেঁচা পাথরটিও দেবতা, ধান-কোটা উদূখলমুষলও দেবতা, যজ্ঞের পাত্র প্রহরণ হবিঃ যজমান ঋত্বিক্ বেদি অগ্নি—সবই দেবতা। সমস্ত জীবনই দেবতাময়, দিব্য। তখন দেবতায় দেবতায় যেটুকু বা ভেদের ছোঁয়াচ লেগেছিল তার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত লুপ্ত, তখন অগ্নি ইন্দ্র সবিতা সবাই যেন ছদ্মবেশ খুলে পরমস্বরূপে দীপ্যমান। যেমন দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রথম সূক্তে ঋষি গৃৎসমদ অগ্নির বিশ্বদেব-রূপ দেখছেন—

ত্বম্ অগ্নে ইন্দ্রো বৃষভঃ সতাম্ অসি
ত্বম্ বিষ্ণুর্ উরুগায়ো নমস্যঃ।

ত্বম্ অগ্নে রাজা বরুণো ধৃতব্রতস্
ত্বং মিত্রো ভবসি দস্ম ঈড্যঃ

ত্বম্ অগ্নে অদিতির্ দেব দাশুষে
ত্বং হোত্রা ভারতী বর্ধসে গিরা (ঋ ২। ১ ৩, ৪, ১১)

ইন্দ্র-বৃষভ তুমি সত্যজনে অকৃপণ-বর্ষণ,
সর্বতোগতি বিষ্ণু তুমিই, বিশ্ব চরণে নত,
সর্ব-দমন তুমিই মিত্র, লহ লহ বন্দন,
তুমিই তো রাজা বরুণ ধৃতব্রত।
সব যে দিয়েছে তুমি তার কাছে অদিতি, আলোয় আলো,
তুমি আবাহনী বাক্, জাগরণী গানে গানে বেড়ে চল।

ঠিক তেমনি ইন্দ্রও, ইন্দ্রই পবনদেবতা—

রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি
মায়াঃ কৃণ্বানস্ তন্বং পরি স্বাম্ (ঋ (৩।৫ ৩। ৮)

রূপে রূপে বারবার হয়ে চলে মঘবা
নিজের তনুকে ঘিরে সৃষ্টির আদুতে...

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে
যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ (ঋ ৬। ৪৭। ১৮)

তারি রূপে গড়া যত রূপ আছে যেখানে
দেখ দেখ রূপ দেখ সেই তার—
ভাঙতে ভাঙতে বহুরূপী চলে ইন্দ্র
জোতাই রয়েছে তার ঘোড়া যে হাজার।

এরকম স্পষ্টভাষণ ছাড়াও দেবতাদের পারস্পরিক ঐক্য এবং অভেদের কথা আরো নানাভাবে বলা হয়েছে। বিশ্বেদেবের বিল, বর্ণনার বিল, কর্মের বিল। যেমন অগ্নি ইন্দ্র সোম রুদ্র মরুদ্‌গণ উষা সূর্য পূষা আদিত্যেরা সবাই হচ্ছেন বসু অর্থাৎ জ্যোতির্ময়। দেব শব্দের অর্থও জ্যোতির্ময়। অর্থাৎ দেবতার সাধারণ পরিচয় হল, তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ —আলোয় আলোকময় করে যে এলে আলোর আলো। অগ্নি ইন্দ্র সোম সূর্য—এঁরা সবাই বৃত্রহা, কেউ কেউ আবার বৃত্রহন্তম। বৃত্রকে অর্থাৎ আবরণকে বাধাকে হনেন, বিদীর্ণ করেন, হটিয়ে দেন। অনেক দেবতার সাধারণ বিশেষণ বিশ্বমিন্ব অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী। সব দেবতাই আলোর মতো বিশ্বব্যাপী, বিপুল, বৃহৎ, ঋতময়, ছন্দোময়। সব দেবতারই আপন ঘর হল পরম ব্যোম অর্থাৎ অনির্বাধ চেতনার মহাকাশ। The home of the Gods is an absolute Truth which lives in solar glories beyond mind (*On the Veda*, p. 389)—'মনের ওপারে বোচন স্বর্লোকে রয়েছে যে ঋতং বৃহৎ, সেইটি হল দেবতাদের সদন।'' এই দেবতাকে অন্তরে বাহিরে সর্বভূতে স্থাবরে জঙ্গমে প্রত্যক্ষ দেখেছেন বলে ঋষি তাঁর প্রতিমা গড়তে পারেন নি, বলেছেন, প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে, এ বিশ্বনিখিল তোমারি প্রতিমা। বাইরের প্রতিমা দূরে থাক, দিব্যবাক দিয়ে শ্রুতি দিয়ে গড়া যে মানস-প্রতিমা তারও কোন বেষ্টনী নেই, সে এক আশ্চর্য আলোর প্রতিমা, বিরাটের সঙ্গে অনন্তের সঙ্গে অদিতির সঙ্গে একাকার। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও সত্য যে এই প্রত্যেকটি আলোর প্রতিমাই ঋষির কাছে জীবন্ত, শুধু কথার বুনুনি নয়।

It must not be mistaken for mere imagery. The Gods are not simply poetical personifications of abstract ideas or of psychological and physical functions of Nature. To the Vedic seers they are living realities; the vicissitudes of the human soul represent a cosmic struggle not merely of principles and tendencies but of the cosmic Powers which support and embody them. These are the Gods and the Demons. On the world-stage and in the individual soul the same real drama with the same personages is enacted (*On the Veda*, p. 394)

'এটাকে নিছক রূপক বলে ভাবলে চলবে না। দেবতারা কতগুলি নির্জলা তত্ত্বের অথবা প্রকৃতির কতগুলো মানসিক বা ভৌতিক বৃত্তির কবিকৃত বিগ্রহমাত্র নন, ঋষির কাছে তাঁরা হলেন অলঙ্ঘ্যশক্তি সত্য। মানবাত্মার উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে ঘটে চলেছে একটি বিশ্ব-যুদ্ধ—সে যুদ্ধ শুধু তত্ত্বের বা প্রবৃত্তির নয়, তাদের আধার এবং অধিষ্ঠান যারা সেই সব মহাশক্তির। তাঁরাই হয়েছেন দেবতা আর অসুর। বিশ্বের মঞ্চে আর জীবাত্মায় সেই একই পাত্রদের নিয়ে সেই একই জীবন্ত নাটকের অভিনয় হয়ে চলেছে।'

এইখানে একটি প্রশ্ন ওঠে। দেবতা তাঁর স্বরূপে যদি এক অনন্য অদ্বিতীয়, তাহলে সেই অদ্বৈতস্বরূপের উপাসনা করাই তো ভালো, দরকার কি বহুর ঝামেলার মধ্যে গিয়ে?

যেখানে সমস্যা, সেখানেই সমাধান। আর এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে বৈদিক পৌরাণিক তথা ভারতীয় দেববাদের রহস্যটি। স্বয়ং-সম্পূর্ণতা, আপনাতে-আপনি থাকা, আত্মারামতা—এ যেমন সেই একের স্বভাব, তেমনি আপনাকে বহুরূপে রূপায়িত করে অনেকের আনন্দমেলা বসানো—এও তো তাঁরই স্বভাব। তিনি যেমন অরূপ, তেমনি আবার বিশ্বরূপও। অরূপ সরূপ সগুণ নির্গুণ সকাল ভালো তিনি। তিনি অসংখ্য এক Myriad One (সাবিত্রী)। সৃষ্টির অণুতে পরমাণুতে তাঁর বিচিত্র রূপোল্লাস ঋষির হৃদয়ে জাগিয়ে তোলে বিচিত্র অনুভূতি, বিচিত্র বাণী। তাঁর যে-রূপটি যখন যে সূক্তকে জাগিয়ে তোলে, সেই হয় সেই সূক্তের দেবতা। সেই প্রতিটি রূপের মধ্যেই পূর্ণ-ভাবে তিনি থাকেন, তাই সমস্ত বেদ জুড়ে যদিও সেই একই কথা, একই বস্তু, এমন কি শব্দ-সম্ভার ভাষা পর্যন্ত এক—তবু সেই একের মধ্যেই বৈচিত্র্যের আর অন্ত নেই। কেউ ভাল-বাসছেন বিশেষ করে সবিতার রূপটি কারো পক্ষপাত সোমের প্রতি, কারো কাছে অগ্নি হলেন একান্ত প্রিয়, কেউ আবার ইন্দ্রের অনন্য ভক্ত। কেউ কথা বলেন পুরোপুরি সাদা ভাষায়, কারো শৈলী স্বচ্ছ সঙ্গীতময়, কেউ কথা বলছেন যেন আগুন, কেউ আবার ধীর প্রশান্ত। তিনটি উপমা মনে পড়ে—বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী আর বাউল-গান। নানান ভাবে, নানান ভঙ্গিতে, নানান ছাঁদে ঘুরে ফিরে সবারই সেই এক কথা। অথচ একঘেয়ে হয় না, পুরোন হয় না। তার কারণ প্রতিটি সূক্ত প্রতিটি কবিতা প্রতিটি গান অনুভূতির রসে উচ্ছল। যেখানে একই শব্দের বা পদগুচ্ছের বা পঙ্‌ক্তির এমন কি ঋকের পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, সেখানেও তা দাগা বুলোন নয়, আর একবার নতুন করে অনুভূত সত্যের উচ্চারণ, নতুন কীর্তনীয়ার আখরে পুনর্বীকৃত পদাবলী।

'বেদ-রহস্য' গ্রন্থের 'মরমীয়াদের দর্শন' (The Doctrine of the Mystics) অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দ বেদের দেবতাদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়েছেন। তার থেকে পরমদেবতার কোন রূপটি কে, সে সম্পর্কে তাঁর অনুভূতির একটা মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যায়।

অগ্নি হলেন তাঁর ইচ্ছাশক্তি, তাঁর ক্রতু। মর্ত্য মানুষের মধ্যে তিনি আছেন অমৃতের দূত হয়ে, দেবতার সঙ্গে তার ঘটকালি করছেন। তিনিই পুরো-হিত হয়ে মানুষের যজ্ঞকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন দেবতার দিকে।

ইন্দ্র হলেন দিব্য মন। তাঁর সর্বাভিভাবী শক্তি নিয়ে তিনি নেমে আসছেন আমাদের পৃথিবীতে, হানছেন সমস্ত আঁধার, সমস্ত বাধা, ঝরাচ্ছেন বাঁধ-ভাঙা প্রাণের আসার, অন্ধ

গুহায় বন্দী আমাদের আত্মজ্যোতিকে খুঁজে খুঁজে বার করে ফুটিয়ে তুলছেন সত্যের মহাসূর্যকে।

সূর্য সত্যপতি সত্যস্বরূপ। এই সূর্যেরই কিরণেরা আলোক-ধেনুরা বন্দী হয়ে আছে আমাদের আধারে। উষার পেছনে পেছনে সূর্য আসেন তাদের মুক্ত করে আমাদের জীবনকে জ্যোতির্ময় করতে, পরমানন্দের সন্ধান দিতে।

সোম হলেন সেই পরমানন্দ। এই পৃথিবীতে, এই দেহে, এই প্রাণে লুকিয়ে আছে সেই পরমানন্দ। তাকে নিষ্কাশিত করে নিবেদন করতে হবে দেবতার উদ্দেশ্যে। তখন তাই হবে অমৃত।

বরুণ হলেন সেই নির্মল অবাধ বিপুলতা যা ধ্বংস করে সমস্ত পাপ, সমস্ত ধৃতি, সমস্ত 'দুষ্কৃতান্ এনঃ' (কুটিল পাপ) কে। মিত্র প্রেমের সর্বগ্রাহী আলো যা আমাদের মনন, কর্ম এবং প্রবৃত্তিকে ছন্দোময় করে তুলছে। নির্ভুল অভীপ্সা এবং তপের মৃত্যুঞ্জয় শক্তি হলেন অর্যমা। দুঃখ-পাপ-ভ্রান্তির দুঃস্বপ্নকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে সম্যক্ সম্বোধের অনায়াস আনন্দ নিয়ে আসেন ভগ। সূর্যের সত্যের চারটি শক্তি হলেন এঁরা।

সোমকে আধারে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে চাই আনন্দোজ্জ্বল অব্যাহিতব্যাহত দেহমন-প্রাণ। তার দাতা হলেন 'অশ্বিনৌ' অর্থাৎ যমজ অশ্বিদ্বয়। ইন্দ্রসহায় মরুদ্‌গণ হলেন প্রাণের, সঙ্কল্পের সেই মহাঝড় যা ফুটে ওঠে প্রদীপ্ত মনন হয়ে, মন্ত্র হয়ে।

দেবীদের মধ্যে প্রথমা হলেন অদিতি—অনন্তা দেবমাতা। মহী বা ভারতী, ইলা, সরস্বতী, সরমা ও দক্ষিণা—এঁরা হলেন ঋত-চিৎ (Truth Consciousness) এর পাঁচটি শক্তি। মহী ভারতী হলেন মহাবাক্—সেই অক্ষীয়মাণ শতধার উৎস থেকে আমাদের জন্যে নিয়ে আসছেন অফুরন্ত অক্ষুব্ধ দান। ইলা সত্যের প্রথম আদি শব্দময়ী শক্তি। সরস্বতী তার স্রোতোধারা। দেবজুনী সরমা হলেন প্রাতিভসংবিৎ (Intuition), অচেতনার অন্ধগুহায় নেমে আবিষ্কার করেন লুকোন আলোকধেনুদের। দক্ষিণার কাজ হল আমাদের কর্মের, জীবনযজ্ঞের সহায়তা করা এবং আহুতিগুলি ঠিক ঠিক দেবতার কাছে পৌঁছে দেওয়া। এ ছাড়াও প্রত্যেক দেবতার একজন করে দেবী শক্তি রয়েছেন।

এই কর্ম, এই সংগ্রাম, এই ঊর্ধ্বারোহণের মূলাধার হলেন দ্যাবাপৃথিবী—দ্যুলোক-ভূলোক, আমাদের এবং দেবতাদের পিতামাতা। প্রাণের অধীশ্বর বায়ু তাঁদের দুজনকে যুক্ত করছেন অন্তরিক্ষলোক, প্রাণলোক দিয়ে। পর্জন্য দিচ্ছেন দ্যুলোকের ধারাসার।

ব্রহ্মণস্পতি রুদ্র এবং বিষ্ণু এঁরা তিনজন হলেন পুরাণের ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের পূর্বরূপ। ব্রহ্মণস্পতি সৃষ্টি করেন বাক্ দিয়ে। রুদ্রের দুটি রূপ—বাম ও দক্ষিণ, ভয়ঙ্কর ও শিব। তিনি একাধারে পরমদেবতার অনুগ্রহ ও নিগ্রহশক্তি। সমস্ত বাধা-বিরোধ হানতে হানতে তিনি এই সৃষ্টিকে মহাবলে নিয়ে চলেছেন ঊর্ধ্বর্তনের পথে। বিষ্ণু তাঁর তিনটি পদক্ষেপে ব্যাপ্ত করে আছেন এই লোকপরম্পরা। আমাদের সীমিত মর্ত্য-চেতনায় ইন্দ্রশক্তির ক্রিয়াকে তিনিই অবাধিত ও ত্বরান্বিত করেন। তিনিই হাত ধরে আমাদের নিয়ে যান সেই পরমপদে যেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন সেই চিরসখা, প্রিয়তম, চির আনন্দময়।

এই দেবতাদের আপন ঘর হল পরম ব্যোম, ঋতের যোনি, অফুরান মধুর শতধার

যোয়ারা। কিন্তু যার যেমন কর্ম সেই অনুসারে তাঁরা ছড়িয়ে থাকেন, বাস। নেন তিনটি লোকে—ভূলোকে অন্তরিক্ষ আর দ্যুলোক। দেহলোক প্রাণলোক মনোলোক—মানুষের সত্তার এই তিনটি ভূমিকে আশ্রয় করে তাঁরা তাঁদের দিব্যলয়র চালিয়ে যান যা কিছু মলিন যা কিছু সঙ্কীর্ণ যা কিছু অবশ তার বিরুদ্ধে। মানুষের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কটি বড় মধুর, বড় আপন—

Children of Light, Sons of the Infinite, they recognise in the soul of man their brother and ally and desire to help and increase him by themselves increasing in him so as to possess his world with their light, strength and beauty. The Gods call man to a divine companionship and alliance; they attract and uplift him to their luminous fraternity, invite his aid and offer theirs against the sons of Darkness and Division. (*ibid.*, p. 393)

'আলোর দুলাল অদিতির পুত্র (এই দেবতারা) মানুষকে চিনে নেন ভাই এবং বন্ধু বলে। মানুষকে তাঁরা সাহায্য করতে এবং বাড়িয়ে তুলতে চান নিজেরাই তার মধ্যে বেড়ে উঠে। তাঁদের আলো, শক্তি আর সৌন্দর্য দিয়ে তার জগৎকে তাঁরা অধিকার করেন। তাঁরা মানুষকে আহ্বান করেন এক অপার্থিব সখ্যে, অন্যোন্যসম্ভাষণে। তাঁদের উজ্জ্বল সৌভ্রাত্রের দিকে তাঁরা তাকে আকর্ষণ করেন, তুলে নেন। তমঃ এবং দিতির সন্তানদের বিরুদ্ধে তার সাহায্য তাঁরা আহ্বান করেন এবং নিজেরা তাকে সাহায্য দেন।'

Man in return calls the Gods to his sacrifice, offers to them his swiftness and his strengths, his clarities and is sweetnesses... He receives them into his being and their gifts into his life, increases them by the hymn and the wine and forms perfectly—as a smith forges iron, says the Veda—their great and luminous godheads. (*ibid*, pp. 393-94)

'প্রতিদানে, মানুষ দেবতাদের আহ্বান করে তার যজ্ঞে, তাঁদের উদ্দেশ্যে আহুতি দেয় তার যত ক্ষিপ্রতা, যত বীর্য, যত প্রমাদ, যত মাধুর্য...সে তাঁদের বরণ করে নেয় তার সত্তায়, গ্রহণ করে তাঁদের দান জীবন ভরে, স্তুতি দিয়ে আর সোম্য মদ দিয়ে তাঁদের বাড়িয়ে তোলে, আর, বেদ বলছেন, কামার যেমন করে লোহাকে পিটিয়ে পিটিয়ে গালিয়ে চালাই করে রূপ দেয়, ঠিক তেমনি করেই তাঁদের মহিমময় ভাস্বর রূপ সে গড়ে তোলে নিখুঁত ভাবে।'

এইখানে দেববাদের আর একটি গোপন কথার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালাম আমরা। মানুষ দেবকৃৎ। মানুষই তৈরি করছে দেবতাকে। অর্থাৎ বিশ্বগত নিত্যতত্ত্ব হিসাবে দেবতা যেমন আছেন থাকুন, কিন্তু আমার কাছে তিনি একান্তই ব্যক্তিগত, আমার আপন প্রিয়। আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা—তুমি আমারি, তুমি আমারি, মম অসীমগগনবিহারী। মম সঙ্গীত তব অঙ্গে অঙ্গে দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে—তুমি আমারি, তুমি আমারি, মম জীবনমরণবিহারী।

এই ভালোবাসার সুরটি আছে বলেই বেদ পৃথিবীর মহত্তম কাব্য, তাই তা এখনো

অমর, ন মমার ন জীর্যতি, মরল না এ তো জীর্ণ হল না হল না। এ যদি না থাকত, তা হলে বেদ হত কতিপয় জিজ্ঞাসুর পাঠ্য আর্য ধর্ম ও দর্শনের প্রত্নশাস্ত্র মাত্র। এইটি আছে বলেই বেদ কাব্য, বেদ গান, সবার মরমের মরমিয়া।

এই সুর বলছে, হে দেবতা, আমি তোমাকে চাই, তোমার জন্যে আমার প্রাণ কাঁদে, আমি উশন্, আমি উতলা, আমি কন্যা, তুমি প্রেমিক, আমি বধূ, তুমি বঁধু—

গন্ধো হ জাতং গন্ধো জনিত্বং
জারঃ কনীনাং পতির্ জনীনাম্ (ঋ ১ ৬৬। ৪)

তাঁরি হাতে আছে অতীত বর্তমান
ভবিষ্যতেরও তিনিই অধীশ্বর।
সব কুমারীর তিনি জাগানিয়া গান
সব বধূদের বর।

অথবা আমিই পতি, তুমি আমার আপত্নিনী বধূ

অনবদ্যা পতিঘুষ্টেব নারী (ঋ। ৭৩। ১)

অপরূপা যেন স্বামী-মোহাগিনী নারী।

আমি যেমন দেবতাকে চাইছি, দেবতাও ঠিক তেমনি করেই আমাকে, আমাদের চাইছেন, তিনিও 'উশন্' উতলা, 'অস্মনু' আমাদের চান, 'জায়ের পত্যা উশতী সুবাসাঃ' সুবেশা জায়ার মতো উন্মুখ তাঁর পতির জন্যে—এই খবরটি জানা আছে, জানা গেছে বলেই ঋষির দাবী এত জোরালো, এত বহুগর্ভ। আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে? তোমার চন্দ্রসূর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে? হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ —চন্দ্রসূর্যের হিরন্ময় পাত্র দিয়ে তুমি সত্যের মুখ ঢেকে রেখেছিলে, সে-ঢাকা আমি খুলে ফেলেছি, তুমিই খুলে দিয়েছ আমার হয়ে, আমার জন্যে...কত কালে সকাল-সাঁঝে তোমার চরণধ্বনি বাজে, গোপনে দূত হৃদয়-মাঝে গেছে আমায় ডেকে...

বয়ং ঘা তে ত্বে ইদ্বিন্দ্র বিপ্রা অপি স্মসি।
নহি ত্বদন্যঃ পুরুহূত কশ্চন মঘবন্নস্তি মর্ডিতা (ঋ ৮।৬৬।১৩)

আমরা তোমারি ইন্দ্র তোমারি
তোমাতেই আছি তোমারি জন্য
হে বিরাট, বহু-হূত, সুখ দিতে
তুমি ছাড়া আর কে আছে অন্য?

বয়েদু ইন্দ্র যুজা বয়ং প্রতি ব্রুবীমহি স্পৃধঃ।
অস্মাকং তব স্যসি (ঋ ৮। ১২। ৩২)

তুমি আছ সাথে, ভয় কি, আমরা
উত্তর দেব সব না-জানায়।
তুমি আমাদের, আমরা তোমার।

আমি নয়, আমরা। আমি আর আমরা একাকার হয়ে গেছে। আমি একা ডাকছি না, সকলে মিলে ডাকছি। যখন একা ডাকছি, তখনো সবার হয়ে ডাকছি। সঙ্ঘবদ্ধ সাধনা। ঠিক মনে পড়ে যায়, কৃষ্ণের জন্য ব্রজমণ্ডলের সবার আকুলতা-ব্যাকুলতা। দেবতা যেমন আমার একান্ত, তেমনি তিনি আবার সবারও, কেননা সেই সবাই যে আমারই সত্তার বহুরূপ। ওগো সবার, ওগো আমার।

ইন্দ্র সাধারণস্ পদ্ (ঋ ৮। ৬৫। ৭)

ইন্দ্র তুমি সবার।

তুমি আমাদের সব—

এতা নো বোধি দক্ষিণা আপিঃ
সখা পিতা পিতৃতনঃ পিতৃণাম্ (ঋ ৪। ১৭। ১৭)

ত্রাণ কর হে ত্রাতা
আপন হয়ে দাও দেখা দাও
বন্ধু, পিতা, পিতার পরম পিতা।

অগ্নিং নমো পিতরম্ অগ্নিম্ আপিম্
অগ্নিং ভ্রাতরং সদমিৎ সখায়ম্ (ঋ ১০।৭।৩)

আগুন আমার পিতা জানি,
আগুন হেন এমন আপন নাই।
আগুন চিরবন্ধু জানি
আগুন আমার ভাই।

এত ভালবেসেও যখন দেবতার মন পাওয়া যায় না, তখন তার জন্যে মর্মস্পর্শী ভাষায় অভিমানও আছে—

যদ্ অগ্নে স্যাম্ অহং ত্বং ত্বং বা ঘা স্যা অহম্।
স্যাম্ তে সত্যা ইহাশিষঃ (ঋ ৮। ৪৪। ২৩)

আমি যদি তুমি হতাম, তুমি হতে আমি,
অগ্নি, তোমার পূর্ণ হত সকল চাওয়া এখানে এখনই।

পিতা, পতি, প্রিয়, প্রভু, মাতা, প্রিয়া, পত্নী, বন্ধু—এ সবের পরেও দেবতার যে আশ্চর্যতম পরিচয়, সেটি হল তিনি পুত্র। তিনি আমার আত্মজ, তিনি শিশু, তিনি আমারি বীর্যে সঙ্কল্পে প্রেমে গড়া, আমার ভালবাসার ধন, আমারি সৃষ্টি।

তার মানে কি?

দেবতাদের নামাবলী ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটি নাম পাই 'ঋভবঃ' অর্থাৎ ঋভুগণ। শ্রীঅরবিন্দ এঁদের বর্ণনা করেছেন **artisans of immortality**, অর্থাৎ অমরাবতীর

রূপকার বলে। এই ঋভুরা হচ্ছেন মানুষ, কিন্তু আপন সাধনবলে দেবতার পদবীতে উত্তীর্ণ। কিন্তু তাই বলে তাঁদের গা থেকে মানুষের গন্ধ যায় নি, তাঁরা মনুষ্যপক্ষাঃ, মনুষোর জ্ঞাতি, মানুষের বন্ধু, তাঁরা দেবমানব, নরনারায়ণ। **Their function is to aid Indra in raising man towards the same state of divine light and bliss which they themselves have earned as their own divine privilege** (*On the Veda*, p. 352). 'তাঁদের কাজ হল, তাঁরা নিজেরা তাঁদের স্ব-অর্জিত দেবত্ব বলে যে দিব্য জ্যোতি ও আনন্দের ভাগী হয়েছেন, মানুষকে সেই স্তরে তুলতে ইন্দ্রকে সাহায্য করা।'

মানুষকে দেবতা করে তোলার জন্যে ঋভুরা পাঁচটি কাজ করেন। প্রথম ইন্দ্রের দুটি জ্যোতির্ময় ঘোড়াকে তাঁরা মন দিয়ে কুঁদে কুঁদে তৈরী করেন। 'কেননা অমৃতত্বের সাধনার সুরুতেও প্রয়োজন জ্যোতির্ময় মন, দিব্যমনের অবাধ সঞ্চরণ মানুষের মধ্যে' (*ibid.* p. 354)। ইন্দ্র হলেন সেই দিব্যমন। তাঁর হাঁকাবার ঘোড়া দুটি তৈরী করে দেন ঋভুরাই। দ্বিতীয়ত, অশ্বিদ্বয়ের জন্যে তাঁরা চেঁচেছুলে তৈরী করেন তাঁদের সর্বতোগামী আনন্দরথটি। মানুষের সত্তার সমস্ত স্তরে স্বাস্থ্য যৌবন, বীর্য, নিটোল পরিপূর্ণতা, সম্ভোগশক্তি—এককথায় অস্তিত্বের নিষ্কল্ষ আনন্দ এনে দেন অশ্বিদ্বয়। তাঁদের রথটি ঋভুদের তৈরী!

তৃতীয়ত, আলোকরশ্মি হরণ করে যে গাইটি, তাকে তাঁরা রূপ দেন। কে এই গোরু? ইনি হচ্ছেন বিশ্বরূপা অদিতি। তাঁর আবরণটি নির্মোকটি ছাড়িয়ে ঋভুরা তাঁকে মুক্ত করেন তাঁর সত্যস্বরূপে। **She is, by the action of the powers of the duality, separated from her offspring, the soul in the lower world; the Ribhus restore it to constant companionship with its infinite mother.** (*ibid*, p. 354).

'দ্বৈতশক্তিদের ক্রিয়ার দ্বারা অদিতি তাঁর সন্তানের কাছ থেকে, অবরলোকের জীবের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন। ঋভুরা তাকে ফিরিয়ে দেন পরমজননীর কাছে, যাতে আর কোনদিন ছাড়াছাড়ি না হয়।

ঋভুদের চতুর্থ কাজ হল, বুড়ো মা-বাবাকে যৌবন ফিরিয়ে দেওয়া। এই বুড়ো মা-বাবা হলেন দ্যাবাপৃথিবী, দ্যুলোক আর ভূলোক। বহু ব্যবহারে জীর্ণশীর্ণ যূপকাষ্ঠের মতো তাঁরা পড়ে আছেন। ঋভুরা এসে তাঁদের মধ্যে নতুন জীবন সঞ্চার করেন। মানুষের সভ্যতা আবার নতুন তাৎপর্য পায়।

ঋভুদের পঞ্চম কৃত্য হল, দেবতাদের সোমপানের চমসটিকে চারখানা করা। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, দেহ প্রাণ মন এবং তারো উর্ধ্বে যে causal বা ideal body—এই চারটিতে জীবনের অমৃতকে ভরে দেবতাকে নিবেদন করবে মানুষ—এই হল এর তাৎপর্য।

আর সব যদি ছেড়েও দি, তাহলেও 'অদিতিরূপিণী গোরুকে ঋভুরা তৈরী করছেন কুঁদে কুঁদে'—শুধু এইটুকুই দেবতত্ত্বের এই চরম রহস্যটি বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। দেবমাতা অদিতিকে এবং সেই সঙ্গে তাঁর পুত্র দেবতাদের ঋভুরা সৃষ্টি করছেন, নতুন করে

জন্ম দিচ্ছেন নিজের মধ্যে, মানুষের মধ্যে, বিশ্বের মধ্যে। দেবতার জন্ম হচ্ছে মানুষের শরীরে। মানুষ দেবতা হয়ে যাচ্ছে। এই দিব্যজন্মের পৃষ্টান্ত হলেন ঋভুরা। তাঁদের কাজ হল the great work of upward human evolution which is the summit of the world-sacrifice (*ibid.*, p. 353). 'মানুষের সত্যতার উত্তর্তন, উর্ধ্বাভিসার, যা হল বিশ্বযোড়া যজ্ঞের চূড়ান্ত ফল।' এই উর্ধ্বগতির নিশ্চিত লক্ষণ হল মানুষের মধ্যে দেবতার জন্ম।

এই দেবজন্মকে লক্ষ্য করেই চলেছে বেদের সাধনা। উপাসকের বীর্যে তার মধ্যে জন্ম নিচ্ছেন দেবতা, তিনি তার সহসঃ সূনুঃ, ঊর্জো নপাৎ, বীর্যের পুত্র, শক্তির সন্তান। জন্মেই দেবতা ক্ষান্ত হচ্ছেন না, দিনে দিনে বাড়ছেন, গীর্ভির্বর্ধমানঃ, বাড়ছেন তার বাণীতে মন্ত্রশক্তিতে। শিশু দেবতা যুবক হচ্ছেন, উপাসকের সমস্ত সত্তাকে অধিকার করছেন, যতক্ষণ না সে 'অবোচত স্বাং তনূং ইন্দ্রং এব' (ঋ ১০। ১২০। ৯), নিজের তনুটিকে ইন্দ্রই বলে ঘোষণা করে, যতক্ষণ না সে নিঃসংশয়ে ভাগবতী তনুর দিব্যতনুর অধিকারী হয়, যতক্ষণ না সে বুঝতে পারে, আমিই দেবতা—

অহন্ ইন্দ্রো বরুণস্ তে মহিত্বা
উর্বী গভীরে রজসী সুমেকে।
দধ্টেম বিশ্বা ভুবনানি বিশ্বান্তু
সম্ ঐরয়ং রোদসী ধারয়ং চ (ঋ ৪। ৪২। ১)

ইন্দ্র বরুণ আমি
আমি গভীর বিশাল অপরূপ সেই মহিমার দুটি ভূমি।
ধরে আমি রোদসীকে
জেনে স্রষ্টার মতো চালনা করছি নিখিল এ সৃষ্টিকে।

অহন্ এব বাত ইব প্র বামি-
আরভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা-
এতাবতী মহিনা সং বভূব (ঋ ১০। ১৩৫। ৮)

বুকের কাছে বাঁকড়ে ধরে বিশ্বভুবন
স্রষ্টা আমি চলছি বয়ে হাওয়ার মতন।
ছাড়িয়ে আকাশ, ছাড়িয়ে বিশাল এ-পিথিবি
ছড়িয়ে আছি কি মহিমায় বিরাট আমি!

প্রথমে সে, তারপর তুমি, তারপর আমি। প্রথমে দেবতা পরোক্ষ, তারপর তিনি প্রত্যক্ষ, তারপর তিনি আত্মভূত। এই তিনস্তরের অনুভূতির কথাই বলেছেন বেদের ঋষিরা। শুধু অনুভূতি নয়, দর্শন। শুধু দর্শন নয়, জীবনে তার রূপায়ণ। নিজেকে দেবময় করে, দেবদত্ত সিদ্ধি এবং ঋদ্ধিকে করায়ত্ত করে দেবহিত আয়ুর পূর্ণ সম্ভোগ, পূর্ণ হয়ে বাঁচার মতো বাঁচা—এই হল বৈদিক দেবোপাসনার নিষ্কর্ষ। এই পূর্ণজীবনেরই কবি মনীষী ঋভু হলেন শ্রীঅরবিন্দ।

শতাব্দীর স্মরণে

সমীরকান্ত গুপ্ত

আশ্রমে আমাদের ফুটবলের কথা বলেছি। শ্রীমা আমাদের খেলার শুধু দর্শক এবং উৎসাহদাত্রীই ছিলেন না, তিনি দল (team)-গঠনেও উপদেশ দিয়েছেন, কাকে কোন স্থানে খেলতে দিলে দলের শক্তিবৃদ্ধি হবে সে-সম্বন্ধেও মতামত দিয়েছেন, এবং খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি ও খেলাধুলার আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রচুর মন্তব্য করেছেন। তবে শুধু ফুটবল নয়—খেলার মাঠে নামা তিনি শুরু করেছিলেন নান্‌তাইয়ে (Nanteuil)—এখন যেটা টেবিল নম্বর দুই—টেবিল টেনিস দিয়ে। তিনি একদিকে খেলতেন—অন্যদিকে প্রতিপক্ষ বেছে নিতেন আমাদের মধ্যে থেকে কোনো ছেলে বা মেয়েকে। কতকগুলি গেম খেলা হত—সে-খেলা শুধু খেলা নয়, অন্য কিছু হয়ে উঠত। তখন আমাদের সেরা খেলোয়াড় ছিল কণক। সে সেকালে শিবরামন, চন্দ্রানাদের সঙ্গে খেলায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। টেবিল টেনিস থেকে মা এলেন টেনিস-মাঠে। এখানে তাঁর জুটি ছিল প্রণব—বিপক্ষে কোন্ জুটি খেলবে তা তিনি নিজে নির্বাচিত করে নিতেন। শুরুতে আমাদের ছিল মাটির মাঠ বা ক্লে-কোর্ট পরে তা পরিণত হয় সবুজ রংয়ের হার্ড কোর্টে। একদিন তিনি এক সেটে আমাকে ও আর একটি ছেলেকে ডেকেছেন তাঁর বিপরীত দিকে খেলতে। সেদিন কিছু আগে বৃষ্টি হয়েছিল খানিকটা—ক্লে-কোর্ট খুব পিছল না হলেও নরম ছিল। তিনি কোর্টে ঢুকতে ঢুকতে আমাকে সম্বোধন করে বললেন, "See, don't make me run too much"—(দেখো আমাকে খুব বেশি দৌড় করিও না)। মায়ের সঙ্গে খেলায় আমাদের শেখা হতো মাপা মার বা controlled stroke, বল ফেরত দিতে হতো তাঁর ডান হাত বা forehand-এ এবং সে-বল মাটিতে পড়ে তাঁর হাতে গিয়ে পৌঁছবে কোমর-সমান উচ্চতায়। তিনি অবশ্য আমাদের দিকে যেখানে খুশি মারতে পারতেন। মা বেশ চলাফেরা ক'রে খেলতেন—এককালে তিনি নিশ্চয় ছুটোছুটি করেও খেলেছেন। আমাদের মধ্যে যাঁরা টেনিসে উৎকৃষ্ট পর্যায়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত শিকারী কুমুদবন্ধু চৌধুরীর পুত্র কল্যাণদা, এবং নূতনদের মধ্যে যারা উঠছিল তারা কণক, অভয়সিং, চন্দুভাই, চন্দ্রকান্ত, সুরেন্দ্র প্রভৃতি। এখন এদের স্থান নিয়েছে আরো নূতনরা। টেনিস বোধহয় মায়ের কাছে সবচেয়ে প্রিয় খেলা ছিল—বহু বছর তিনি নিয়মিত খেলেছেন আমাদের কোর্টে। এই কোর্টেই দিলীপ বোস খেলেছেন ১৯৫২ সালে। আর খেলেছেন সুব্রত মিশ্র, শেখাদ্রি ও বিষ্ণুমোহন। বিখ্যাত রামনাথন কৃষ্ণন বিশ্ববিখ্যাত হবার আগে এই কোর্টেই খেলে গিয়েছেন মায়ের সামনে। আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনের পরেও সেকথা তাঁর স্মরণে আছে শুনেছি।

আমাদের ক্রিকেট খেলা দেখতে তিনি একবার সারাভানের মাঠে (প্রফেসর সারাভান) গিয়েছিলেন। খেলাটা নিজেদের দুই দলের। সেই খেলায় প্রধান আকর্ষণীয় ছিল

নিত্রণ—আমাদের আশ্রমের গোড়াপত্তনের যুগের দুবাইস্বামী আইয়ারের পুত্র সে গত যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছিল—ক্রিকেটে পরিচ্ছন্ন পরিপাটি ব্যাটিং ছিল তার।

এই নানা রকম খেলা (ডলিথল মাঠেও আমাদের ছেলেদের ম্যাচ খেলা দেখেছেন তিনি) ছাড়াও আমাদের Athletics Competition-এর সময়ে বাসাধিক কাল তিনি স্পোর্টস মাঠে উপস্থিত থাকতেন এবং সকল জটিল সমস্যায় চূড়ান্ত রায় দিতেন। সেকালে স্পোর্টস একান্ত সীরিয়াস ব্যাপার ছিল—প্রত্যেকের চেষ্টা হতো যথাসাধ্য করবার এবং সাধ্যকে ছাড়িয়ে যাবার, লায়সারা গোছের কিছু করা কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। হৃদয়, বিশু প্যাটেল, চিন্ময়, সুধাংশু, লক্ষ্মণরাজ, অরবিন্দবাবু, গঙ্গারাম, মনোজ, সুহাস, বাবু, কোনো না কোনো বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে। কিট্টু, সিদ্ধার্থ মন্টু সমান পাল্লায় এগিয়ে এসেছে—দৌড়ে, লাফে।

টেনিস মাঠ বা স্পোর্টস ময়দান থেকে তিনি চলে আসতেন আর এক খেলার মাঠে —আমাদের আশ্রমের কাছাকাছি প্লে-গ্রাউণ্ডে। এখানে সর্বদলের দৈনন্দিন মার্চপাষ্টে অভিবাদন (Salute) নিতেন এবং প্রবীণ ও বৃদ্ধদের ব্যায়ান-কুচকাওয়াজ দেখতেন। বয়স্করাও যে কি রকম শরীরচর্চার পাঠ নিতে পারেন এখানে তার এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত। এই কুচকাওয়াজ (Gymnastic Marching) পরিচালনা করতেন প্রণব—মাঝে মাঝে খুশমেজাজে তার কণ্ঠে পদক্ষেপের তালে তালে সুন্দর সুরের শিস বেজে উঠত। খেলা-কসরত শেষ হলে গ্রুপ-পরিবেষ্টিত মা ভারতের মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে অভিনিবিষ্ট (Concentration) হতেন এবং তারপর প্রসাদ (কখনো গণপৎরাম চিফি, কখনো চীনেবাদাম) বিতরণ করতেন। বৃহস্পতিবার ও রবিবার খেলাধূলার শেষে পৌণে আটটা থেকে আধ ঘন্টা ধ্যান হতো। এই প্লে-গ্রাউণ্ডের পাশাপাশি খেলার মধ্যে আবার চলত পাঠক্রম। এইবার সেই চিত্তাকর্ষক প্রসঙ্গে আসা যাক।

শ্রীমা শরীরচর্চাকে এখানে যেমন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এবং অধ্যাত্মিক স্বার্থে প্রয়োগ ও প্রচলিত করেছিলেন তেমনি মনেরও উৎকর্ষের বন্দোবস্ত করেছিলেন। তাঁর শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান সূত্রই হলো মনকে ছাড়িয়ে যাওয়া—জ্ঞানের জন্য তাকে প্রস্তুত ক'রে তোলা, বৃহত্তর জ্ঞান ও আলোর দিকে তাকে উন্মীলিত ও উন্মুখী ক'রে ধরা—ফলতঃ আসল জ্ঞানের আর একটা গভীরতর উৎস খুলে দেওয়া। ১৯৪২ সাল থেকে আশ্রমে শিশু ও বালক-বালিকাদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। ছোটদের জন্য তখন যে-বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল (বর্তমানে যেখানে জিমনাশিয়াম হল) এখন তার এই মহীরুহ চেহারা। সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষণের নানা নূতন সূত্র ধরিয়ে দিতেন মা। ছাত্র-ছাত্রীরাও ব্যক্তিগতভাবে মায়ের কাছ থেকে মৌখিক বা লিখিতভাবে নানা রকম প্রশ্নে তাদের জিজ্ঞাসার উত্তর জেনে নিত—তিনি নিজেও অনেককে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ছোটদের বহু বিষয়ে বলতেন।

বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকারা পড়াতেন। মা নিজেও আরম্ভ করলেন ক্লাস নিতে। গেষ্ট হাউসে বৈকালিক খেলাধূলার পরে তাদের নিয়ে বসতেন—একেবারে ছোটদের ক্লাস, কচিদের—কিণ্ডারগার্টেন (Kindergarten) বলা চলে—তাদের বয়েস ছয় থেকে দশের মধ্যে। এই সবুজদের মা দিতেন ফরাসীভাষা শিক্ষার প্রথম পাঠ—সপ্তাহে তিন দিন :

সৌরকনে বড়দের ক্লাসে শ্রীমা

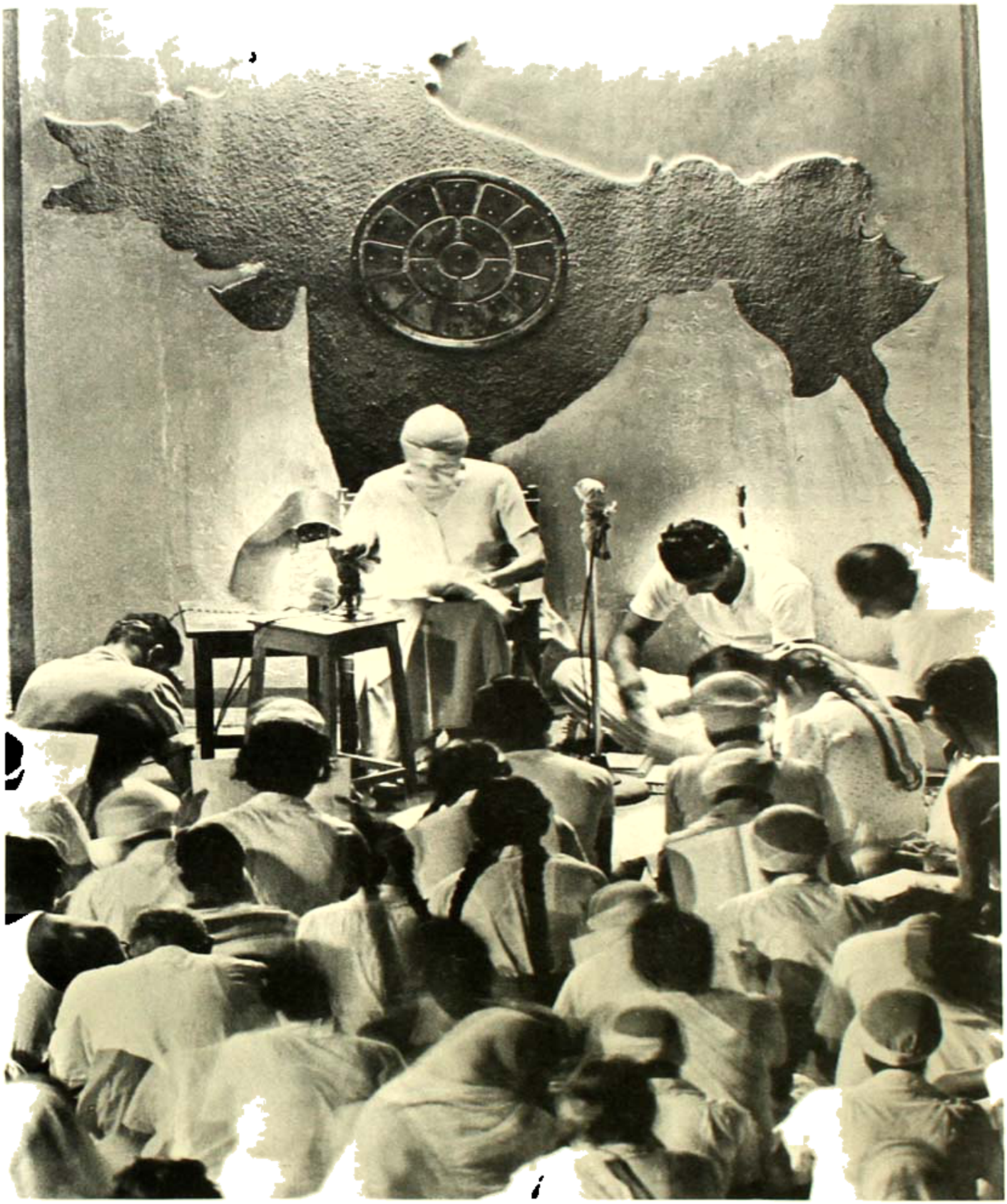

খেলার মাঠে ছোটদের ক্লাসে শ্রীমা

Over 500 people in Kibera slum

মঙ্গলবার, শুক্রবার আর রবিবার—তাতে বিষয় হল যথাক্রমে আবৃত্তি, গল্প এবং প্রতিলিখন। এই প্রথম ক্লাস যা নিয়েছিলেন ১৯শে নভেম্বর, ১৯৫০। ফরাসীভাষার উপর যা জোর দিতেন শুধু তাঁর মাতৃভাষা বলে নয়, তিনি বলতেন—এ-ভাষা পরিচ্ছন্ন যুক্তির ভাষা, স্বার্থ-হীন অতিব্যক্তির ভাষা, এ ভাষার যথাযথ ব্যবহারে চিন্তা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, আত্মর অভিজ্ঞতা সুগঠিত হয়ে আসে, সুশৃঙ্খলভাবে বিচার করতে শেখায়। সংস্কৃতেরও আছে এই গুণ—সংস্কৃত তাই তাঁর কাছে পেয়েছে এতখানি প্রাধান্য। আমাদের বিদ্যালয়ে দেবভাষা তো আজ অবশ্য পাঠ্য।

Dortoir বা Guest House থেকে ক্লাস উঠে এল প্রথমে খেলার মাঠে মায়ের ঘরে এবং কিছুদিন পরে ভারতবর্ষের মানচিত্রের সামনে খোলা মাঠে। এখানে পাঠ্য হয়েছিল Prayers and Meditations, নানা প্রশ্নোত্তর, ধম্মপদের ব্যাখ্যাও হয়েছিল এখানে। লাল গ্রুপের মেলা ছিল এটা—তবে অন্যরাও অবাধ প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালের ৬ই জুন আরম্ভ হয়ে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এই ক্লাস চলেছিল। একদিন, প্রতি শুক্রবার—ফরাসী ভাষায় অনূদিত দেশবিদেশের গল্পও পড়ে শোনাতেন। সেই গল্পপাঠ তাঁর কণ্ঠে জীবন্ত ঘটনা হয়ে উঠত। সেসব গল্পের মূল কথা শ্রোতাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করত।

আর একটি সভা বসিয়েছিলেন মা—১৯৪৭ সালে মে মাসের মাঝামাঝি, এখন যেটি দর্শনঘর সেইখানে। জনা পঞ্চাশেক ছিলেন ছাত্রছাত্রী। কলেজ বা পোষ্টগ্রাজুয়েট পর্যায়ের। এটি শুরু হতো মধ্যাহ্নে—ঘন্টাখানেক চলত। এখানেও ধ্যান ও প্রার্থনার প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তরসূত্রে চলত মায়ের আলাপ। ফরাসীতেই কথা হতো—শুধু Ali-Aliceদের জন্য বলতেন মাঝে মাঝে ইংরাজীতে—তারা হায়দারাবাদের লোক এবং বিশেষ অনুপ্রাণিতজন। ক্লাসের শেষে মা সবাইকে আলাদাভাবে আশীর্বাদ দিতেন—এবং কারো ব্যক্তিগত বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকলে তারও উত্তর দিতেন। এই ক্লাসে 'ভগবৎ সেবকের প্রার্থনা' ফরাসীতে মুখস্থ করে আমরা মায়ের সঙ্গে সমবেতকণ্ঠে আবৃত্তি করেছি। প্রার্থনাটি উদ্ধৃত করছি—

Le 23 Octobre 1937

(Prière pour ceux qui veulent servir le Divin)

Gloire à Toi, Seigneur, triomphateur de tous les obstacles.

Permets que rien en nous ne fasse obstacle à Ton œuvre.

Permets que rien ne retarde Ta manifestation.

Que Ta volonté soit faite en toute chose et à tout moment.

Nous somme devant Toi pour que Ta volonté s'accomplisse en nous dans tous les éléments, toutes les activités do notre être, depuis les hauteurs suprêmes, jusqu'aux moindres cellules de notre corps.

Permets que nous Te soyons entièrement et éternellement fidèles.

Nous voulons être complètement sous Ton influence, à l'exclusion de toute autre.

Permets que nous n'oublions jamais de T'être profondément et intensément reconnaissants.

Permets que nous ne gaspillions jamais rien de toutes les choses merveilleuses que Tu nous donne à chaque instant.

Permets que tout en nous collabore à Ton œuvre, que tout soit pour Ta manifestation.

Gloire à Toi, Seigneur, Réalisateur Suprême.

Donne-nous une foi ardente, active, absolue, inébranlable en Ta VICTOIRE.*

আলোচ্য বিষয়বস্তুর ভাবালম্বনে Advent-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে এবং বক্তিকায় সেইসব ভাষণের কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। কিছুকাল চলার পরে এই ক্লাসটি বন্ধ হয়ে গেল।

তবে তার সূত্র ধরে মা আবার ক্লাস বসালেন গ্রেগ্রাউণ্ডের একেবারে পূর্বদিকের ছোট্ট ঘরে—এখন যেটা **Store room.** এখানেও সাধনার নানা প্রশ্ন নিয়ে কথা বলতেন মা।

---

* অক্টোবর ২৩, ১৯৩৭

(ভগবৎসেবার্থীদের প্রার্থনা)

নিখিল-বিঘ্ন-বিনাশক, হে ভগবান, জয় হোক তোমার।

আমাদের অন্তরে কোন-কিছুই যেন তোমার কর্মের অন্তরায় না হয়।

কোন-কিছুই যেন তোমার আবির্ভাবে বিলম্ব না ঘটায়।

তোমার ইচ্ছাই যেন পূর্ণ হয় প্রত্যেক জিনিসে, প্রত্যেক মুহূর্তে।

তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমরা, আমাদের মধ্যে যাতে তোমার ইচ্ছাই সম্পন্ন হয়, আমাদের আধারের প্রত্যেক অঙ্গে, প্রত্যেক ক্রিয়ায়—ঊর্ধ্বতন চূড়া থেকে আমাদের দেহের ক্ষুদ্রতম কোষ অবধি।

তোমার কাছে যেন আমরা অখণ্ডভাবে চিরকাল একনিষ্ঠ হয়ে থাকি।

আমরা চাই অনন্যমুখী হয়ে সম্পূর্ণরূপে কেবল তোমারই প্রভাবের মধ্যে থাকি যেন।

আমরা কখন যেন তোমার কাছে গভীরভাবে তীব্রভাবে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকতে ভুলে না যাই।

প্রতি মুহূর্তে যে সব অপরূপ জিনিস তুমি আমাদের দিয়ে চলেছ তার বিন্দুমাত্র যেন আমরা অপচয় না করি।

তোমার কর্মে আমরা সর্বতোভাবে যেন সহযোগী হতে পারি, তোমার সিদ্ধির জন্য সর্বতোভাবে তৈরী হয়ে উঠতে পারি।

পরম সিদ্ধিদাতা, জয় হোক তোমার, হে ভগবান।

তোমার বিষয়ে দাও আমাদের অনন্ত সক্রিয় অনন্যমুখী অবিকম্প বিশ্বাস।

কিন্তু এটি প্রধানত ছিল ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য চর্চার অবকাশ। ছাত্রছাত্রীরা সকলেই পরিণতবয়স্ক—নলিনীকান্ত এবং পবিত্রও এদের মধ্যে উপস্থিত। একদিনের ক্লাসে ব্ল্যাক বোর্ডে কতকগুলি শব্দ দেওয়া হল। প্রত্যেককে তার থেকে দুটি করে শব্দ বেছে নিয়ে বাক্য রচনা করতে হবে। আমার পালা এল সকলের শেষ, তখন দুটিমাত্র কথা অবশিষ্ট ivrogne ও menteur. আমার বাক্যটি দাঁড়াল L'ivrogene est un mauvais menteur (The drunkand is a bad liar)। বাক্যটি মায়ের মনঃপুত হয়েছিল। তিনি তলায় লিখে দিয়েছিলেন "bien" (good)। এখানে তিনি আমাদের কবিতা মুখস্থ এবং আবৃত্তি শেখাতেন। শব্দের সঙ্গে শব্দের সুর টেনে অর্থের রেখা কেমন তরঙ্গিত প্রবাহের অবিচ্ছিন্ন ভঙ্গিতে চলে যায়—কেমন নিটোল সুরের ছন্দে কবিতার ভাবমূর্তি ফুটে ওঠে, তা তিনি দেখিয়ে দিতেন। আবার পঠিত কবিতাই তিনি কি অপূর্ব স্বকীয় ভঙ্গিতে আবৃত্তি করে শোনাতেন।

যতদূর স্মরণ হয় এই ক্লাসে পিতৃদেব দু'দিন দুটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। তার একটি ভিক্তর হুগোর (Victor Hugo) বিখ্যাত নেপোলিয়ন—Napoléon II. কবিতার খানিকটা উদ্ধৃত করি—

I

Éperdu, l'œil fixé sur quiconque était roi,
Comme un aigle arrivé sur une haute cime,
Il cria tout joyeux avec un air Sublime:
—L'avenir! l'avenir! l'avenir est à moi!

II

Non, l'avenir n'est à personne!
Sire, l'avenir est à Dieu!
A chaque fois que l'heure sonne,
Tout ici-bas nous dit adieu.
L'avenir! l'avenir! mystère!
Toutes les choses de la terre,
Gloire, fortune militaire,
Couronne éclatante des rois,
Victoire aux ailes embrasées,
Ambitions réalisées,
Ne sont jamais sur nous posées
Que comme l'oiseau sur nos toits!

Non, si puissant qu'on soit, non, qu'on rie ou qu'on
pleure,

Nul ne te fait parler, nul ne peut avant l'heure
Ouvrir ta froide main,
O fantôme muet, ô notre ombre, ô notre hôte,
Spectre toujours masqué qui nous suis côte à côte,
Et qu'on nomme demain!...

কৌতূহলী পাঠক সবগুলি কবিতাটি পড়লে দেখবেন এর মধ্যে কি একটা গভীর টান, কি একটা শক্তি কল্পনাকে প্রস্ফুটিত করেছে।

এই ক্লাসে মা আমাদের কাছে আদ্যোপান্ত পড়ে শুনিয়েছিলেন আনাতোল ফ্রাঁসের (Anatole France) Révolte des Anges উপন্যাসটি। ফরাসীভাষার কদর বুঝতে হলে আনাতোল ফ্রাঁসের রচনা অবশ্যপাঠ্য। এই ক্লাসটি ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে চলছিল এবং সম্ভবত ডিসেম্বরে বন্ধ হয়েছিল।

অল্প কিছুকাল পরে আবার নূতন ক্লাস শুরু হল—পাশের ঘরটিতে—এখানে ডেস্ক-বেঞ্চি ছিল, স্থানসংকুলানও হতো অনেক বেশি ছাত্রছাত্রীর। প্রথমে হ'ত প্রশ্নোত্তর, আলোচনা—যে যেমন সমস্যা উত্থাপন করতে পারত তার উত্তর ও সমাধান দিতেন মা। কেউ কোনদিন দিয়েছেন এইটি প্রস্তাব (thesis), তিনি নিজে উপস্থাপিত করে বলেছেন বিপরীত মতব্যটি (antithesis)। তারপর বিশ্লেষনান্তে উপহার দিলেন একটি সমন্বয় (synthesis)।—কি ক'রে উভয় দিক দেখতে হয়, বিচারকালে অপক্ষপাত মনোভাব নিয়ে কি ভাবে সত্যদর্শনে পৌঁছাতে হয় তার দৃষ্টান্ত হিসাবে।

এই ক্লাসটি অনুবাদ ক্লাস বলেই পরিচিত। কারণ প্রাথমিক আলাপ আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের পরে মা এখানে শ্রীঅরবিন্দের বই অনুবাদ শুরু করেন। যে বইগুলির এই ক্লাসে অনুবাদ হয়েছিল তা Synthesis of Yoga, The Ideal of Human Unity, The Human Cycle এবং Life Divine-এর কিছু অংশ। মা অনুবাদ নিজের খাতায় লিখতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তা পড়ে যেতেন—আমরা তা প্রতিলিপি লিখে নিতাম আমাদের খাতায়। আমাদের প্রত্যেকের কাছে একটি করে বই এবং খাতা থাকত। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'কালিদাস' গ্রন্থে (Kalidasa—On translating Kalidasa) প্রবন্ধে অনুবাদের অনেক সমস্যার সমাধান দিয়েছেন—বিশেষ করে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ব্যবধান অতিক্রমের সন্ধান। মা দেখলাম কি রকমে ইংরাজীর ধাঁচ-ধরণ ফরাসীর ধাতস্থ করে নিতেন—তা Outlandish না থেকে ফরাসী হয়েই উঠত। দীর্ঘকাল চলেছিল এই অনুবাদ ক্লাসটি।

এ ছাড়াও ব্যক্তিগত সাক্ষাতে মুদ্রণ, কাব্যরচনা, চিত্রাঙ্কন, ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে কত কথা তিনি বলেছেন। একদিন ফরাসী সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ইংরাজী উক্তি আমার ডায়েরী থেকে তুলে দিচ্ছি

"Balzac does not excel as a stylist, nor his French can be said to have reached anything near the ideal. It is heavy, spun-out and stiff—'recueilleux', if you know what I mean. It does

not shed light and move on gracefully, but walks with false steps. It does not inspire. For, he himself was a sore pessimist—always looked at the dark and hopeless side of things. He did not see that things could be otherwise, might have another aspect—better and brighter. He could not cast his vision into the future.

"But if you want to know the manners of certain french people, local customs, and habits and peculiarities, and social conditions, you can of course read Balzac. There you will find him a keen observer and faithful lover of every detail. But his short stories are tolerable.

"Zola is different and is a powerful writer. He is honest and a fighter. His "Assommoir" deals with the drinking places and the people who take to drinking and frequent these places. His 'Germinal' deals with the life of the workers in mines and factories—containing, no doubt, strikes and revolts. His 'Nana' is one of his best books. He may not always stress upon the happy side of men and things—but here in this book he showed that even in creatures like Nana and her many miserable friends there could still be found good things. In the first mentioned two books Zola wrote about things which were at that time thought to be uninteresting. He was obviously looking and living ahead of his time.

"And he is a fine painter. His description of Nature is superb. One loves to read these passages about Paradon in "La faute de l'Abbé Mouret." It is exquisite, so living and yet so real. There is no touch of faithlessness in it, no frivolity, no sheer fancy. In Southern France such scenes do really exist."

ঘরে বাইরে দিবারাত্রি তাঁকে লোক-সম্মুখীন হতে হয়েছে—শিষ্য ভক্ত অনুগতজন প্রায় সর্বদাই সর্বত্র তাঁকে অনুসরণ করেছে। যেখানেই তিনি পদক্ষেপ করেছেন, যখনই তিনি বাক্ উচ্চারণ করেছেন, যেই মাত্র তিনি দৃষ্টি মেলেছেন কোথাও বা কারো প্রতি তখনই তিনি জাগিয়ে দিয়েছেন চেতনা, ছড়িয়ে দিয়েছেন আলো, বিলিয়ে দিয়েছেন এক অনির্বচনীয় মধুরিমা। হিংসা-দ্বেষে জর্জরিত উন্মত্ত এই পৃথিবীর বাতাস তবু মধুময় হতে পেরেছে তাঁর এই অপার অপার্থিব কারুণ্যে।

Our Homage to Sri Aurobindo and The Mother

Mitra Engineering & Construction Co.

(ENGINEERS OF REPUTE)

Phone 46-3957

Specialist in Insulation Work, Air Conditioning & Refrigeration, Electrical Engineers & Builders.

16/1, Chandranath Chatterjee Street
Calcutta—25

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field
Sreepore Bagharghole
P.O. Bonhooghly, 24 Parganas

Head Office
34: 1, Puddapukur Road
Calcutta-20

Phone : 47-2869

With the best Compliments from :—

Ellora Enterprise

Paper & Board Merchants

57/2A, College Street
Calcutta-12

Phone: 34-3720

স ম গ্র

র চ না ব লী

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

চার খণ্ড প্রকাশিত—প্রতি খণ্ডের মূল্য ২৫·০০ টাকা

পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, মনোরম বাঁধাই, সুশোভন সংস্করণ

অমলেশ ভট্টাচার্যের

নিঃসঙ্গ আকাশ

নিঃসঙ্গ আকাশের মতোই উদার উন্মুক্ত চেতনার সুরে
রচিত অভিনব কাব্যগ্রন্থ।

রমেন সেনগুপ্তের

শতবার্ষিকী উপলক্ষে মায়ের চরণে নিবেদিত

প্রণতি

(কাব্যগ্রন্থ)

মূল্য ১·০০ টাকা

সমীরকান্ত গুপ্তের

কাব্যলোকে

বাংলা কাব্যের মনোজ্ঞ আলোচনা

প্রাচীন থেকে আধুনিক পৌঁছানোর চিত্তাকর্ষক প্রকৃতি-বিশ্লেষণ

মূল্য ৮·০০

শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা সংগ্রহ

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ শ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী। শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির বহুভাবে শতবার্ষিকী জয়ন্তী পালন করবে। জয়ন্তীর একটি অংশ পালিত হবে শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা প্রকাশনের মাধ্যমে। শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা মূল ফরাসী এবং ইংরাজী থেকে বাংলায় অনূদিত ১৫ খণ্ডে প্রকাশ হবে। তাতে থাকবে, তাঁর লেখা ধ্যান ও প্রার্থনা, পুরাণো লেখা, প্রশ্ন উত্তর, প্রবন্ধ, পত্রাবলী ইত্যাদি।

2 8 AUG 1978

প্রাক প্রকাশনী মূল্য—১০০৲ টাকা (সডাক ১৫০৲ টাকা) (গ্রাহকদের জন্য)
প্রকাশ হবে পরবর্তী মূল্য ২৫০৲ টাকা (সডাক ৩০০৲ টাকা)

[শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা সংগ্রহ জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ মোট ১৫ খণ্ডে প্রকাশ করা হবে। বাইবেল পেপারে ছাপা ও সুন্দর কাপড়ে মজবুত বাঁধাই হয়ে সুদৃশ্য বাক্সেটে মোড়া হবে। খুব কম সংখ্যা ছাপানো হবে।]

—গ্রাহক হবার নিয়মাবলী—

১। ৩০৲ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।
২। প্রতিটি খণ্ড প্রকাশ হলে গ্রাহকদের জানানো হবে এবং ২০৲ টাকা দিয়ে বই সংগ্রহ করতে হবে।
৩। শেষ দুই খণ্ড অর্থাৎ ১৪ ও ১৫ খণ্ড সংগ্রহ করবার সময় গ্রাহকের জমা ৩০৲ টাকার সঙ্গে হিসাবনিকাশ করা হবে।

৪। যোগাযোগ করার স্থান :—

(ক) শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির,
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

(খ) শ্রীঅরবিন্দ ভবন,
৮ শেক্সপীয়র সরণী, কলিকাতা-৭০০০৭১

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্তিকা

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY
UNIVERSITY

১৫ই আগস্ট, ১৯৭৮

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্ত্তিকা

(১৫ই আগস্ট, ১৯৭৮)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—৭৩

মহাকাল	শ্রীঅরবিন্দ	৫
মধুময়ী মা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৮
সাবিত্রী (অনুবাদ)	শ্রীঅরবিন্দ	১০
ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	২০
রচনাগুচ্ছ	শ্রীমা	২৪
দু'টি কবিতা	সৌমিত্রশঙ্কর দাসগুপ্ত	২৯
মায়ের আলাপ		৩১

বার্ত্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by : **Nolini Kanta Gupta**
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-73
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry-2

Life could be quite simple
and easy if man's mind did not
introduce in it so many useless
complications.

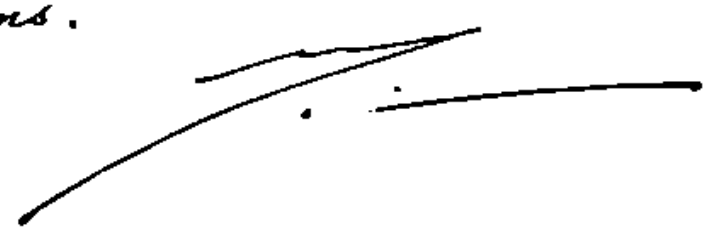

মহাকাল

শ্রীঅরবিন্দ

[শ্রীঅরবিন্দের এই বাংলা কবিতাটির দুটি সংস্করণ আছে,—একটি দীর্ঘতর আর একটি হ্রস্বতর—এই শেষোক্তটি পূর্বোক্তের অংশ মাত্র। আগের সংখ্যা 'বর্তিকা'য় (ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮) আমরা হ্রস্বতরটির মুদ্রিত অক্ষরে প্রকাশ করেছি—আর দীর্ঘতরটির ফটো-চিত্রখানি। বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করলাম দীর্ঘতরটি মুদ্রিত অক্ষরে এবং হ্রস্বতরটি ফটো-লিপি চিত্রে। হ্রস্বতরটিতে কিছু পরিবর্তন করেছেন লেখক স্বয়ং। সেগুলি আমরা দেখিয়েছি বর্তমান দীর্ঘতর ছাপার সংস্করণে—পাদটীকায়। হ্রস্বতর অংশটি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে দীর্ঘতর অংশটির এই মুদ্রিত সংস্করণে।—সম্পাদক]

কে তুমি বিশাল সান্তে মহাগতি কাল
বহিছ অনাদি হতে অনন্তের পানে ?
[বুঝেছি তোমার ভাষ১, মহাপ্রাণ কাল।
বিচিত্র আকাশ যবে কিরণ-প্রপাতে
গায়াপুরী-রচয়িত্রী নির্মল সন্ধ্যার,
ভ্রমেছি নদীর তীরে, কলকলস্বর
সমাকুল প্রাণগীতি ভরঙ্গ-বীণায়
মিলাইতে হৃদি তারে। অনন্ত রজনী
নামিল নিঃশব্দপদে মুকুটের ছায়া
বিস্তারি গগনপটে, উড়ায়ে অঞ্চল
মসৃণ আঁধার পাতি দীর্ঘ ধরাতলে।
চিন্তামগ্ন নেত্রে ওই২ বিপুল সন্ধ্যায়৩
আকাশ-ব্রহ্মের ধ্যানে নিলীন ভৈরবী
কৃষ্ণকায়া জগন্মাতা সমাধিস্থ ভবে৪।
টানিয়া গভীর কোলে শান্তিস্তব্ধ প্রাণী
সুষুপ্তির অভিনেত্রী থামাইল আসি
জীবনের কোলাহল অন্তহীন মৌনে।

---

১ বিকল্প—'আত্মা'
২ শব্দটি অস্পষ্ট
৩ পাঠান্তর—'শয্যায়'
৪ পাঠান্তর—'এবে'

নীরবতা-মধুভোজী তারকার পাল
দীপ্ত মৌমাছির মত[১] উড়ে আসে নভে।[২]
সুশীতল রভসের সমুজ্জ্বল ভাণ্ড
ভেসে উঠে শশী নিশিথচিত্ত নিশায়।
জ্যোৎস্নাপ্লুত অন্ধকারে আলোকিত রাত্রে[৩]
বিশাল সে মহাভাবঃ এ অসীম প্রাণে
ডুবাইয়া শুনিয়াছি নীরবের গান।]
বাজিল অন্তরে যবে মাধুর্য্য-স্পন্দন
ভাঙ্গিল সমাধিঘোর স্তব্ধ জগতের[৪],
আলোক-বসন-স্পর্শে জাগিল কাহার,
কার দূর পদধ্বনি পশিল মরমে?
পরিতৃপ্ত শূন্যতার মনন্তর বিঁধি
উষা উঠিয়াছে হাসি রঞ্জিত গগনে,
মনোহরা স্মিত-আঁখি বালিকা যেমন,
উদ্দাম উল্লাস পদে হাসিভরা প্রাণ
পিতার ভবনে নাচি মুক্ত আঙ্গিনায়।
জীবনের হর্ষ যে মঞ্জু নিষ্ট ডাকে
জানাইতে পরস্পরে পলকে পলকে
ডাকিতেছে পক্ষীকুল সুমধুর তানে,
সহস্র উন্নত শাখা, সবুজ বসন
নাচিতেছে তরঙ্গাকী আলোক-উৎসবে।
সেই আলোক-উৎসব অন্তরালে চাকা
স্বর্গসোমপানে মত্ত (জগৎ-)[৬] ঋষির
আনন্দের বেদগানে (শুনি মর্ম্মে মর্ম্মে)[৭]
জানিলাম কি গভীর আনন্দস্ফুরণে
ফুটিয়াছে বিশ্বপদ্ম অনন্তের স্রোতে।

---

১ হ্রস্বতর সংস্করণে পংক্তির প্রথম অংশটুকু এইরূপ : দীপ্তির মৌমাছি সব

২ হ্রস্বতর সংস্করণে এর পর নিম্নলিখিত একটি পংক্তি সংযোজিত হয়েছে :
মাখিতে প্রাণীর মর্ম্মে আনন্দ কিরণ

৩ হ্রস্বতর সংস্করণে 'স্বপ্ন-আলোকিত'

৪ হ্রস্বতর সংস্করণে পংক্তির প্রথম অংশটুকু এইরূপ : মানবের ক্ষুব্ধ প্রাণ

৫ বিকল্প—'যোগিনীর'

৬ বন্ধনীর মধ্যে শব্দটি পাণ্ডুলিপিতে কাটা রয়েছে।

৭ বন্ধনীর মধ্যে অংশটি পাণ্ডুলিপিতে কাটা রয়েছে এবং 'বেদগানে'র এ-কারটি পরে যোগ করা হয়েছে।

সুনীল আকাশ পরে মেলাইয়া শির
নিদ্রিত মধ্যাহ্ন যবে বিশ্বকক্ষে একা,
হৃদয়ে বিশাল ধ্বনি ত্রিকালের কণ্ঠে
মহামন্ত্র বাজিয়াছে জগৎ-আত্মার।

মিলাইয়া তুষ্টপ্রাণে অগণন ভাব
চিরশান্ত উচ্চকর্মী দেখিতেছে কেহ
মহাকালে আনন্দিত সনাতন কবি
পূর্ণছন্দ সৃষ্টি তার। গভীর সন্তোষে
সান্তে বহি সে অসীম অপরূপ রূপে
ঘুরিছে অনন্ত বিশ্ব প্রভু পদপ্রান্তে।
লক্ষতপ্ত কিরণের প্রচণ্ড প্রসারে
গগনের চূড়া হতে মানিতে বিধান
নামিয়াছে সূর্য্য যবে বীর মহিমায়,
অবসানে ভরাশান্তি লভিয়াছি চিতে,
জীবনসুধার পান শূন্য করি পাত্র
তুরীয়ের মহাগীত পরিতুষ্ট কর্ণে।
এইরূপ প্রতিদিন অদম্য কৌতুকে
একদিনে বাঁধে যেন অনন্ত সময়,
অল্পেতে সর্ব্বস্ব ঢালি নিজমূর্ত্তি আঁক,
রূপস্রষ্টা প্রাণশিল্পী। নূতন নূতন
নিজ আত্মা নানা ভাবে ভোগ কর, ঋষি।
তব বশে তব ভাবে ধরা নর্ত্তকীর
স্তব্ধ মনে কি উল্লাস অশ্রান্ত সঞ্চারে,
অনন্ত উদ্দাম নৃত্য অক্ষুরন্ত হর্ষ,
কি ও[১] ব্রহ্মাণ্ড স্ফূর্ত্তি প্রচণ্ড স্ফুরণ।
বহি প্রাণে দিন রাত ঋতু সম্বৎসর
বুঝেছি তোমার ভাব, দেখেছি শরীর।
কে আত্মা তোমার? কোন অদৃষ্টের বলে
ঘুর মহাবাহু সদা ঘুরাও জগতী।

---

১ পাঠান্তর—'এ'

মধুময়ী মা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

আমি তাহলে তোমাদের একটা গল্প বলি—একটা বা কয়েকটা গল্প। এ সব গল্প, এদের অনেকগুলিই আমি নানা উপলক্ষে বলেছি তোমাদের বড়দের কাছে, অর্থাৎ তোমাদের পূর্বগামী যারা, যারা এখন সব দিব্যি বড় হয়ে গেছে, মানে হয়ে গেছে ভদ্রলোক। গল্পটি তবে বলি :

একদা একসময়ে একটি ছোট্ট মেয়ে ছিল, বেশ ছোট, খুব ভাল মেয়ে, খুব সুন্দর, সে থাকত তার পরিবারের মধ্যে, তার বাবা মার সঙ্গে, বিশেষ করে তার দাদুর সঙ্গে। এই দাদুটি ছিলেন বয়সে কিছু বৃদ্ধ কিন্তু ভারী ভাল আর শান্ত ও সহৃদয়, ঠিক তারই মত। তিনি বাচ্চাটিকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, সত্যি বলতে কি নাতনীটি ছিল তাঁর চোখের মণি আর ছোট্ট মেয়েটিও দাদুর ভালবাসার যোগ্য প্রতিদানই দিত।

একবার বৃদ্ধ মানুষটির অসুখ করল, অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। সে তো স্বাভাবিকই, তাঁর মত বৃদ্ধের পক্ষে। সকলে, তাঁর বন্ধু, আত্মীয়-পরিজন সবাই তাঁকে দেখতে এল, অসুস্থ মানুষটির ঘরে উপস্থিত হল সকলে। "এখন কেমন আছেন তিনি?" ডাক্তার-রাও রয়েছেন সেখানে। ছোট্ট মেয়েটি অসুস্থ দাদুর বিছানা থেকে একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল। বিষণ্ণ সে, অত্যন্ত বিষণ্ণ। হঠাৎ দাদুর বিছানার দিকে মুখ তুলে চাইল সে, দেখল—অদ্ভুত, অদ্ভুত কাণ্ড—বিছানার কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে আর একটি ছোট্ট মেয়ে, চেহারায় এবং সবদিক দিয়েই ঠিক তারই মত দেখতে সে—তারই দ্বৈত রূপ, প্রতিলিপি যেন। সে নিজে দাঁড়িয়ে-ছিল দাদুর বিছানার এক পাশে খানিকটা তফাতে। অন্য মেয়েটি দাঁড়িয়ে বিছানার বেশ কাছেই উল্টোদিকে ঠিক তারই মত। আশ্চর্য হয়ে মনে মনে ভাবল সে, "কি ব্যাপার? আমি এখানে, আর আবার ছায়া, আবারই প্রতিমূর্তি ওপাশে।" সে দাদুর কাছে এগিয়ে গেল, প্রতিমূর্তিটিও তেমনি এগিয়ে এল তাঁর কাছে। কিন্তু অন্য কেউ এসব কিছুই লক্ষ্য করল না কেবল সে-ই দেখল এসব—অন্যেরা দেখছে শুধু মেয়েটিই একা আছে। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে?" অপর মেয়েটি উত্তর করল : "তোমাকে পরে বলব সে কথা।" তারপরই সে মিলিয়ে গেল। ক্রমশ বৃদ্ধ মানুষটি সুস্থ হয়ে উঠলেন, ছোট্ট মেয়েটিও ফিরে পেল তার দাদুকে আগের মতন করে। কিন্তু প্রায়ই মনে মনে সে অবাক হত, প্রশ্ন জাগত তার এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা নিয়ে। বেশ কিছুদিন যাবৎ এর উত্তর সে পায়নি, তবে নিঃসংশয়ে সে জানত যে সেই অপর মেয়েটির উপস্থিতির কল্যাণেই সে তার দাদুকে ফিরে পেয়েছে। ঘটনাটির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। দৃশ্যটি সম্পূর্ণ একটা বাস্তব, এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

কিছুদিন পরে, বেশ সত্বরই আবার এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটল যে সে বারে বারে এই একই ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেল ; যখনই কোন বাধাবিঘ্ন বা বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, তার থেকে তাকে উদ্ধার করতে এসেছে সে। কালে ক্রমে তার কাছে ব্যক্ত করা হয় যে এই অপর ব্যক্তিটি যাকে মনে হত তারই প্রতিমূর্তি সে আর কেউ নয়, সে নিজেই, তার সত্যকার আত্মার সত্তা।

এই প্রসঙ্গে তোমাদের কারও কারও নিশ্চয়ই মনে পড়তে বিখ্যাত ফরাসী কবি আলফ্রে দ্য মুসের বিখ্যাত কবিতা "Nuit de Décembre"—যেখানে তিনি বলছেন এক অদ্ভুত সঙ্গীর কথা—সে থেকে থেকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করত তাঁর জীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সব—আসত, এসে বসত তাঁর পাশটিতে, এক অপরিচিত ব্যক্তি, পরনে কালো পোশাক, দেখতে তাঁরই মত ঠিক যেন তাঁর নিজের যমজ ভাই

"কৃষ্ণবেশে হতভাগ্য শিশু এক
দেখতে আমারই মত যেন আমার ভাই।"

নিজের মধ্যে এই দ্বৈতসত্তার কাহিনী—একজন তার শিশারী অভিভাবক বন্ধু ও সহায়—এ কিছু এমন বিরল ঘটনা নয়। প্রত্যেকেরই, তোমাদের সকলেরই আছে এই সঙ্গী একজন, এমন বন্ধু সে যে তোমায় রক্ষা করে, তোমায় সত্যসত্যই ভালবাসে। যদি ইচ্ছা কর, তাকে তুমি দেখতে পাবে, অন্তত অনুভব করতে পারবে এবং সে সম্পূর্ণ তোমারই মত দেখতে, তোমারই আপন সত্তা, সেই একই মুখ, একই চেহারা যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছ তুমি; অবশ্য তারও বেশি সত্য ও জীবন্ত। সে তোমার সঙ্গে কথা বলে, তোমায় উপদেশ দেয়, এত প্রিয়জন, একান্ত আদরের ধন। তাকে পাওয়ার, তার সংস্পর্শে আসার, তাকে দেখার, তার সান্নিধ্য অনুভব করার একটি পন্থা ভাল হওয়া, এবং তার কাছ করা, কখনও খারাপ চিন্তা না রাখা, মন পবিচ্ছন্ন রাখা, আচরণে সুন্দর হওয়া। তাতে তোমার বন্ধুকে তোমার কাছে আকর্ষণ করে আনবে যেমন চুম্বক টেনে আনে, এবং তুমি অনুভব করবে তাকে তোমার অন্তরেই তোমার সন্নিকটে এবং সেই গোপন সঙ্গী নিজেকে তোমার কাছে প্রকট করে ধরবে। এই গোপন বন্ধু হল মায়েরই সান্নিধ্য, যা সর্বদাই তোমার সঙ্গে রয়েছেন, তোমাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গে—আমি তো সর্বদাই সেকথা বলে এসেছি।

আমি বরঞ্চ বলতে পারি তোমাদের প্রত্যেকে নিজের মধ্যে তিনটি সত্তাকে বয়ে নিয়ে চলেছ—তুমি যেন একটা ত্রিধা ব্যক্তিত্ব প্রথমত তোমার বাহ্য রূপটি, যেমন তুমি অন্যের সামনে দাঁড়িয়ে আছ, সাজিত সুসজ্জিত—তোমার যত বেশ বন্ধনী, সাজসজ্জার পিছনে লুকিয়ে—তার পশ্চাতে রয়েছে তোমার অনাবরণ নগ্ন দেহ, সেটিই তোমার আসল স্বাভাবিক চেহারা। সেখানে তোমার সম্পূর্ণ অন্য চরিত্র—সম্পূর্ণ বিভিন্ন তোমার বাহ্য সজ্জিত ব্যক্তিটি থেকে কিন্তু আরও কিছু আছে, অত্যন্ত পৃথক ধরনের কিছু তোমার এই স্বাভাবিক দেহেরও পশ্চাতে। অবশ্য এ দেহের মধ্যে পড়ে—দেহ তার প্রতিভূ—তোমার বর্তমান প্রকৃতির সবটাই: তোমার দেহ, তোমার প্রাণ এবং তোমার মন মিলে একটা জটিল সত্তা—তোমার সাধারণ স্বাভাবিক ব্যক্তিসত্তার কেন্দ্র এক। কিন্তু এ দুটি তোমার বাহ্য পোশাক, তোমায় ঘিরে হাল্কাভাবে আলগা হয়ে ঝুলছে যেন তোমার থেকে ভিন্ন তারা, যেমন থাকে তোমার দেহ ঘিরে তোমার জামাটি। এই সত্তাটিই তোমার সত্য সত্তা যার কথা এতক্ষণ তোমাদের বলছিলাম—তোমার ঘনিষ্ঠ ভাই ও বন্ধু, বস্তুত তোমার আপন প্রকৃত সত্তা, মায়ের সান্নিধ্য ও ভালবাসার ঘনীভূত রূপ। দরকার শুধু তোমার পোশাক বা আচ্ছাদন খুলে ফেলা।*

* ১৩-১০-৭৭ তারিখে স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে প্রদত্ত ভাষণ।

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

৪র্থ পর্ব—জন্ম ও সন্ধান

৪র্থ সর্গ—সন্ধান

জগতের দ্বারা সব খুলে যায় সাবিত্রীর সম্মুখে।
প্রথমেই সমুজ্জ্বল অভিনব দৃশ্যাবলী অপরূপ তাদের রূপ নিয়ে
ভরে দেয় মন তার, ধরে রাখে চোখের দৃষ্টি।
এগিয়ে চলে যায় সে যত পায় হয়ে পৃথিবীর বিচিত্র রূপ
গভীরতর চেতনা এক উৎসারিত হয় অন্তরে তার
অধিবাসী সে প্রকৃতির বহুবিধ লীলাবনে,
প্রতিটি ভূখণ্ড, প্রতিটি দেশ হয়েছে তার আপনার গৃহ ;
সকল গোষ্ঠী সকল জনসঙ্ঘ হয়েছে তার স্বজন,
মানবজাতির সমগ্র নিয়তি হয়ে উঠেছে আপন নিয়তি তার।
এই অজ্ঞাত প্রসার যত পথপার্শ্বে তার
পরিচিত তারা, প্রতিবেশী তারা অন্তরের ইন্দ্রিয়ে তার ;
প্রকৃতির পট সব ফিরে আসে বারবার হারান বিস্মৃত সব ক্ষেত্র যেন,
নগর নদী প্রান্তর সব দৃষ্টিতে তার ধরা দেয়
ধীরে পুনরাগত স্মৃতি যেন সম্মুখে তার,
রাত্রির আকাশে তারকারাজি অতীতের সমুজ্জ্বল বন্ধুজন যেন,
বাতাস কানে কানে বলে যায় তার প্রাচীন কথা সব,
দেখা হয় অনামা সব সহচর সঙ্গে একদা ছিল যারা প্রিয় তার।
সবই অল্প ছিল পুরাতন বিস্মৃত তার আপন সত্তায়।
অস্পষ্ট ছায়ারূপে অথবা আকস্মিক ইঙ্গিতের বিদ্যুৎ-চমকে
কর্মাবলী তার স্মরণ করিয়ে দেয় বিগত অতীতের শক্তিধারা এক,
তার গতিবিধির উদ্দেশ্য অবধি নূতন কিছু নয় :
পথিক সে চলেছে পূর্বনির্দিষ্ট এক সমুচ্চ পরিণতি অভিমুখে,
স্মৃতি জাগে তার সাক্ষীরূপী অন্তরাত্মার,
পথে উঠেছে সে পুনরায় বার বার চলেছে যেখানে।
দিশারী এক চালিত করে নির্বাক ঘূর্ণায়মান চক্রাবলী
উদ্‌গ্রীব আধার আস্রবে ধেয়ে চলে বেগে
ছায়াময় মুখোশে অবগুণ্ঠিত দেববৃন্দ যত, চলে তারা অনুসরণ যেন
মানুষের জন্ম হতে তার স্থিরনির্দিষ্ট লক্ষ্য অভিমুখে,
অন্তরের বাহিরের ধর্মরক্ষক তারা,

মানুষের অন্তশ্চেতনার সঙ্কল্পবাহক তারা
সাক্ষীসব, নিয়ন্তাসব তার নিয়তির।
অস্খলিতপদে একনিষ্ঠ তারা তাদের ব্রতে,
রক্ষা করে চলে তারা মানুষী প্রকৃতির ক্রমধারা
অতীত জন্মের বয়ন অটুট সূত্রধারা বহন করে চলে তারা।
সহযাত্রী তারা মানুষের জীবনপথে তার নিয়তির সুনিয়মিত পদযাত্রায়
নিয়ে চলে তারে যে আনন্দ সে অধিগত করে আর যে বেদনা আবাহন করে
তাদের দিকে,
প্রতি যদৃচ্ছা পদক্ষেপ অবধি নিয়ন্ত্রিত করে তারা।
যা-কিছু আমরা চিন্তা করি, কর্ম করি নিরর্থক নয় ব্যর্থ নয়
প্রতি পদে খুলে যায় শক্তির গ্রন্থি এক, চলে যায় আপন ধারায়।
ছায়াসব রক্ষী যত এই আমাদের মৃত্যুহীন অতীতের
তারাই গড়ে দিয়েছে আমাদের ভাগ্যকে আমাদের আপন কর্মের সন্তানরূপে;
আমাদের সঙ্কল্পে কর্ষিত হয়েছে যে ভূমি
সেখান থেকে আহরণ করি আমাদের বিস্তৃত কর্মজাত ফসল।
কিন্তু অদৃশ্য এই তন্তু এনে যে দিয়েছে ফল
আর অজ্ঞাত অতীত হতে জন্মেছে বর্তমান, আমাদের জীবন সেখানে
তাই মনে হয় সবই হল এক যন্ত্রশক্তির অংগসব,
যন্ত্ররূপ মনের সঙ্গে বদ্ধ তারা পার্থিব নিয়মের বশে
তবু তারা যন্ত্রসব পরম ইচ্ছাশক্তির,
উর্ধ্বে সর্বদর্শী নিশ্চল চক্ষু এক দেখে চলে তাদের।
নিয়তির, যদৃচ্ছার ভবিষ্যদর্শী কারিগর এক
গড়ে তোলে আমাদের জীবন পূর্বদৃষ্ট পরিকল্পনা ধরে
জানে সে প্রতিটি পদক্ষেপের অর্থ এবং পরিণাম,
গোচর তার কাছে অধস্তন শক্তিদের পদস্খলন।
উর্ধ্বে আপন স্তব্ধতায় সাবিত্রীর জ্ঞানে জাগে
প্রশান্ত সত্তা এক আসীন তার ভ্রূযুগলের উর্ধ্বে
দেখে সে লক্ষ্য, নির্বাচন করে ভাগ্যের প্রতিটি মোড়;
দেহ তার হল সিংহাসন,
নয়নযুগল বিচরণ করে সন্ধানকারী আলোকশিখা যেন,
যে দুটি হাত রাশ ধরে আছে তা হল এই সত্তারই জীবন্ত যন্ত্র:
সবকিছু হল সনাতন এক পরিকল্পনার কর্মধারা,
অভ্রান্ত দিশারীর তৈরী পথ।
প্রশস্ত দ্বিপ্রহর আর সমুজ্জ্বল অপরাহ্ণের আশ্রয়ে
সাক্ষাৎ তার প্রকৃতির আর মানুষী রূপের সঙ্গে,
শ্রবণে আসে তার জগতের কণ্ঠধ্বনি;

আপন অন্তরের নিয়ন্ত্রণে সে চলে আপন সুদীর্ঘ পথ বেয়ে,
স্তব্ধ সে তার জ্যোতির্ময় হৃদ্-গুহাতলে,
উজ্জ্বল দিনের কোলে দেখা যায় দীপ্ত মেঘখণ্ড যেন।
প্রথমে পথ তার চলে দূরে জনাকীর্ণ অঞ্চল দিয়ে
রাষ্ট্রীয় নয়নের সিংহদৃষ্টি তলে এসেছে সে এখন
মানুষের সরব কর্মকাণ্ডের অঙ্গনে,
অলঙ্কৃত চক্রপরে সুশোভন রথ তার
চলে যায় পার হয়ে ধ্বনিমুখর বিপণি আর প্রহরী নিনাদ,
পার হয়ে মূর্তি-খচিত তোরণ আর সমুচ্চ প্রাসাদসম্মুখ কৃপাণিত স্বপ্ন যেন,
আর আকাশের নীলিমায় ঝুলে আছে বাগিচা যত,
স্তম্ভ-ভূয়িষ্ঠ সভাকক্ষ সশস্ত্র প্রহরীসঙ্কুল,
ক্ষুদ্রকায় পুজাস্থান, প্রশান্ত বিগ্রহ এক সেখানে চেয়ে দেখে মানুষের জীবনধারা
আর বিপুল মন্দির যত নির্বাসিত দেবতারা যেন পাহাড় কেটে গড়েছে
তাদের হারিয়ে যাওয়া আনন্দের অনুকরণে।
প্রায়শ: সোনালী সন্ধ্যা হতে রূপালী প্রত্যূষ অবধি
রত্নদীপের কম্পিত শিখা সেখানে জ্বলে কম্পিত দেওয়ালের পরে
অথবা যেখানে পাথরের ডালি অনিমেষ চেয়ে রয় জ্যোৎস্নাস্নাত শাখারাজি পরে,
মন্থরগমনা উৎকর্ণা রাত্রি জাগে তার অর্ধজ্ঞানে
চলে সে পার হয়ে অস্ফুট ছায়াঘেরা নিদ্রার তটে তটে
শান্তির কোলে ঘুমন্ত রাজপ্রাসাদের মাঝে মাঝে।
কুটিরসব গ্রামসব চেয়ে দেখে চলেছে রথ এক মূর্ত নিয়তি যেন,
গৃহসব জীবনধারার আশ্রয়, আলিঙ্গন করে রয় যে ভূমি কর্ষণ করে
স্বল্পায়ু তার কতিপয় দিনের নিত্য প্রয়োজন তরে,
ক্ষণস্থায়ী তারা চলে যায় পুন:পুন: পুরাতন ধারায়
একই আকাশের অপরিবর্তিত চক্রপথে
নিত্যরূপ নিয়ে আমাদের মর্ত্য শ্রমরাজির উপর দিয়ে।
চিন্তাশিন্ন এই জীবের ভারাক্রান্ত কালক্রমের পারান্তরে
ফিরেছে সাবিত্রী এখন বাধামুক্ত শোকমুক্ত প্রসারের দিকে
পৌঁছে নাই যেখানে এখনও মানুষী সুখদু:খের চাঞ্চল্য।
এইতো এখানে আদিম পৃথিবীর শৈশবকাল,
এখানে কালজয়ী ভাবনা যত উদার প্রসন্ন প্রশান্ত,
মানুষের দুশ্চিন্তা তারে পূর্ণ করে নাই এসে,
রাজরাজের ভূপ্রসার যত শাশ্বত যেখানে বীজ ছড়িয়ে দেয়
আর বাতাসে দুলে চলে তৃণাচ্ছন্ন ক্ষেত যত, চঞ্চল পলক তাদের সূর্যের আলোকে :
অথবা বনস্থলীর সবুজ ধ্যানমগ্নতার মাঝে কিংবা রুক্ষ পাহাড়ের সানুপরে,
অথবা কুঞ্জবন মাঝে যত অলিকুল গুঞ্জনরত যেথা নিরন্তর

অথবা রূপালী জলধারার দীর্ঘায়িত কণ্ঠ চলে যায় ক্রমে দূরে সরে
যেন ক্ষিপ্রগতি আশা এক তার স্বপ্নাবলীর আশ্রয়ে পথ বেয়ে চলে যায়
বেয়ে চলে রথারূঢ় হিরণ্ময়ী বধূ।
ভূমণ্ডলের বিপুল মানববর্জিত অতীত হতে
উঠে আসে স্মৃতিখণ্ড আর কালহীন ভগ্নাবশেষ যত,
আলোকের রাজ্য সব সনাতন প্রশান্তির সাম্রাজ্য-অন্তর্গত
কান পাতি শোনে তারা অপরিচিত অশ্বখুরধ্বনি,
বিশাল অক্ষত জটিল নৈঃশব্দ্যসব
ডুবিয়ে রাখে তারে গোপন শ্যামলিমা মাঝে,
নম্বর স্তব্ধ সূক্ষ্ম কুসুমাভ জাল সব
ঘিরে রাখে তাদের বিচিত্রবর্ণ মায়াপাশে রথচক্র তার।
কালের সবল সুদৃঢ় পদভার চলে সন্তর্পণে
নিরালা এইসব পথ বেয়ে, আসুর গতিবেগ
ভুলেছে সে, ভুলেছে তার নির্মম প্রলয়ঙ্কর পরিক্রমা।
আন্তর শ্রুতি শোনে নিঃসঙ্গতার ধ্বনি,
আনত হয়ে আত্মমগ্ন অবাধ শ্রবণে পশে তার
বাক্যহীন তীব্রতর চিন্তাধারার ছন্দ
জন্মে যে ওঠে নীরবতার মাঝে প্রাণস্পন্দের পশ্চাতে,
আর পৃথিবীর ক্ষীণ মধুর অস্ফুট কণ্ঠ
তার সূর্যচুম্বিত সমাহিতির বিরাট আবেগে
উঠে চলে তার প্রচ্ছন্ন আকুলতা নিয়ে।
উচ্চকণ্ঠ প্রয়োজনের স্থূল কোলাহল হতে সুদূরে
সর্বজিজ্ঞাসু প্রশমিত মন অনুভব করে,
স্থির মুক্ত যখন তার অন্ধ বহির্মুখী সঙ্কল্প হতে,
তার নির্বাক সর্বংসহ ভালবাসার অশ্রান্ত আলিঙ্গন,
দেখে অন্তরাত্মা রয়েছে সেখানে জননী আমাদের যত রূপাবলীর।
এই যে অন্তঃপুরুষ চলে স্খলিতপদে ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রমাঝে,
এই যে মর্ত্যজীব দিবসাবলীর পেষণীতে ক্ষতবিক্ষত
তার অন্তরাত্মে আবিষ্কার করে মুক্তির উদার প্রসার।
সমস্ত জগৎখানি অধিকৃত হয়নি এখনও দুঃখে কষ্টে শুধু।
মায়ের বুকখানি এখনও রেখেছে আমাদের তরে
তার তপস্বী ভূখণ্ডসব, তার ধ্যানমগ্ন গহ্বরসব,
অপৌরুষের প্রান্তরসব নির্জন অনুপ্রেরণাসঞ্চল
আর তার মহিমাময় যত উল্লাসোচ্ছল নীলাস্থল।
বাগ্‌দেবী আসীন জিহ্বাগ্রে তার, পোষণ করে সে তার প্রতীক রহস্যাবলী
সযত্নে রক্ষা করে চলে তার স্বচ্ছ চক্ষুষ্মান অনুষ্ঠান তরে

পুলকপূর্ণ বক্ষপুটে তার নিবিড় অবকাশ
পর্বতবেদী তুলে ধরেছে উষার অগ্নিযজ্ঞ তরে,
আর সৈকতপ্রসার বাসকশয্যা তরে সাগর শয়ান যেখানে,
তার স্তোতৃ বনভূমির কণ্ঠে মন্ত্রিত বিপুল মন্ত্র।
আপন নিঃসঙ্গ পুলক তরে রয়েছে তার আপনার শ্যামল প্রান্তর,
শুদ্ধ তৃপ্ত ভূভাগ আলোকের আলিঙ্গনে ;
সঙ্গীমাত্র তার বিহগের কণ্ঠ আর কুসুমের বর্ণমেলা,
আশ্চর্যবৎ বিজন কান্তার যত জ্যোৎস্নায় প্লাবিত তারই আপন চন্দ্রমালায়,
ধ্যানী ধূসর সন্ধ্যা যত প্রজ্বলিত তারার আলোকমালায়
আর ছায়াচ্ছন্ন গতি রাত্রির আনন্ত্যের মাঝে।
মহিমাময়ী, সকল আনন্দ তার আপন সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিপথে রয়ে,
অনুভব করে তাঁর কাছে রয়েছে সে এই পৃথিবীর বক্ষতলে,
এখনও আলাপন তার অন্তরালগত আলোকের সঙ্গে,
এখনও আদান-প্রদান করে পারান্তরের শাশ্বতের সঙ্গে।
আহ্বান করেছে সে কতিপয় মাত্র উপযুক্ত পৃথিবাসীকে
ভাগী হতে তার শান্তির সুখকর সাহচর্যে
প্রসার, তুঙ্গস্থান হল তাদের আপন আলয়।
বীর রাজর্ষিরা তাদের ব্রতসমাপ্তি পরে,
তাদের কর্মভারের সংগ্রামী প্রযত্ন হতে মুক্ত হয়ে,
এসেছে তারা এই বনস্থলীর প্রশান্ত সম্মেলনে ;
দ্বন্দ্বের শেষ, শান্তি রয়েছে সম্মুখে।
সুখময় জীবন তাদের পশু আর পাখী আর পুষ্পাবলীর সঙ্গে,
সূর্যালোকে আর পত্রাবলীর মর্মর আরাব সঙ্গে ;
শোনে তারা বন্ধনহীন বাতাস বিচরণ করে রজনীর কোলে,
নিত্যকার শুভ্র শ্রেণীবদ্ধ তারকামণ্ডলীর সঙ্গে ধ্যানগত সংযোগভাদের,
প্রত্যূষে তাদের আবাস যেন সুনীল শিবিরতলে,
মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল্যের সঙ্গে এক তারা।
কেহ-বা ডুবে যায় গভীরতরে ; জীবনধারার বাহ্য আলিঙ্গন হতে
নিয়ে যায় তাদের হাতছানি দিয়ে অগ্নিসমিদ্ধ গোপন অন্তরালে
অন্তরাত্মার অক্ষত তারকাশুভ্র গর্ভগৃহে,
বাস করে তারা চিরজীবন্ত মহা-আনন্দের সঙ্গে ;
গভীর কণ্ঠ এক সেই রভসে সেই শুদ্ধতায়
শোনে তারা, দেখে বিশ্ব-বিভাস জ্যোতি এক।
কালকৃত পার্থক্য যত জয় করেছে তারা ;
সমস্ত জগৎ তাদের নিজেদের যত হৃদয়তন্ত্রী দিয়ে গ্রথিত হয়েছে ;
প্রতি বক্ষতলে স্পন্দিত যে হৃদয় তারই ঘনিষ্ঠ সামীপ্যে এসেছে তারা,

পৌঁছে গিয়েছে তাই বিশ্বের সেই এক অন্তঃপুরুষে অসীম প্রেমের কল্যাণে।
এক সুরে বাঁধা তারা নীরবতা আর বিশ্ব-হৃদ্দের সঙ্গে,
শিথিল হয়ে গিয়েছে তাদের মানস অবরোধের গ্রন্থি ;
অধিকার করেছে তারা উদার অচঞ্চল সাক্ষীদৃষ্টি,
উন্মুক্ত এখন প্রকৃতির বিশাল তৃতীয় নয়ন ;
উচ্চতম শিখর অবধি এখন তাদের দৈনন্দিন ঊর্ধ্বায়ন :
সত্য স্বয়ং আনত তাদের অভিমুখে তার তুরীয়রাজ্য হতে ;
ঊর্ধ্বে তাদের প্রজ্বলিত শাশ্বতের লোকাতীত সূর্য যত।
নামহীন গৃহহীন কঠোর তপস্বী যত
প্রত্যাখ্যান করেছে তারা বাক্ আর ক্রিয়া আর কামনা,
দূরে তারা জীবকুল হতে আসীন ধ্যানমগ্ন, সঙ্গীহীন,
অপাপবিদ্ধ স্থিরপ্রতিষ্ঠ অন্তঃপুরুষের শিখরে
সমাহিতির জ্যোতির্ময় কণ্ঠহীন তুঙ্গস্থানে,
বিশ্ববিবর্জিত সন্ন্যাসীদল জটাভুটমণ্ডিত
নিশ্চল আসীন বৈরাগ্যপ্রতিম বিশাল পর্বতমালা
তাদের চারিদিক ঘিরে দল বেঁধে রয়েছে বিশাল এক ভাবাবিষ্ট চিন্তারাজি যেন
অনন্তের আজ্ঞার অপেক্ষায়, সর্ব সমাপ্তি যেখানে।
চক্ষুষ্মানেরা বিশ্ব-ইচ্ছার সুরে সুর মিলিয়ে
এই পার্থিব রূপাবলীর পশ্চাতে হাস্যময় যিনি তাঁকে নিয়ে পূর্ণ পরিতৃপ্ত তারা,
নিত্য স্থান পেয়েছে শোকাতীত দৈনন্দিন দাবির অতীত।
তাঁদের চারিদিকে সবুজ তরুসব যেন ঘিরে রয়েছে গিরি এক
তরুণ গম্ভীর শিক্ষার্থীরা গঠিত হয়েছে তাঁদের স্পর্শে,
সহজ সরল কর্ম তাদের, বাক্যও সচেতন,
অন্তরে ক্রমবর্ধমান উঠে চলেছে তাদের চূড়ার অভিমুখে।
অনন্তের পথে সুদূর পথচারী জিজ্ঞাসু
নিয়ে এসেছে এই প্রশান্ত উৎসস্থানে তাদের অন্তশ্চেতনার অতীপ্সা,
নীরব মহাসম্পদময় প্রহরকাল কাটিয়েছে এখানে
শুদ্ধিস্নাত হয়েছে সেই মৃদুল দৃষ্টিতলে
অনায়াসে যে শাসন করেছে তাদের আপন শান্তি ছড়ায়ে,
প্রভাবের বশে তুলে ধরেছে প্রশান্তির পথ সব।
বিশ্বরাজের রাজকুমাররা,
আগামীকালের বীর নেতৃবৃন্দ,
রাজোপম সন্তানবৃন্দ পুষ্ট বর্ধিত তারা সে মুক্ত বাতাসে
সিংহশাবক যেন ক্রীড়ারত আকাশে আর সূর্যালোকে,
প্রায় অজ্ঞাতসারেই তারা লাভ করেছে তাদের দেবোপম অভিজ্ঞান :
গঠিত তারা সেইসব সমুচ্চ চিন্তার ধারায় যা মুখরিত তাদের কণ্ঠে

অর্জন করেছে তারা সেইসব চিত্তবৃত্তির উদার মাহাত্ম্য
যার কল্যাণে হয়ে উঠি আমরা বিশ্বগত প্রবেগের সহচর,
শৃঙ্খলিত নহে আর তাদের ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির মধ্যে,
সুনম্য অথচ সুদৃঢ় তারা শাশ্বতের মুঠিতলে.
প্রকৃতিকে ধরেছে দুঃসাহসে বন্ধুভাবে দৃঢ় আলিঙ্গনে,
তার আশ্রয়ে সেবা করে তারা সেই মহাশক্তির প্রকৃতির আপন কর্মাবলীর
রূপ দিয়ে চলে যে।

একান্ত সকলে সংকীর্ণ বন্ধন হতে মুক্ত,
উদার বিস্তৃত যেন সূর্যালোকে স্নাত মহাদেশ এক
সর্বব্যাপী সমতার নিরপেক্ষ আনন্দে মগ্ন.
এই সব সিদ্ধেরা জীবন যাপন করে সর্বভূতে ভাগবত আনন্দের অনুভূতি নিয়ে।
সাহায্য করে চলে তারা দেবতাদের মন্থর শুভাগমনে,
রূপ মানসে বপন করে অমর ভাবনা যত মূর্ত তাদের আপন জীবনে,
শিক্ষা দেয় সেই মহাসত্য মানবজাতিকে উঠে দাঁড়াতে হবে যেখানে একদিন
অথবা কতিপয় তরে খুলে ধরে মুক্তির তোরণ,
বিতরণ করে আমাদের এই প্রবহিষ্ণু জগতে সেই জ্যোতি
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ছড়ায় যা অশরীরী চেতনা যেন মুক্ত মহাকালের তাপস যুগভার হতে,
সহচর বাহন তারা বিশ্বমহাশক্তির,
প্রয়োগ করে তারা সূর্যের মত আপনার সহজাত ঐশ্বর্য ,
বাক তাদের, নির্বাক তাদের পৃথিবীর সহায়।
স্পর্শে তাদের যাদুকর সুখপ্রবাহ বয়ে যায় ;
পূর্ণ সর্বব্যাপী একত্ব রাজে সেই বনভূমির শান্তিমাঝে,
হিংস্র পশু তার শিকারের সঙ্গে মিলিত হয়েছে মৈত্রীবন্ধনে,
হিংসা আর দ্বন্দ্ব স্বীকৃত হয়েছে ঘটাতে আপনাদের অবসান
সেই প্রেমের অনুনয়ে প্রবাহিত যে একই মাতৃহৃদয় হতে
তাদের হৃদয় দিয়ে নিরাময় করেছে কঠিন ক্ষতবিক্ষত জগৎকে।
আরও অনেকে সরে গিয়ে চিন্তারাজ্যের সীমানা পার হয়ে
সেই যেখানে শুদ্ধ মনোময় পুরুষ সুপ্ত রয় মহাজ্যোতির জন্য অপেক্ষায়,
ফিরে আসে আবার স্পন্দিত অনামা শক্তির বশে
বিদ্যুন্ময় মধুপানে মত্ত যেন প্রতিকোষে তাদের ;
অন্তর্জ্ঞান সবেগে চলে এসেছে ফুটে উঠেছে তাদের বাক্যে,
শুনেছে তারা সূক্ষ্ম সে-কণ্ঠ ছেয়ে যে রয় নভস্তল,
বহন করে সে-দীপ্তি সূর্যমালাকে প্রজ্বলিত করে যে,
গায় তারা অনন্তের নাম যত আর মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তি যত
যার ছন্দে প্রতিফলিত চলমান জগৎসব,
দৃষ্টির ধ্বনিস্পন্দ সব উৎসারিত বন্ধন ভেঙে অন্তরাত্মার গভীর অতল হতে।

কেহ কেহ-বা হারিয়ে ফেলেছে আপন ব্যক্তিসত্তা আর তার নিজস্ব চিন্তার ধারা
নির্ব্যক্তিক মহাশক্তির চিরস্থির মহাসাগর মাঝে,
আসীন আপন মহত্বে, দৃষ্টিতে জ্বলে তাদের অনন্তের জ্যোতি,
অথবা হয়েছে তারা চিরন্তন ইচ্ছাশক্তির সহচর
দেখে চলে অতীতের ভবিষ্যতের কালক্রম ধারা।
কেহ-বা বিহঙ্গের মত ডানা মেলে উঠে আসে বিশ্বরূপী মহাসাগর হতে
মিলিয়ে যায় সমুজ্জ্বল নিরাকার বৃহতের কোলে :
আর কেহ-বা নির্বাক সাক্ষী শুধু নটরাজের বিশ্বনৃত্যে,
অথবা জগতের সহায় হয় বিশ্ব-বৈরাগ্য দিয়ে।
কেহ কেহ-বা সাক্ষীরূপেও দেখে না কিছু আর ; নিমজ্জিত তারা
অদ্বিতীয় আত্মার মধ্যে,
লুপ্ত সমাধির গর্ভে কোন জীবাত্মার পুনরাবর্তন নাই সেথা হতে,
সৃষ্টির নেপথ্য কর্মধারা রুদ্ধ সব চিরতরে
জন্মের ব্যক্তিরূপের শৃঙ্খল সব বিসর্জিত হয়েছে
কেহ কেহ তাই নিঃসঙ্গ পৌঁছেছে গিয়ে অনির্বচনীয়ের মাঝে।

সূর্যকিরণ যেমন ভেসে আসে ছায়াঘেরা অবকাশ পার হয়ে
সোনার কুমারী তেমনি তার চিত্রখোদিত রথ বেয়ে
ধীরে চলে এল ধ্যানের আসনশ্রেণীমাঝে।
গোধূলি-আলোকে পশুপাল ফেরে যখন
পদোৎক্ষিপ্ত ধূলিভারে ঘনতর করে ধরে সন্ধ্যার ছায়া
মুখর দিবস যখন নেমে গিয়েছে দিক্‌বলয়ের পারে,
এসে পৌঁছেছে সে প্রশান্ত পুণ্যকুঞ্জে কোন
বিরাম লভে সে আপনার চারিদিকে আবরণের মত টেনে নিয়ে
তার ধ্যাননগ্ন ধীর চেতনা ও সনির্বন্ধ প্রার্থনা।
অথবা কোন সিংহোপম নদীর উদ্বেলিত পাটল কেশরসম্ভার সমীপে
প্রার্থনারত তটপরে তরুরাজির পূজা-আবাহন
বাতাসে ধরে রেখেছে যেন মন্ত্রিমাধুরী অচঞ্চল প্রশান্তি
ইঙ্গিতে জানায় সাবিত্রীর ধাবমান রথচক্রে, স্থগিত করে যেন তাদের গতি।
ভাবগম্ভীর অবকাশে
কোন মনে যেন স্মৃতি জেগেছে পুরাতন সব নীরবতার,
যেখানে হৃদয়তলে অতীতের মহান কণ্ঠ সব ডেকে নিয়ে যায়
ঋষিকুল যেখানে তাদের সমাহিতির বিপুল স্বাধীনতা ছড়িয়ে দিয়েছে
এঁকে গিয়েছে পটপরে যেন তাদের অন্তরাত্মার কালব্যাপী লীলাচিত্র,
জেগে রয় স্বচ্ছ প্রত্যূষে এই জ্যোৎস্না-প্লাবিত আঁধারে
উন্মুখী এখনো বহ্নিকন্যা প্রশান্তির নিস্তব্ধ পরশ তরে

পান করে নিশ্চলক আঁখি ভরে শুদ্ধ মহাজ্যোতিধারা
অনুভব করে শাশ্বত স্থিরতার সঙ্গে আপন সাদৃশ্য।
অরুণোদয় প্রবেশে অকস্মাৎ স্মরণ করিয়ে দেয় তারে তার সন্ধানের কথা,
নিম্নে আস্তৃত তৃণশয্যা হতে ওঠে সে
শুরু করে পুনরায় তার অসমাপ্ত পথযাত্রা
অনুসরণ করে চলে তার ভাগ্যনিয়ন্ত্রী কক্ষ।
বাসনা এক যেন নির্বাক দেবতাদের প্রশ্ন করে চলে,
চলে যায় তারকার মত উজ্জ্বল এক পারাস্তরের অভিমুখে।
উপনীত সে এখন বিশাল নির্জন প্রান্তরের মাঝে,
মানুষ সেখানে পথিক শুধু চলেছে মানুষী আশ্রয়ের অভিমুখে
অথবা একাকী সে প্রকৃতির বিপুল প্রসারে, প্রয়াস তার জীবনরক্ষণে ;
সহায় তরে আহ্বান জানায় যত অদৃশ্য জীবরূপী শক্তিদের,
অভিভূত তার আপন মহাবিশ্বের বিপুলতায়
জানে না সে এখনও তার আপন আনন্ত্য।
পৃথিবী বহুগুণিত করে দেখায় তারে আপন নিত্যপরিবর্তিত মুখমণ্ডল,
আহ্বান করে তারে এক সুদূরের নামহারা কণ্ঠে।
গিরিমালা তাদের তপস্যানগ্ন মৌনতা মাঝে,
অরণ্যানীসব অগণিত সঙ্গীতসম্ভার সাথে
খুলে দেখায় তারে অবগুণ্ঠিত দেবতাদের দুয়ার সব।
স্বপ্নালু প্রান্তরপরে, অলস উদার প্রসার এক,
মরণশয্যা যেন মোহমুগ্ধ বিবর্ণ সন্ধ্যার
অস্তগত আকাশের আলোকছটাতলে,
নিশ্চল শায়িত সে যেন এক যুগের প্রান্তভাগে,
অথবা পার হয়ে যায় পুঞ্জীভূত পর্বতরাজির উৎকণ্ঠ গোষ্ঠী এক
তুলে ধরে শির তাদের, গুহাশ্রয়সব আকাশে শিকার তরে ;
অথবা পথ বেয়ে চলে সে অজানা শূন্য রাজ্যে
যেখানে নির্জন পর্বতশিখর সব শিবির ফেলেছে এক কিম্ভূত স্বর্গতলে,
নির্বাক প্রহরী যেন দাঁড়িয়ে ভাসমান চন্দ্রমাতলে ;
অথবা ভ্রমে সে পথহারা জনহীন বিরাট বনভূমি মাঝে
নিরন্তর মুখরিত ঝিল্লিকারবে ;
অথবা চলে সে এক সুদীর্ঘ দীপ্তিবিচ্ছুরিত সর্পিলপথে
পার হয়ে নিশ্চল আলোকধারায় পরিস্নাত প্রান্তর আর গোষ্ঠ যত,
অথবা পৌঁছে যায় মরুপ্রান্তরের উদ্দাম সৌন্দর্যমাঝে
ভূমি যেখানে কর্ষিত হয়নি কখনও, পশুপাল বিচরণ করেনি
অথবা ঘুমিয়ে পড়েছে নিরাবরণ তৃষ্ণার্ত বালুকার পরে
উন্মাদ বন্যপশু নিশার আহ্বান মাঝে।

তবুও অসম্পূর্ণ রয়ে যায় সেই সর্বশেষ ভাগ্যসন্ধান ;
এখনও দেখা দেয় নাই সেই একমাত্র বিধিনির্ধারিত মুখমণ্ডলখানি,
খুঁজে চলে যারে সে মানুষী জীবের মাঝে।
বিরাট নিস্তব্ধতা এক ঘিরে আছে দিনের মহিমা।
মাসের পর মাস পুষ্ট করেছে সূর্যের প্রবেগ.
অনন্ত নিঃশ্বাস তার এখন মৃত্তিকারে করে জর্জরিত।
মূর্ছিত মাটির উপর দিয়ে শ্বাপদের মত বিচরণ করে তাপবাহিনী ;
লোলজিহ্বা এক সব যেন লেহন করে নিয়েছে।
বসন্তের সমীরণ স্তব্ধ ; আকাশ যেন ধাতুময় দিবাসন।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত
চতুর্থ পর্ব সমাপ্ত

ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র

(ঋগ্বেদ)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৩য় মণ্ডল—১০ম সূক্ত

১। ত্বামগ্নে মনীষিণঃ সম্রাজং চর্ষণীনাম্।
দেবং মর্তাস ইন্ধতে সমধ্বরে ॥১॥

ত্বাম্—তোমাকে	দেবম্—দেবতা (তোমাকে)
অগ্নে—হে অগ্নি	মর্তাসঃ—মর্ত্যলোকেরা
মনীষিণঃ—মনীষীরা (মনোময় মানুষেরা)	ইন্ধতে (সম+)—সমিদ্ধ করে
সম্রাজম্—সম্রাট (তোমাকে)	সম (+ইন্ধতে)—সমিদ্ধ করে
চর্ষণীনাম্—দ্রষ্টাদের	অধ্বরে—যজ্ঞকর্মে

হে অগ্নি, দৃষ্টিমানদের সম্রাট তুমি, মর্ত্য মনীষীরা যজ্ঞকর্মে দেবতারূপে তোমাকে প্রজ্বলিত করে ॥১॥

২। ত্বাং যজ্ঞেষু ঋত্বিজমগ্নে হোতারমীড়তে।
গোপা ঋতস্য দীদিহি স্বে দমে ॥২॥

ত্বাম্—তোমাকেই	গোপাঃ—রক্ষকরূপে
যজ্ঞেষু—যজ্ঞসকলে	ঋতস্য—সত্যের
ঋত্বিজম্—ঋত্বিক হিসাবে	দীদিহি—প্রজ্বলিত হয়ে ওঠ
অগ্নে—হে অগ্নি	স্বে—আপনার, স্বকীয়
হোতারম্—হোতা হিসাবে	দমে—ভবনে, গৃহে
ঈড়তে—পূজা করে	

তোমাকেই, হে অগ্নি, ঋত্বিকরূপে, হোতারূপে তারা পূজা করে সকল যজ্ঞে; সত্যের রক্ষকরূপে প্রজ্বলিত হও তুমি আপন গৃহে ॥২॥

৩। স ঘা যস্তে দদাশতি সমিধা জাতবেদসে।
সো অগ্নে ধত্তে সুবীর্যং স পুষ্যতি ॥৩॥

সঃ—সে	সঃ—সে
ঘ—নিশ্চয়ই	অগ্নে—হে অগ্নি
যঃ—যে	ধত্তে—ধারণ করে
তে—তোমাকে	সুবীর্যম্—পূর্ণ বীর্য
দদাশতি—দান করে	সঃ—সে

সমিধা—সমিধসব (ইন্ধন)
জাতবেদসে—জন্মজ্ঞানী তোমাকে
পুষ্যতি—পুষ্টি বা বৃদ্ধি লাভ করে

জন্মজ্ঞানী তোমাকে ইন্ধন যে প্রদান করে সে নিশ্চয়, হে অগ্নি, ধারণ করে পূর্ণ বীর্য, সে-ই পুষ্টি লাভ করে ॥৩॥

৪। স কেতুরধ্বরাণামগ্নির্দেবেভিরা গমৎ।
অঞ্জানঃ সপ্ত হোতৃভির্ঋতাবিয়তে ॥৪॥

সঃ—সে
কেতুঃ—অন্তর্বোধ (প্রজ্ঞাপক—সায়ণ)
অধ্বরাণাম্—সকল যজ্ঞের
অগ্নিঃ—অগ্নি
দেবেভিঃ—দেবতাদের সহ
আ+গমৎ—এসে যেন উপস্থিত হয়
অঞ্জানঃ—অভিষিক্ত হয়ে পরিমার্জনা করেছেন
সপ্ত—সপ্ত
হোতৃভিঃ—হোতাদের দ্বারা
ঋতাবিয়তে—আহুতিবান বা হবি-বাহক বা আহুতি-গ্রহীতার জন্য

সকল যজ্ঞকর্মে অন্তর্বোধ সেই অগ্নি দেবতাদের সহ এসে যেন উপস্থিত হয়, হবি-বাহক তাঁকে সপ্ত হোতারা পরিমার্জনা করেছেন ॥৪॥

৫। প্র হোত্রে পূর্বং বচোঽগ্নয়ে ভরতা বৃহৎ।
বিপাং জ্যোতীংষি বিভ্রতে ন বেধসে ॥৫॥

প্র (+ভরত)—সম্মুখে নিয়ে এস
হোত্রে—হোতার জন্য
পূর্বম্—সনাতন, পুরাতন, পরম
বচঃ—বাক্য
অগ্নয়ে—অগ্নির জন্য
ভরত (প্র+) —সম্মুখে নিয়ে এস
বৃহৎ—বৃহৎকে
বিপাম্—বিপ্রদের, জ্ঞানবৃদ্ধদের, জ্ঞানোদ্ভাসদের
জ্যোতীংষি—জ্যোতিরাজি
বিভ্রতে—ধারণকারীর জন্য
ন—আর যেমন
বেধসে—বিধাতা বা সৃষ্টিকর্তার জন্য

অগ্নির জন্য, সেই হোতার জন্য সম্মুখে এনে স্থাপন কর বৃহতের সেই সনাতন বাক্, জ্ঞানোদ্ভাস জ্যোতিসব ধারণ করে এসেছে যে, সেই আমার জন্য আর তেমনি সৃষ্টি-কর্তার জন্য ॥৫॥

৬। অগ্নিং বর্ধন্ত নো গিরো যতো জায়ত উক্থ্যঃ।
মহে বাজায় দ্রবিণায় দর্শতঃ ॥৬॥

অগ্নিম্—অগ্নিকে
বর্ধন্ত—বর্ধন করে যেন
নঃ—আমাদের
মহে—মহান, বিপুল
বাজায়—পূর্ণতার জন্য
দ্রবিণায়—সম্পদের জন্য

গিরঃ—বাক্ সকল
যতঃ—যখন
জায়তে—জন্মগ্রহণ করেছে
উক্থ্যঃ—বাক্যের বাহক
দর্শতঃ—যিনি দৃষ্টিগোচর

অগ্নিকে আমাদের বাক্‌রাজি যেন বর্ধিত করে যখন উক্তিকে বহন করে তিনি জন্ম-গ্রহণ করেন, যখন তিনি দৃষ্টিগোচর হন বিপুল পরিপূর্ণতার জন্য, সম্পদের জন্য ॥৬॥

৭। অগ্নে যজিষ্ঠো অধ্বরে দেবাঁদেবয়তে যজ।
হোতা মন্দ্রো বি রাজস্যতি স্রিধঃ ॥৭॥

অগ্নে—হে অগ্নি
যজিষ্ঠঃ—পরম যজ্ঞসমর্থক
অধ্বরে—যজ্ঞযাত্রায়
দেবান্—দেবতাসকলকে
দেব-যতে—দেবত্বকামীর জন্য, দেবত্বানুখীর জন্য
যজ—পূজা কর
হোতা—আহ্বানকারী
মন্দ্রঃ—আনন্দময়
বি-রাজসি—চারিদিকে উদ্ভাসিত তুমি
অতি—অতিক্রম করেছ
স্রিধঃ—ভ্রান্তির শক্তিসকলকে

হে অগ্নি, যজ্ঞযাত্রায় তুমি বলিষ্ঠ যজ্ঞসাধনে, দেবত্ব অভিমুখী যে তার জন্য দেবতাদের পূজা দাও, আনন্দময় হোতা তুমি, সকল ভ্রান্তির শক্তি অতিক্রম করে উদ্ভাসিত তুমি ॥৭॥

৮। স নঃ পাবক দীদিহি দ্যুমদস্মে সুবীর্যম্।
ভবা স্তোতৃভ্যো অন্তরঃ স্বস্তয়ে ॥৮॥

সঃ—সেই
নঃ—আমাদের
পাবক—হে শুদ্ধিকর্তা
দীদিহি—প্রজ্বলিত কর
দ্যুমৎ—দীপ্তিময়
অস্মে—আমাদের মধ্যে
সুবীর্যম্—পরমবীর্য
ভব—হও তুমি
স্তোতৃভ্যঃ—তোমার স্তোতাদের জন্য
অন্তরঃ—অন্তরতম
স্বস্তয়ে—অস্তির জন্য, কল্যাণের জন্য

হে শুদ্ধিদাতা বহ্নি, আমাদের অন্তরে প্রজ্বলিত কর দীপ্তিময় পরম বীর্যকে, তোমার স্তোতাদের অন্তরতম হয়ে ওঠ তুমি তাদের পরম কল্যাণের জন্য ॥৮॥

৯। তং ত্বা বিপ্রা বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে।
হব্যবাহমমর্ত্যং সহোবৃধম্ ॥৯॥

তম্—সেই
ত্বা—তোমাকে
হব্যবাহম্—আহুতির বাহককে
অমর্ত্যম্—অমর্ত্যকে

বিপ্রা:—জ্ঞানময় দ্রষ্টারা
বিপন্যব:—মেধাবীরা
জাগৃবাংস:—নিত্যজাগ্রত
সম্-ইন্ধতে—প্রজ্বলিত করে
সহ:-বৃধম্—শক্তির বর্ধককে

তুমি হলে সেই যাকে জ্ঞানময় দ্রষ্টারা, যারা মেধাবী, যারা সদাজাগ্রত তারা সম্যক সমিদ্ধ করে, প্রজ্বলিত করে, অমর ঋতিবাহক তুমি, আমাদের সামর্থ্য বৃদ্ধি কর তুমি ॥৯॥

রচনাগুচ্ছ*

(কয়েকটি অপ্রকাশিত ক্ষুদ্র রচনা)

শ্রীমা

যে পরিমাণে শারীর সত্তার ক্রিয়াকলাপ অহংকেন্দ্রিক থাকে, চেতনাকে তা থেকে পৃথক করে রাখা এবং তাকে ভৃত্য হিসেবে দেখা—যাকে নির্দেশ দিতে হবে, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলতে হবে এবং অনুগত করে তুলতে হবে—সঙ্গত ও আবশ্যক। যে পরিমাণে পার্থিব সত্তা ভাগবত শক্তিরাজিকে গ্রহণ করবার উপযুক্ত হয়ে ওঠে এবং তাদের প্রকাশ করে ধরে তার আলোকদীপ্ত ক্রিয়াকলাপে, সেই পরিমাণে আবার তার সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায় এবং যন্ত্র ও যন্ত্রীর মধ্যে আর ভেদ করবার দরকার হয় না। তবে যেহেতু, সংরক্ষণের প্রয়োজনবশেই এই দুই ক্রিয়াধারার সহাবস্থান অবশ্যম্ভাবী, দুটি দৃষ্টিভঙ্গিকেই অনুভবের দুটি ধরনকেই করতে হবে সহাবস্থান।

জুলাই ২৪, ১৯১৪

সত্যকার প্রাণিক নৈর্ব্যক্তিকতা বলতে ভাগবত ইচ্ছার কাছে এক অখণ্ড চরম আনুগত্যই বোঝায় না। সে-আনুগত্য শুধু প্রস্তুতিমাত্র। পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকতা—প্রাণে যেমন সত্তার অন্যান্য লোকেও তেমনি—রয়েছে বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে একাত্মতায়, কিংবা বরং বলা যায় দিব্যানন্দের সঙ্গে একাত্মতায় যে দিব্যানন্দ রয়েছে বিশ্বজনীন সকল ক্রিয়াধারার মধ্যে যেমন তেমনি সকল সংবেদনের গভীরে। তার ফল হয় এই যে সংবেদনগত আনন্দ অনুভব করার পরিবর্তে, যারা তা আস্বাদন করে তাদের সবার মধ্যে তুমি হয়ে ওঠ সেই সংবেদনই। ব্যষ্টিপ্রাণ বলে তখন আর কিছু থাকে না, থাকে শুধু যুগপৎ নৈর্ব্যক্তিক ও সচেতন এক শক্তি যা যেসব অঙ্গ তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে তাদের সকলের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে ধরে।

যেমন ধর, রয়েছে সূক্ষ্ম এক আনন্দ, মধুর ও গভীর, সংবেদনের মাধ্যমে যা অনুভব করা যায় যখন তুমি হেঁটে বেড়াও নিঃসঙ্গ, বা এমন একজনের সাথে যার সঙ্গে তোমার পুরোপুরি মিল, প্রায় বা পুরোপুরি অজানা সব প্রান্তর ধরে, অর্থাৎ আজও পর্যন্ত মানুষী আবহাওয়া কলুষিত করেনি যে অঞ্চলের পরিবেশ, যেখানে প্রকৃতি শান্ত, বিপুল, আম্পৃহার মত বিশুদ্ধ, প্রার্থনার মত পবিত্র পাহাড়ের উপরে বনের মধ্যে, নির্জন ঝরনাধারার পাশে পাশে যেখানে পথ সব গেছে হারিয়ে ; কিংবা সুবিশাল মহাসাগরের সৈকতপথে যখন তুমি হেঁটে বেড়াও। সেই আনন্দ অনুভব করতে গেলে, যতক্ষণ প্রাণ রয়েছে ব্যষ্টিগত, ততক্ষণ কিছু বাহ্য অবস্থা-বিশেষ মেনে চলতেই হয়। পরন্তু, যখন প্রাণ সত্যসত্যই নির্ব্যক্তিক হয়েছে, হয়েছে বিশ্বভূত, তখন যারাই সে আনন্দ অনুভব করে তাদের সবার মধ্যেই সে হয়ে ওঠে সেই মোহনানন্দ, আর তা আস্বাদনের জন্য স্থূলভাবে বিশেষ কোন অবস্থায় নিজেকে নিয়ে যাবার দরকার পড়ে না।

---

* শিরোনামা সম্পাদকীয়

প্রাণিক স্তরে, তখন তুমি সকল পরিস্থিতি থেকে পুরোপুরি মুক্ত। তুমি লাভ করেছ মোক্ষ।

জুলাই ১০, ১৯১৪

আমি শুনলাম উর্মিমালার কণ্ঠ, তা আমায় বলল কত না অপরূপের কথা। তা আমায় বলল জীবনধারণের আনন্দের কথা, বলল গতিছন্দের রভসের কথা। হে সমুদ্র, অন্তহীন নিত্যনব সঙ্গীতে তুমি আমায় বললে প্রেমের সেই শক্তির কথা যা সব জিনিসকে সত্তাময় করে তোলে। তোমার অপরা ক্রিয়ার ভাস্বরতার উপর ধ্যাননিবিষ্ট হয়ে সেই অপ্রতিরোধ্য প্রবেগের প্রতীতি এল আমার যা বিশ্বকে বয়ে নিয়ে চলে পরম সম্ভবের অভিমুখে। যে শক্তি তোমায় উত্তাল করে, তোমায় করে তোলে ঢেউয়ের পাহাড়, তা সেই শক্তির মত নয় কি যা জগৎকে জড়ত্ব থেকে মুক্ত করে ধরে তার মধ্যে ভগবানের প্রতি আস্পৃহা জাগিয়ে তোলবার জন্য।

তারপর যতই আমি নীরবতার মধ্যে তোমার দিকে চেয়ে রইলাম ততই তুমি আরো গভীরভাবে আমার সঙ্গে বললে কথা, যে প্রেম সকল রূপের মধ্যেই নিজেকে ভালবাসে, সকল ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই যা স্বয়ংপ্রকাশ সেই শাশ্বত প্রেমের মহারহস্যের কথা বললে আমায়। আগে থেকেই আমার সত্তার বুকে ছিল এই অনির্বচনীয় আত্মসচেতন দিব্যপ্রেম, কিন্তু সেই মুহূর্তে জীবন তার পেল এক অসাধারণ প্রগাঢ়তা, কিংবা হয়তো ব্যক্তিগত প্রতীতি লাভ করেছিল এক অসাধারণ স্বচ্ছতা। হে পরমারাধ্য অধিরাজ, জগতের অধীশ্বর, তুমিই সবকিছু বলে সবকিছুর অধিকারী এবং সবের মধ্যেই চলে তোমার লীলারভস, তোমার আনন্দের সেই মুহূর্তে তুমি কি আমাদের দিকে আরো নিবিড়ভাবে তাকিয়েছিলে যে আমরা প্রেমের এতটা রহস্যে এমনভাবে অভিষিক্ত হলাম? না কি এই নশ্বর সীমিত সত্তার দীন যন্ত্রটির মধ্যে তুমি চেয়েছ আরও প্রবল আরও পূর্ণভাবে, আরও তীব্র ও যথাযথভাবে আস্বাদন করতে তোমার আপন অস্তিত্বের আপন অভিব্যক্তির আনন্দ। তোমার সত্তার অপ্রকাশ্য সুষমায় সবকিছু সহসা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং ব্যষ্টি-চেতনার দর্পণটিতে তুমি প্রতিফলিত করলে তোমার প্রেমস্বরূপ স্বকীয় সত্তার প্রকাশধারার অনন্ত বৈচিত্র্য। দুঃখ আর সুখ মিলে মিশে গেল এমন এক রভসের মধ্যে যা মনে হল সমগ্র সত্তাকে তার প্রদীপ্ত শিখায় গ্রাস করে ফেলবে। আহা, তোমার এই যে অংশটি সংহত রূপ নিয়েছে যাকে বলি আমার সত্তা তার মধ্যে, সে কি ভালভাবেই না তোমায় বুঝেছে, কি প্রবলভাবেই না তোমায় ভালবেসেছে সেই সব অবিস্মরণীয় মুহূর্তে! চিন্তার অনুভবের সকল বাধা মিলিয়ে গেল তোমার দিব্য অগ্নির তীব্রদাহে ভস্মীভূত হয়ে আর সেই মুহূর্তে তুমিই তো আস্বাদন করলে সবার মধ্যে তোমার শাশ্বত ও অনন্ত সান্নিধ্য। তুমি হয়ে উঠলে সকল ক্রিয়া আবার সকল প্রতিবন্ধক, সকল সংবেদন আর সকল চিন্তা, যে ভালবাসে আর যে ভালবাসা পায়, যা নিজেকে দিয়ে দেয় আর যা গ্রহণ করে, এক অফুরান চলমান সুসঙ্গতির মধ্যে।

আমি শুনলাম তরঙ্গমালার সামগান আর তা আমায় বলল কত-না মহাবিস্ময়ের অপরূপ কথা...

মার্চ-এপ্রিল ১৯১৫

আদর্শের সিদ্ধির জন্যে বর্তমান মুহূর্তের তৃপ্তি ত্যাগ করতে জানা. এই হল মহৎ কৌশল সেই সব মানুষের যারা চায় তাদের এই নশ্বর সবখানি আধার সব থেকে বেশি যা সৃষ্টি করা সম্ভব তাই করবে।

যারা 'সফল' হয়ে ওঠে তাদের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য শ্রেণীবিভাগ। এইসব শ্রেণী-বিভাগ নির্ণীত হয় কমবেশি তাদের আদর্শের প্রসারতা, মহত্ব, জটিলতা, গুরুতা ও ভাস্বরতা দিয়ে। তুমি 'সফল' হতে পার নয়লাকাগজওয়ালা হিসেবে, সাফল্যলাভ করতে পার জগতের অধিপতি হিসেবে, কি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হিসেবে; আর এই তিনটি ক্ষেত্রেই, খুবই স্বতন্ত্র মাত্রার হলেও কমবেশি সর্বাঙ্গীণ ও ব্যাপক স্বারাজ্যসিদ্ধিই নিয়ে আসে সাফল্য।

অন্যদিকে 'ব্যর্থ' হবার রয়েছে শুধু একটিই উপায়; আর তা ঘটে সব থেকে মহতের সব থেকে রাজকীয় মনীষীর ক্ষেত্রে যেমন তেমনি সবচেয়ে ক্ষুদ্রের সব থেকে সীমিতের ক্ষেত্রে, তাদের সবারই ক্ষেত্রে যারা অভীষ্ট আদর্শের কাছে বর্তমানের অনুভূতিকে গৌণ করে ধরতে জানে না, যে আদর্শকে তারা সিদ্ধ করতে চায় কিন্তু যে-পথ নিয়ে চলবে সেই সিদ্ধির দিকে সে-পথে চলবার শক্তি যাদের নেই। সবার জন্যেই সে-পথ, তার প্রসার ও জটিলতায় যদি না-ও হয়, প্রকৃতিতে অভিন্ন।

নিজের অভীষ্ট ধারণাগুলিকে যে পূর্ণভাবে, পূর্ণাঙ্গভাবে সিদ্ধ করে তুলেছে আর যে তার কোন কিছুই সিদ্ধ করে তুলতে পারেনি এই দুই প্রত্যন্তবিন্দুর মধ্যে, বলা বাহুল্য, রয়েছে মধ্যবর্তী অবস্থার এক প্রায় গণনাতীত সোপান; আর এই সোপানশ্রেণী বিশেষভাবে জটিল কারণ আদর্শ সিদ্ধিতে মাত্রার পার্থক্যের সঙ্গে এসে যুক্ত হচ্ছে এই আদর্শেরই বিবিধ গুণ-গত পার্থক্য। এমন সব উচ্চাশা রয়েছে যা শুধু বৈষয়িক, ভাবগত বা বুদ্ধিগত ব্যক্তি-স্বার্থসিদ্ধির দিকে উন্মুখ, আবার এমনও আছে যাদের লক্ষ্য আরো উদার, আরো বেশি গোষ্ঠিগত, আরো বেশি সমুন্নত, আবার অন্য এমনও আছে যাদের বলা যায় অতিমানবিক— তারা চায় সেইসব শিখরে উঠতে যা নিয়ে চলে পরাসত্যের পরাচেতনার ও শাশ্বত শান্তির পরমদীপ্তি অভিমুখে। এটা সহজেই বোঝা যায় যে, যে-লক্ষ্য তুমি বেছে নিয়েছ তা যত হবে বিস্তৃত ও উচ্চ সেই অনুপাতেই থাকা চাই প্রচেষ্টা ও ত্যাগের শক্তি।

সব থেকে নগণ্য হতে আরম্ভ করে সব থেকে লোকাতীত প্রতিটি স্তরে যা দুর্লভ তা হল একটা পূর্ণ সুসাম্য দুটি জিনিসের মধ্যে: প্রথম, কোন একটি লক্ষ্য যে সামনে ধরেছে সে নিজের উপর কতখানি প্রযত্ন করছে, আত্মত্যাগের শক্তি তার কতখানি; আর দ্বিতীয়, এই লক্ষ্যকে সিদ্ধ করবার জন্যে যত রকমের ও যত প্রকৃতির ত্যাগ প্রয়োজন।

যখন কোন সত্তার গঠন এই সুসাম্যের পূর্ণতা এনে দেয় তখনই শুধু তার পার্থিব জীবন হয়ে ওঠে তার সাধ্যপক্ষে সব থেকে বেশি ফলপ্রসূ।

এপ্রিল ২৩, ১৯১৫

কখনো কখনো তুমি আমার সত্তায় জ্বালিয়ে ধর প্রদীপ্ত অগ্নিকুণ্ড এক, আর সেই মুহূর্তে সবই তার মনে হয় সম্ভব, সব থেকে চরম সব থেকে পরম সিদ্ধি যেমন তেমনি আবার সব থেকে অসঙ্কুচ সব থেকে দীন অবধি...

সেই প্রদীপ্ত অগ্নিকুণ্ড ব্যতিরেকে সত্তা যেন এক ভস্মস্তূপ। আর তুমি, হে ভগবান, কদাচিৎ সে-অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত কর। তা কি এই ভঙ্গুর যন্ত্রটিকে অব্যাহতি দেবার জন্যে?

মনই প্রশ্ন করে তবে অখণ্ড সত্তা তৃপ্ত এবং তুমি যা চাও তাছাড়া আর কিছুই চায় না তা।

কিন্তু তা জানে যে তোমার সক্রিয় দিব্য সান্নিধ্য ছাড়া তা দীনহীন, রিক্ত ও মূল্য-হীন।

আর সেই সান্নিধ্যের জন্যেই সর্বদা তার আহ্বান, তার প্রতীক্ষা।

ডিসেম্বর ৯, ১৯১৬

নীরবতা নেমে আসে, তারপর আত্মাহুতির অনলশিখা জ্বলে ওঠে, তখন দেহ ভরে ওঠে এক কণ্ডুয়নে বিশেষ করে হৃদয় থেকে মস্তিষ্ক অবধি, আর সেই উষ্ণতা হল পরম আনন্দে ভরা রূপান্তরের এক প্রবেগ। দিব্য ঐকতান-সঙ্গীত শোনা যায়, সম্মিত প্রশান্ত: মধুর এই ঐকতান একই সঙ্গে দুর্লক্ষ্য ও শক্তিমান। তারপর আবার ফিরে আসে নৈঃশব্দ্য— আরও গভীর আরও ব্যাপক, হাঁ, অনন্ত অবধি সে ব্যাপ্তি, আর সত্তা বিরাজমান দেশকালের সকল সীমা ছাড়িয়ে।

হে আমার মধুময় অধিরাজ, আমার দয়িত ভগবান, সকল সত্তা আমার এক অদম্য প্রবেগে উচ্চকণ্ঠে জানায় তোমায় আমি তোমায় ভালবাসি! আমি তোমায় ভালবাসি। আমি তোমায় ভালবাসি!...এমন এক প্রেমে যা কোন কথায় প্রকাশ করা যায় না—সমগ্র সত্তা সেই তীব্রতায় গলে মিশে গেছে। শুধু হৃদয় আমার—কতবার যা হতাশ হয়েছে, নিষ্ঠুরভাবে হয়েছে প্রবঞ্চিত—ভীরুকণ্ঠে অস্ফুটে বলে চলে "তুমিও কি যত মানুষের মত করবে? সরিয়ে দেবে এই প্রেম তোমার অযোগ্য বলে কিংবা বহনের পক্ষে অতীব দুর্ভার বলে?" হে সংশয়ী হৃদয়! দেখতে কি পাও না যে উপাস্য পুরুষ নিজেই তোমার মধ্যে ভালবাসছেন আর জ্বালিয়ে রাখছেন সেই অগ্নি যা আর কখনও নিভবে না! আর ভীরুতা নয়, আর বৃথা কুণ্ঠা নয়...অতীত মিলিয়ে যায় স্বপ্নের মত। থাকে শুধু এক অপরূপ বর্তমান, সুমহান আনন্দে গড়া...

হে আমার দয়িত ভগবান—তোমার প্রবল ও শক্তিমান মধুর বাহুপাশে আমায় ধরেছ, তোমার দিব্য উল্লাস ছাড়া কিছুই নেই আর।

শিল্পকলা হল প্রাণজগতের মানুষী ভাষা যার কাজই হল ভগবানকে রূপায়িত ও গোচর করে ধরা যিনি ইন্দ্রিয়ানুভবের ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত হন সৌন্দর্যরূপে।

শিল্পকলার সার্থকতা তাই, যারা তার লক্ষীভূত তাদের মধ্যে পরম সদ্বস্তুর সঙ্গে এক পূর্ণতর ও সহজতর সম্মিলন গড়ে তোলায়। সেই পরম সদ্বস্তুর সঙ্গে প্রথম সংযোগ আমাদের চেতনায় প্রকাশ পায় বিপুল প্রশান্ত আনন্দের এক পূর্ণ প্রাচুর্যের মধ্যে সত্তার ফুল্ল-

বিকাশের ভিতর দিয়ে। যখনই শিল্পকলা অনন্তের সঙ্গে এই সংযোগ দর্শকের কাছে ফুটিয়ে তুলতে পারে, যত ক্ষণিকেরই তা হোক না, তখনই সে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে; সে তার অভীষ্ট কর্মের উপযুক্ত বলে নিজেকে চিহ্নিত করেছে।

তাই কোন শিল্পকলা, তা সে যাই হোক না, যা বহু শতাব্দী ধরে কোন জাতিবিশেষকে দিয়েছে ভাবাবেগ, দিয়েছে আনন্দ তা কোন ক্রমেই নিন্দনীয় হতে পারে না কারণ যা ব্যক্ত করে ধরতে হবে তার কমবেশি নিখুঁত বাণীরূপ হয়ে ওঠার তার যে ব্রত তা, অন্ততপক্ষে আংশিকভাবে, পূর্ণ করেছে।

কোন জাতির অনুভবশক্তির পক্ষে কোন বিশেষ শিল্পকলার মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করা যে কঠিন হয়ে পড়ে, যে আনন্দ অপর এক জাতি তার মধ্যে খুঁজে পায়, তার কারণ হল প্রাণসত্তার অভ্যাসগত সীমাবদ্ধতা। এমনকি মানস সত্তার চেয়েও এই প্রাণসত্তা স্বভাবতই ভগবৎ-প্রতীতির সম্ভাবনার ক্ষেত্রে একান্ত আত্মমুখী ও পরমত-অসহিষ্ণু, আর যখন তা অনুভবের বিশেষ রূপের ভিতর দিয়ে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে তখন অন্য কোন রূপের মাধ্যমে তাঁকে স্বীকার করতে একটা প্রায় অলঙ্ঘ্য অনীহা অনুভব করে।

কি এই 'আমি' যা সময়ে সময়ে কিছু বলে, অনন্তের চেতনার মধ্যে থেকেও নিজের সীমাবদ্ধতা প্রত্যক্ষ করে? তা হল একাগ্রতার কেন্দ্রবিন্দু, যেখানে বিশ্বাতীত দিব্যইচ্ছা ব্যষ্টিগতভাবে সচেতন হয়ে ওঠে যাতে তা পার্থিব যন্ত্রটির মাধ্যমে অভিব্যক্ত হতে পারে; সংক্ষেপে, তা হল যন্ত্রীর যন্ত্র এবং চিন্তার মধ্যে ব্যষ্টি-মাধ্যম, এক ধরনের কমবেশি নিপুণ হস্ত। 'আমি' জানে তা বর্তমান অভিব্যক্তির উপায়, রূপ, শরীর, পারিপার্শ্বিকী, শিক্ষা, ইন্দ্রিয়ানুভূতি এই সবকিছু থেকে পুরোপুরি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন; তা হল 'সর্ব'-র গঠনকর এক উপাদান, বিশ্বের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক অংশ; 'আমি' হিসাবে তার স্থায়িত্ব বিশ্বের স্থায়িত্বের সমতুল, তার উপর নির্ভরশীল। তা জানে যে 'আমি' নয় যা তাই একমাত্র এই নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে, হতে পারে চিরন্তন। 'আমি' জানে যে তাঁরই কাছে তা পূর্ণরূপে সমর্পিত যিনি অচিন্ত্য, তা তাঁরই দ্বারা প্রচালিত আর তাই সে বলতে পারে না "আমি চাই", তাকে বলতে হয় "আমায় চাইতেই হবে" কিংবা "আমাকে চাওয়ান হচ্ছে"। আর, তার শাশ্বত প্রভুর কাছে, তার ক্ষণস্থায়ী যন্ত্রটির প্রভুর কাছে সমর্পিত সে, জানে যে-কাজের জন্য যন্ত্রটি সৃষ্ট হয়েছে সে-কাজের সাথে সাথেই তা লয় পাবে, তাই সানন্দে সে সম্পন্ন করে চলে কাজ, তা শেষ করবার জন্য অধৈর্য হয় না, বা তা দীর্ঘকাল ধরে চলুক এমন কোন আকাঙ্ক্ষাও করে না।

অনুবাদ : শতদল

দু'টি কবিতা

সৌমিত্রশঙ্কর দাসগুপ্ত

আহ্বান

অকস্মাৎ ব্যাপ্ত অন্ধকারে
হারাই তোমারে
রাত্রির নিষ্প্রদীপ
ভীতত্রস্ত সর্ব দেহ মন—
আলোর পাখিরা কাঁদে
বধ্যভূমি স্বপ্নের ভুবন।

এ-কোন দুর্বার টানে
নির্বাসিত হই প্রেতলোকে
আনন্দ বাজে না আর
মুহ্যমান তীব্র আর্তশোকে।

তবুও ঘণ্টার ধ্বনি
কাতর পেতেছি যদি কান—
অন্ধকার মিলায় সহসা
বুকে বাজে সপ্রেম আহ্বান।

চলা

বহু দিবসের অন্তবিহীন চলা
একদিন এসে থামে
আলোকিত সেই পথে
মলিন ধূলি সে পবিত্র হয়ে ওঠে
বিরামবিহীন সেবা-সাধনার যোগে।

পটভূমি ভরে শুভ্র শূন্যতায়।
শুদ্ধ ভাবনা বিশ্বাসে নির্ভরে—
ভিন্ন আলোয় স্থির হয়ে জেগে ওঠে
যেখানে নিত্য লাবণ্যে ফুল ফোটে
সে আমারে দেবে নতুন চলার বেগ।

মায়ের আলাপ

৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪,

(শ্রীঅরবিন্দের Bases of Yoga বইটিকে ধরে, আজ থেকে পড়া ও প্রশ্ন-উত্তর শুরু হল। মা প্রথম চার পৃষ্ঠা পড়লেন)

(পাঠ শেষ করে বললেন), বেশ, এবার তবে...

প্রশ্ন মা, সূক্ষ্ম দেহগুলোর বিরোধীশক্তি কোন্‌গুলি ?

শ্রীমা বিরোধী শক্তি কোন্‌গুলি ? জগতে যত উপকরণ আছে তত বিরোধী শক্তি আছে। কেবল যতক্ষণ না তারা বাহ্যত আত্মপ্রকাশ করছে, ততক্ষণ আমরা তাদের দেখতে পাই না। তাই তাদের আমরা গণনার মধ্যে আনি না। কিন্তু সেদিন ত আমি তোমাদের বললাম, পৃথিবী অসংখ্য সব রূপায়ণে (formations) ভর্তি। সেগুলো সাধারণত যত রকম চিন্তা, বাসনা, ধারণা এবং ইচ্ছাবেগের দ্বারা গড়ে উঠেছে, আর সে সব মানুষের চিন্তাগুলোর মতোই বহুর সংমিশ্রণ। তাদের মধ্যে ভালও আছে আবার মন্দও আছে, এবং সে সবের পিছনে আছে প্রাণজগতের বিভিন্ন স্থূল রূপায়ণ। ও জগতটি একান্তই ভগবৎ-বিরোধী। মানুষের ভিতরকার এই প্রাণ যদি চৈত্যপুরুষের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়, তবেই কেবল সে নিজেকে বদলাতে পারে এবং দিব্যকর্মের সহযোগী হতে পারে। নইলে, প্রাণজগৎ বিশেষ করে ভগবৎকর্মের বিরোধী যত শক্তিদের দ্বারা গড়ে উঠেছে, আর যারাই সংযত না হয়ে এই সব শক্তিদের দিকে নিজেদের খুলে দেয়, স্বভাবতই তারা বিরোধীশক্তিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই কোন্‌গুলি বিরোধী শক্তি তা বলা যায় না, বরং কোন্‌গুলি বিরোধীশক্তি নয়, তা বলা ঢের বেশী সহজ।

(মায়ের সামনের সারির শিশুদের লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন)

কি, তোমার কোন প্রশ্ন নেই ? তোমার ? তোমার ?...

প্রশ্ন আমার প্রশ্নটা আজকের পাঠ্যাংশের বাইরে পড়ে।

শ্রীমা কি বললে ? আজকের পড়ার বাইরে ? অনেকটা পরের বুঝি ? তাহলে পরের বারে হবে। (মা অন্যদের প্রশ্ন করতে লাগলেন) তুমি ? তুমি ? তোমারও কোন প্রশ্ন নেই ?

প্রশ্ন : আমার প্রশ্নটা আজকের পাঠ্যাংশের অনেকটা পরের।

শ্রীমা তার মানে, আজ আমি খুব অল্পই পড়েছি ?

পবিত্র না, না, খুব অল্প পড়নি।

শ্রীমা জানো, অনেকে আমার কাছে অনুযোগ করেছে, কারণ আমি La Mère

বইটি বড্ড তাড়াতাড়ি পড়ে গেছি। তারা আমাকে আরও আস্তে আস্তে পড়তে বলেছে। তাই আজ আমি খুব আস্তে আস্তে পড়েছি।

প্রশ্ন আচ্ছা মা, "মনোময় সত্তার সার পদার্থ" (substance) বলতে কি বোঝায়?

শ্রীমা বাছা, সার পদার্থ মানে...কি ভাবে বলি...ওর মানে হল, যে বস্তুটি দিয়ে মনোময় সত্তা তৈরী হয়েছে। যেমন বলা চলে, তোমার দেহ-কোষগুলি হল তোমার দেহের সার পদার্থ। কিন্তু মনেরটাকে ঠিক জড় পদার্থ বলা যায় না। মন ঠিক সম্পূর্ণ স্থূল নয়। তবে মন যা দিয়ে তৈরী, তাই হল মনের সার পদার্থ। যদি মনোময় সার পদার্থ না থাকত, তাহলে মনোময় সত্তা বলে কিছু থাকত না, থাকত কেবল মনের স্পন্দন মাত্র। কিন্তু স্পন্দনেরও ত আবার আত্ম-প্রকাশের জন্যে একটা পরিবেশের দরকার।

তোমার দেহটা যদি স্থূল পদার্থের দ্বারা গড়ে না উঠত, তাহলে দেহ বলে তোমার কোন কিছুই থাকত না। একেই বলে পদার্থ। এ হল সেই বস্তু যা দিয়ে কোন কিছু গড়া হয়। আর সত্যিই যেটা উল্লেখযোগ্য, তা হল, সাধারণতঃ মানুষ ভাবে যে মন হল কেবল একটা কাজের ক্ষেত্র। অথচ মনের একটা সার পদার্থ আছে, ঠিক যেমন প্রাণের একটা সার পদার্থ আছে এবং দেহের একটা সার পদার্থ আছে। আবার সার পদার্থ আছে বলেই অনুরূপ এক জগতও আছে, যার স্বতন্ত্র জীবন রয়েছে। অর্থাৎ দেহ ছাড়াও মন থাকতে পারে। এই স্থূল দেহটা অন্তর্ধান করতে পারে, কিন্তু মন টিঁকে থাকতে পারে। এই থেকেই স্পষ্ট বোঝা দরকার যে, মনের সার পদার্থ বলে এমন কিছু আছে, যা বাস্তবিকই ঢের বেশী...(মা নীরব) কি ভাবে বলি...অবাস্তব স্থূল পদার্থের চেয়েও অবাস্তব।

কেউ কেউ আছে যারা একটি অদ্ভুত শব্দ প্রয়োগ করে। তারা বলে, "ঘনত্ব-বর্জিত", কিন্তু আমার মনে হয় না কথাটার সঠিক অর্থ তাই। তবে লোকেরা বলে থাকে, পদার্থের আছে নানা রকমের ঘনত্ব এবং যত তা স্থূলের কাছাকাছি হয় তত তার ঘনত্বও বাড়ে, আর যত তা স্থূলের থেকে দূরে থাকে ততই তা কম ঘন হয়। কিন্তু কম হলেও তা পদার্থই থাকে। এমনকি ইথারেরও পদার্থ আছে। আমি বলছি না, বৈজ্ঞানিকদের সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে একমত হবে। আমি যে অবৈজ্ঞানিক সব কথা বলছি না, সে বিষয়ে তোমাদের আশ্বাস দিতে পারি না। কিন্তু এ হল একটি বিশ্বজনীন সত্য। (বলে মা হাসতে লাগলেন) ঠিক এই কথাই, বোধ হচ্ছে যেন আমি বলেছিলাম, যখন আমি ক্ষুদ্র তত্ত্ব (occultism) সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। আমি বলেছিলাম, সূক্ষ্ম বিদ্যার চর্চা শুরু করার আগে প্রথমেই জানা চাই যে সত্তার বিভিন্ন অবস্থার বা বিভিন্ন স্তরের আছে ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্ব আর আছে তাদের নিজের নিজের স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন অস্তিত্ব। তারা সবাই বাস্তব সত্য, বাস্তবিকই তারা সত্যিকারের পদার্থ, তারা অস্তিত্বের একটা ধারণা মাত্র নয়। একটি মনোময় সত্তা থাকতে পারে এবং একটি মানসিক ক্রিয়া থাকতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, এমন একটি চিন্তা থাকতে পারে যার সঙ্গে মস্তিষ্কের কোন সম্পর্ক নেই। অথচ জড়বাদীদের মত হল, মনের যত ক্রিয়া মস্তিষ্কই চালায়। কিন্তু কথাটি সত্য নয়। মস্তিষ্ক হল মানসিক ক্রিয়ার স্থূল প্রতিলেখন (transcription), এবং মানসিক ক্রিয়া কর্মের নিজস্ব ক্ষেত্র

আছে। মনোময় রাজ্যের নিজস্ব সত্য আছে, আর আছে তার নিজস্ব বস্তু বা পদার্থ। মানুষ তার মস্তিষ্ক থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে চিন্তা করতে পারে। চিন্তা, কাজ, রূপদান প্রভৃতি সব কিছুই তার মস্তিষ্কের বাইরে করতে পারে। এমন কি সে বেঁচে থাকতে পারে, নড়তে চড়তে, স্থান পরিবর্তন করতে পারে, এক কথায় দেহ-মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাব মনের জগতে মনসম্পর্কিত নানা বিষয়ের জ্ঞান সরাসরি লাভ করতে পারে, অর্থাৎ দেহ তখন সম্পূর্ণ অসাড় অবস্থায় থাকতে পারে, কেবল ঘুমিয়ে থাকাই নয়, একেবারে অচৈতন্য অবস্থাতেও থাকতে পারে। তাছাড়া যতদিন না মানুষ বুঝতে পারছে যে তার সত্তা বিভিন্ন রকমের অবস্থার দ্বারা গড়ে উঠেছে, তত দিন সে পুরোপুরি আত্ম-কর্তৃত্বের ক্ষমতা লাভ করতে পারবে না, এ একেবারে ধ্রুব সত্য। সর্বদাই এমন কিছু একটা থেকে যাবে, যেটা তোমার আয়ত্তের মধ্যে নয়।

(একটি শিশুকে) কি, বলবে কিছু ?

প্রশ্ন আজ্ঞা হ্যাঁ, কিন্তু মা, সেটা আজকের পাঠের বাইরের...

শ্রীমা তাই বুঝি ? এ বইটির এলাকার বাইরের ? প্রশ্নটি যদি বেশ উপভোগ্য হয় ও পেশ করতে পার, আপত্তি নেই।

প্রশ্ন আচ্ছা মা, হঠাৎ এই যে তোমার* কার্যসূচীর পরিবর্তন ঘটল, তার পিছনে কি অর্থ আছে ?

শ্রীমা ....ওঃ !...কিন্তু ও হল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার !

তবে এইটুকু কেবল তোমাদের বলতে পারি, এর পিছনের অর্থ প্রত্যেকের জন্যে আলাদা এবং সেটা তোমাকে নিজের অন্তরে খুঁজে পেতে হবে। যদি তা পাও, তাহলে বুঝতে হবে তুমি কিছুটা এগিয়ে গেছ।

(মা নীরব)

(একটি শিশুর দিকে তাকিয়ে) কি, কিছু বলবে ?

না।

(আর একজনকে) তোমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ? না ? না, (মা হাসতে হাসতে বললেন) তার মানে, তুমি স্বপ্ন দেখছ !

কারুরই কোন প্রশ্ন নেই ? (আর একজনের দিকে তাকিয়ে) তোমার খবর কি ?

প্রশ্ন যখন মনঃসংযোগ করতে চেষ্টা করি তখন যত রকমের চিন্তা এসে হাজির হয় কেন ? অন্য সময়ে ত আসেনা !

শ্রীমা কি বললে ?

(ছাত্রটি তার প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করল) যখন মনঃসংযোগ করতে চেষ্টা করি, তখন যে সব চিন্তা আগে কখন উদয় হয় না, সেগুলো আসে কেন ?

---

* শ্রীমা সকালে তাঁর সিঁড়িতে ছাত্রছাত্রীদের এবং অন্য কয়েকজনকে "আশীর্বাদ" করতেন। সেটি বন্ধ হয়ে গেল এই সময় থেকে, সেই প্রসঙ্গে।

শ্রীমা অন্য সময়ে হয়ত সেগুলো আসে কিন্তু তুমি খেয়াল কর না। মনঃসংযোগ করতে চাও বলেই তুমি লক্ষ করে যে সেগুলো রয়েছে। আবার এমনও হতে পারে, যে তোমার চেতনার মধ্যে প্রতিবাদ করবার মতন কিছু একটা বস্তু আছে, তাই তুমি যখন নিজেকে নীরব হতে বল, তখন কিছু একটা আপত্তি করে বলে ওঠে, "না, আমি চুপ করব না।"

আমার বিশ্বাস তোমাদের অনেকের মধ্যেই এই রকমের একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব লেগে আছে। যখন তারা ভাল হবে বলে সংকল্প করেছে তখন কিছু একটা তাদের বেয়াড়া হবার দিকে ঠেলে দিতে চায়, আর তখন তারা শান্ত হতে চায় তখন কিছু একটা তাদের উত্তেজিত হবার দিকে এগিয়ে দেয়, আবার যখন তারা একেবারে চুপচাপ থাকতে চায়, তৎক্ষণাৎ যত্তরাজ্যের চিন্তা তাদের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে থাকে। এই অন্তর্দ্বন্দ্বটা তাদের প্রকৃতির মধ্যে বাসা বেঁধে আছে। হয়ত এটা তাই, নয়ত, যেটা বললাম তা হতে পারে। ওই সব চিন্তাগুলো ছিলই, কিন্তু তুমি তাদের নিয়ে মাথা ঘামাওনি বলে তাদের জানতে না।

এ একেবারে নিশ্চিত যে মানুষ যখন নিজের ভিতরটা সম্পূর্ণ নীরব করতে চায়, তখন সেটাই হয় সব চেয়ে কঠিন ব্যাপার। কারণ অনেক কিছু অন্য ছিল যেগুলোকে সে এতদিন লক্ষ করেনি, এখন সেগুলো অসংখ্য হয়ে দাঁড়ায়। বাহ্য চেতনাতে, প্রায় চেতনার বাইরে, যেন চেতনার একেবারে সীমান্তে, যত রকমের প্রস্তাব, গতিবৃত্তি, চিন্তা, রূপায়িত সংকল্প প্রভৃতি যন্ত্রবৎ ঘটে চলেছিল, এখন যেই তুমি সম্পূর্ণ নীরব হতে চাইবে, অমনি তাদের টের পাবে। সেগুলো অনবরত চরকির মতো ঘোরাফেরা করছে, প্রচুর কোলাহল করছে এবং কিছুতেই তোমাকে চুপ করে শান্ত হতে দিচ্ছে না। সেই জন্যেই সব চেয়ে ভাল হয়, যদি অতিশয় নীরব, অতিশয় শান্ত থাকতে পার এবং সেই সঙ্গে যে বস্তু তোমার ঊর্ধ্বে রয়েছে এবং যার কাছেই তুমি প্রার্থনা করছ, তার দিকে একাগ্র ভাবে উন্মুক্ত থাকতে পার। কিন্তু যদি এই ধরণের গোলমাল তোমার চারিদিকে হতে থাকে (মা নিজের মাথার চারিদিকে হাত ঘুরিয়ে দেখালেন), তাহলে সেদিকে মন দেবে না, ফিরেও তাকাবে না, গ্রাহ্যই করবে না। যদি অজস্র চিন্তার ঝাঁক এদিক-ওদিক-সেদিকে করে ঘুরে বেড়াতে থাকে, ভিতরে আসে আবার চলে যায়, আবার আসে আবার যায় (অঙ্গভঙ্গি করে দেখালেন), সেগুলোর দিকে ফিরেও তাকাবে না, একেবারেই লক্ষ্য করবে না, গভীর অভীপ্সায় ঊর্ধ্বের দিক একমুখী হবে। প্রার্থনার আকারে তা ভাষায় ব্যক্তও করতে পার—কারণ এক এক সময় তা এক-মুখী হতে সাহায্য করে—জ্যোতির দিকে, শান্তির, নীরবতার দিকে, অন্তরের অবিচলিত আত্মার দিকে প্রার্থনা করবে, যেন তোমার একাগ্রতা এতটা গভীর হয় যাতে তোমার চতুর্দিকে যে সব বস্তু হৈচৈ করছে, সে সবের প্রতি তুমি ভ্রূক্ষেপ না কর। কিন্তু হঠাৎ যদি বলে ওঠ, "আঃ! আবার গোলমাল আরম্ভ হল। আবার একটা চিন্তা উঁকি মারছে।", তাহলেই সব পণ্ড হয়ে যাবে, তুমি কোন দিনই শান্ত হতে পারবে না। দেখনি, কতক লোক আছে যারা ঝগড়া থামাতে গিয়ে যারা চেঁচাচ্ছে তাদের চেয়েও বেশী গলা ছেড়ে চীৎকার জুড়ে দেয়? এ-ও অনেকটা সেই রকমের। (বলে মা হাসতে লাগলেন)।

প্রশ্ন : মা, একটা প্রশ্ন করতে পারি কি? কিন্তু সেটা আজকের বিষয়ের বাইরে।
শ্রীমা : কি প্রশ্ন?

প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Brain of India বইটিতে লিখেছেন, "বাঙালীরা হৃদয় দিয়ে চিন্তা করতে পারে..."

শ্রীমা কে তার হৃদয় দিয়ে চিন্তা করতে পারে? (আমি ভাল শুনতে পাচ্ছি না) বাঙালীরা? তাদের হৃদয় দিয়ে চিন্তা করতে পারে? ও হল কবিদের ভাষায় বলা। (সকলের উচ্চ হাস্য) কোথায় তিনি ও কথা লিখেছেন? ও হল সুন্দর কবিত্বময় বর্ণনা। তিনি বলতে চাইছেন, এদের সত্তা বিশেষ ভাবেই হৃদয়াবেগে পূর্ণ। আর এদের চিন্তার মধ্যেও হৃদয় সচেতন, অর্থাৎ এদের চিন্তা সম্পূর্ণ বুদ্ধিগত এবং শুষ্ক নীরস নয়।

এদের হৃদয় এদের চিন্তা সম্বন্ধে সচেতন। এটাই তিনি বলতে চেয়েছেন।

এই সূত্রে তোমাদের একটি গল্প বলি শোন। আমি তখন জাপানে। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তিনি একটি সঙ্ঘ গড়েছিলেন...ঠিক যে সাধনার উদ্দেশ্যে তা বলা চলে না, তবে এক রকমের সংযম অভ্যাস করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তাঁর নিজের একটি মতবাদ ছিল, এবং সেটিকে আদর্শ করেই তিনি সঙ্ঘটি গড়েছিলেন। মতবাদটি হল এই, মানুষ তার সত্তার যে কোন অংশেই চিন্তা করতে পারে, যদি ঠিক সেই খানটিতেই সে একনিবিষ্ট হতে পারে, অর্থাৎ তুমি তোমার মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্তা না করে তোমার বুকের মধ্যে চিন্তা করতে পার। তিনি আরও বলতেন, মানুষ এইখানটায় (মা আঙুল দিয়ে দেখালেন) পেটের মধ্যেও চিন্তা করতে পারে। তিনি পেটটিকে প্রাণের অধিষ্ঠান বলে ধরেছিলেন, অর্থাৎ প্রাণশক্তি। কয়েকটি সংস্কৃত শব্দ তিনি এই সময় উচ্চারণ করতেন, কিন্তু তার অর্ধেকটা তাঁর পেটের মধ্যেই থেকে যেত, এবং এই রকমের যত কিছু...তা হোক, তাতে কিছু আসে যায় না, তাঁর অন্তরটি ছিল শুভ ইচ্ছায় পূর্ণ। তিনি বলতেন, লোকেদের বেশীর ভাগ দুর্ভোগের কারণ, তারা মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা করে। তার লক্ষণ তাদের মাথা ধরে এবং মাথা ধরলে তারা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে আর তখন তাদের মনের স্বচ্ছতা ঢাকা পড়ে যায়। অথচ, তুমি যদি এইখানটাতে চিন্তা করতে অভ্যাস কর (পেটের দিকে নির্দেশ করে) তাহলে তুমি শক্তিলাভ করবে, বল পাবে, এবং শান্ত অবস্থা লাভ করবে। আর এ মানুষটার ক্ষেত্রে সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল এই, যে তিনি সত্যিই এমন একটা ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন যার দ্বারা ঠিক এইখানটিতে (পেটটা দেখিয়ে) মনের শক্তিকে, মনের বলকে নামিয়ে আনতে পারতেন, মানসিক ক্রিয়াকলাপ এই জায়গাটা থেকে উৎপন্ন হত, মাথার মধ্যে আর নয়। আর এই উপায়ে ভদ্রলোক অনেকের অসুখ সারিয়েছিলেন, সত্যিই অনেকের, প্রায় কয়েক-শ' হবে। তারা সাংঘাতিক মাথার যন্ত্রণায় ভুগত। ঠিক এই ভাবে তিনি তাদের সবাইকে ভাল করে দিয়েছিলেন।

আমি নিজে এটা চেষ্টা করে দেখেছি, ব্যাপারটা খুবই সোজা, তার কারণটা ও তোমাদের এই কিছুক্ষণ আগেই বললাম যে, মানসিক শক্তি, মনের কাজকর্ম, মস্তিষ্কের এলাকাতেই বাঁধা নয়। আমাদের অভ্যাস মস্তিষ্ক চালনা করা কিন্তু ইচ্ছা করলে আমরা অন্য কিছুকে কাজে লাগাতে পারি, অথবা বলা চলে, মানসিক শক্তিকে অন্যত্র সংযুক্ত করতে পারি, আর তখন অনুভব করতে পারব যে আমাদের মনের ক্রিয়াকর্মগুলো সেখান থেকে উৎসারিত হচ্ছে। মানসিক শক্তিকে বুকের মাঝখানটাতে একনিবিষ্ট করতে পারা যায় (ইঙ্গিতে দেখালেন) এবং সেখান থেকে মনের ক্রিয়াকর্মকে পরিচালিত করা যায়।

ভদ্রলোক বলতেন, "লক্ষ্য করেন নি, প্রত্যেক শক্তিমান পুরুষেরই প্রকাণ্ড ভুঁড়ির বহর? (সকলের উচ্চ হাস্য) তার কারণই হল ওই, তাঁরা সবাই তাঁদের শক্তিকে ওইখানে এনে তন্ময় হন, আর তাতেই তাঁদের পেটটা মোটা হয়ে যায়।" তিনি কথায় কথায় নেপোলিয়নের দৃষ্টান্ত দিতেন, বলতেন, "এঁরা সবাই একদম সোজা হয়ে চলেন, সর্বদাই সোজা, সর্বদাই উন্নত শির। কখন এরকম করে নয়, (মা নিজের মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে দেখালেন), কখন এ ভাবে নয় (মা মাথাটা ডান দিকে হেলালেন), কখন এ ভাবে নয় (এবার বাঁ দিকে করলেন), সর্বদা মাথা উঁচু, কিন্তু তাঁদের সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীভূত এইখানে (নিজের পেটের দিকে ইঙ্গিত করলেন), আর ঠিক এইভাবেই মানুষ খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে।" আর ওই যে বললাম, ভদ্রলোক সর্বদাই নেপোলিয়নের কথা বলতেন, "দেখুন নেপোলিয়ন কি রকম...(মা ভঙ্গি করে দেখালেন, নেপোলিয়নের ছিল প্রকাণ্ড ভুঁড়ি)। রবীন্দ্রনাথ যখন জাপানে গিয়েছিলেন তখন এঁর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। সেই সূত্রে ইনি একদিন আমাকে বললেন, "লক্ষ করেছেন নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথ কি সুন্দর সোজা হয়ে দাঁড়ান, ঠিক এইরকম, আর তাঁর মাথা একেবারে সত্যিকারের উন্নতশির।" তখন আমি বললাম, "কিন্তু কই, তাঁর ত কোন ভুঁড়ির লক্ষণ নেই।" উত্তরে ইনি বললেন, "কিছুদিন অপেক্ষা করুণ, ঠিক হবে।" (হোটবড় সকলের হাস্যের বন্যা ছুটে গেল)

এঁর সভায় শতশত লোক যোগদান করত। সবাই জাপানীদের মতো করে হাঁটু গেড়ে বসত। (মা ভঙ্গি করে দেখালেন)। ইনি টেবিলের উপর একটি ছোট ছড়ি দিয়ে একবার ঠুকতেন, আর অমনি সবাই নিজের নিজের মানসিক শক্তিকে তার পাকস্থলীর উপর নামিয়ে আনত। ওইভাবে তারা অন্তত আধঘন্টাটাক থাকত। আধঘন্টা পরে ইনি আবার একবার ছড়িটি দিয়ে টেবিলে ঠুকতেন এবং সবাই যে-যার মানসিক শক্তিকে ছুটি দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা কইত...খুব বেশী নয়, কারণ জাপানীরা বেশী কথা বলে না, তাহলেও তারা বলত।

এই হল আমাদের গল্প। কিন্তু মনে রাখবে এর মধ্যে যথার্থ সত্য কিছু ছিলই। এই অর্থে যে যদি কখন তোমাদের মাথা টিপ্‌টিপ্‌ করে, তাহলে আমি তোমাদের বলব এইটি করতে: চিন্তার শক্তিকে, মানসিক-শক্তিকে—এবং এ ছাড়াও যদি পার, তোমার কিছুটা প্রাণশক্তিকে ধরে নিচের দিকে নামাতে থাক, এইভাবে...(মা খুব ধীরে ধীরে দুই হাত দিয়ে মাথার উপর থেকে নিচের দিকে নামাতে লাগলেন) তখন তোমার যদি মাথা ধরে থাকে বা সর্দি লেগে থাকে অথবা যদি রোদের তাত লেগে থাকে, মানে, যদি কোন রকম ক্লান্তিকর কিছু ঘটে থাকে, তখন যদি এটি কি করে করতে হয় জানা থাকে, যদি মনের শক্তিটিকে নামিয়ে এইখানে আনতে পার (মা তাঁর বুকের মাঝখানটায় ইঙ্গিত করলেন), অথবা যদি আরও নিচে নামাতে পার (তাঁর পেটের কাছটা দেখালেন), তাহলে দেখবে, সেটা সেরে যাবে, নিশ্চয়ই সেরে যাবে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তুমি এটা করতে পারবে। চেষ্টা করে দেখতে পার। পরের বার যখন তোমার মাথা ধরবে,...আশা করি ধরবে না, তবে যদি ধরে, এইটি করে দেখতে পার। ঠিক এই ভাবে সোজা হয়ে বসবে (আসনে বসার ধরণ করে দেখালেন)।

জাপানীরা বলে, গোড়ালীর উপর বসবে—কিন্তু ওভাবে বসলে তোমাদের ধ্যানের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। জাপানীদের মতে, ও হল আরাম-আসন। ভারতীয়দের পদ্ধতি হল এইভাবে বসা (ভঙ্গি করে দেখালেন), তা না হলে, এইভাবে বসবে, (আবার ভঙ্গি করে দেখালেন), কিন্তু জাপানীদের মতন করে বসার অভ্যাস না থাকলে বড়ই কষ্ট হবে।

যে ভাবেই হোক, বেশ সহজ ভাবে বসে তোমার সমস্ত শক্তিকে, যেন মাথার মধ্যে যত শক্তি রয়েছে সে সবকে, নিয়ে নামিয়ে আরও, আরও, আরও নামিয়ে আনতে থাক, খুব ধীরে ধীরে, এই ভাবে নিয়ে এস, খুব সাবধানে, একেবারে নাভিকুণ্ডল পর্যন্ত নিয়ে এস। দেখবে তোমার মাথা ধরা ছেড়ে যাবে। আমি অনেকবার এটা করে দেখেছি,...খুবই উপকার হয়, করা খুবই সোজা। কোনরকম ওষুধপত্র খেতে হবে না, কোন ইন্‌জেকসন নিতে হবে না, ঠিক এই ভাবে সেরে যাবে।

শ্রীমা আর কারুর কোন প্রশ্ন আছে? আছে!

প্রশ্ন : কি করে মনের মধ্যে শান্তি এবং নীরবতাকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখা যায়?

শ্রীমা প্রথম কথা হল ইচ্ছা। ওই অবস্থা লাভ করবার জন্যে অন্তরে তীব্র ইচ্ছা করা চাই। তারপর চেষ্টা। সমানে লেগে থাকতে হবে, অবিরাম চেষ্টা করে চলতে হবে। কিন্তু এইমাত্র যেটা বললাম সেটা খুবই ভাল উপায়। আরও সব উপায়ও অবশ্য আছে। প্রথমে বেশ শান্ত হয়ে চুপটি করে বসবে। তারপর পঞ্চাশটা বিষয়ের কথা না ভেবে, মনে মনে বলতে থাকবে, "এস শান্তি, শান্তি, শান্তি, শান্তি, শান্তি এস।" কল্পনা করবে শান্তি আর নীরবতা আসছে। অভীপ্সা করবে, চাইবে, যেন আসে, শান্তি, শান্তি, নীরবতা। তারপর যখন কিছু একটা এল, তোমাকে স্পর্শ করল এবং তার কাজ আরম্ভ করল, তখন খুব শান্তভাবে, এই রকম করে বলবে, "শান্তি, শান্তি, শান্তি।" তখন আর চিন্তাগুলোর দিকে তাকাবে না, তাদের কথায় কান দেবে না। যা কিছুই আসুক, সে সবের প্রতি মন দেবে না। ধর, কেউ গায়ন তোমাকে আলাতন করছে এবং তুমি তাকে এড়াতে চাও, তখন তুমি তার কথায় কান দেওনা, নয় কি? তুমি তখন কি কর? তার দিকে থেকে এইভাবে মুখ ফিরিয়ে নাও (অঙ্গভঙ্গি করে দেখালেন), এবং অন্য কিছু ভাবতে থাক। এখনও ঠিক সেই রকমটাই করতে হবে। যখন চিন্তাগুলো এসে উঁকি মারতে থাকে, তাদের দিকে তাকাবে না, তাদের কথায় কান দেবে না, যেন তারা নেই এই রকম ব্যবহার করবে, বুঝলে। আর কেবল বারে বারে বলবে, যেন...কি ভাবে বলি?—কারুর বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গেলে সে যেমন একই কথা সারাক্ষণ ধরে বিড় বিড় করে আওড়াতে থাকে, ঠিক সেই ভাবে বারে বারে বলবে, "শান্তি, শান্তি, শান্তি।" কয়েক মিনিট ধরে এইটা করবে, তারপর তোমার অন্য সব কাজকর্মে মন দেবে। পরে আবার অন্য একটা সময় এটি আরম্ভ করবে, আবার চুপটি করে বসবে এবং চেষ্টা করতে থাকবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে একবার করবে, রাত্রে শুতে যাবার সময় একবার করবে। এমন কি যদি তোমার খাবার ভাল করে হজম করতে চাও, তাহলে খেতে বসার ঠিক আগে কয়েক মিনিট এটা অভ্যাস করতে পার। এর ফলে তোমার যে কত ভাল হজম হবে, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। খেতে শুরু করবার আগে কিছুক্ষণ চুপটি করে বসবে আর বলবে, "শান্তি, শান্তি"

শান্তি!" তখন সব কিছু শান্ত হয়ে যাবে। যেন গত রকমের কল-কোলাহল সব দূরে, বহুদূরে চলে গেছে...(মা দু'হাত দু'দিকে বাড়িয়ে নাড়তে লাগলেন)। কিন্তু এটা তোমাকে অভ্যাস করে চলতে হবে। তাহলে পরে এমন একটা সময় আসবে যখন আর এর জন্যে তোমাকে বলতে হবে না, তখন যে কাজই তুমি কর না কেন, যা কিছুই তুমি বলনা কেন, সর্বদাই ওই "শান্তি, শান্তি, শান্তি।" অন্য সব কিছুই বাইরে থাকবে, ঠিক এই ভাবে, তারা ভিতরে ঢুকবে না (মা কপালের সামনেটা ইঙ্গিত করে দেখালেন) এই ভাবে থাকবে। আর তখন তুমি সর্বদাই শক্তিপূর্ণ অবস্থায় বাস করবে।...অবশ্য তা করতে কয়েক বছর লাগবে।

কিন্তু গোড়ায় যখন আরম্ভ করবে তখন খুব অল্পক্ষণই করবে, মাত্র দু-তিন মিনিট, সেটা খুবই সহজ। জটিল কিছু করতে হলে তোমাকে অনেক মেহনৎ করতে হয়, আর বেশী মেহনৎ করলে মানুষ শান্ত হতে পারে না। শান্ত থেকে মেহনত করতে পারা বড় সোজা কথা নয়। এ সব ব্যাপারে তোমাকে খুব সহজ সরল হতে হবে। যেন কেমন করে একজন বন্ধুকে ডাকতে হয়, তাই শিখছ, ডাকের জোরেই সে আসে। তেমনি শান্তি এবং নীরবতার সঙ্গে বন্ধুত্ব কর, এবং ডাক, "এস এস, শান্তি এস, শান্তি এস, শান্তি এস।" বুঝলে?

এই শেষ তাহলে?

প্রশ্ন মা, বুঝতে পারার জায়গা কি মাথার মধ্যে?

শ্রীমা : বুঝতে পারার ক্ষমতা? সেই সম্বন্ধেই কি জানতে চাইছ? সেটা মাথার মধ্যে আছে কি না? এইমাত্র আমি ত ঠিক তার উল্টোটাই বললাম! কয়েক মিনিট আগে বললাম, মনের সকল ক্ষমতাই রয়েছে মনের মধ্যে। কেবল অভ্যাসের দরুণই সেগুলো রয়েছে মাথার মধ্যে। যে কোন জায়গা থেকেই তুমি বুঝতে পার। যেখানেই চেতনার অধিষ্ঠান সেখানেই তুমি বুঝতে পার।

প্রশ্ন মা, তুমি বললে, "অভ্যাসের দরুণ"। কিন্তু আমরা ত ওই ভাবেই জন্মেছি। ওকে কি করে বদলানো যাবে?

শ্রীমা তুমি যেই জন্মালে অমনি কি চিন্তা করতে আরম্ভ করলে?

প্রশ্ন : কিন্তু মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা করাটাই ত স্বাভাবিক। ওর আবার অভ্যাস কি করে করা যায়।

শ্রীমা সুদীর্ঘকাল ধরে এ অভ্যাস চলে আসছে। বাপ-মায়ের, তাদের বাপ মায়ের, তাদের বাপ-মায়ের, ইত্যাদি আমল থেকে, এই ভাবে ওই অভ্যাস চলে আসছে—কিন্তু সকলের বেলাতেই তা নয়। যেমন চোখ দিয়ে দেখাটা একটা অভ্যাস। কিন্তু একটু মনঃসংযোগের দ্বারা যে অন্যান্য জায়গায় দর্শনের কেন্দ্র সৃষ্টি করা যেতে পারে, এটা ত প্রমাণ্য সত্য। আমি বলছি না যে মস্তিষ্ক চিন্তা করার জন্যে তৈরী হয়নি। সে কথা

আমি তোমাদের কখন বলিনি। আমি বলছি চিন্তা করাটা কেবল মস্তিষ্কের উপরই নির্ভর করে না, সেটা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। কেউ যদি মানসিক শক্তিকে কাজে লাগাবার কৌশল জানে, তাহলে সে বেশ ভাল করেই দেখতে পায় যে আত্মপ্রকাশের পক্ষে মস্তিষ্কটি হল খুবই উপযুক্ত যন্ত্র—বাস্তবিক সেই জন্যেই ওটা তৈরী হয়েছে। চিন্তাকে গ্রহণ করে কাজে নিযুক্ত করা, ভাষায় রূপ দেওয়া, এই হল তার কাজ,—কিন্তু সে জন্যে ওটিই যে একমাত্র যন্ত্র, তা না হতেও পারে।

(কিছুক্ষণ নীরব থেকে) আমার বক্তব্য হল, একচেটে অধিকার—এটাই হল অভ্যাসের ফল। যাই হোক, একটু গভীরভাবে যোগ অভ্যাস করলেই মানুষ বেশ ভাল করে জানতে পারে যে, সে এই জায়গাতেই চিন্তা করতে পারে (মা কপালের মাঝখানটাতে ভ্রূযুগলের মধ্যে দেখালেন, তারপর একবার ডান দিকে, একবার বাঁ দিকে দেখালেন), এখানে করতে পারে, এখানে করতে পারে, কপালের মাঝখানে করতে পারে, আবার—যে কথা আমি এইমাত্র বলছিলাম,—আরও অনেক উর্ধ্বে চিন্তা করতে পারে। তবে স্বভাবতই মানুষ মনে করে তার সকল চিন্তাবৃত্তি, তার একাগ্রতা, আসে মস্তিষ্ক থেকে—আর যখন সে আরও উর্ধ্বে চিন্তা করে, তখন এখানে, (মা মস্তিষ্কের উর্ধ্বে দেখালেন) কপালে চিন্তা করার চেয়ে সে ঢের ভাল করে চিন্তা করে। এর কারণ, মানুষ কখন ওভাবে ছাড়া অন্যভাবে চিন্তা করার চেষ্টাই করে নি। না, "কখন করেনি" তা বলা চলে না, কারণ অনেকেই সে চেষ্টা করেছেন এবং সফলকাম হয়েছেন।

আচ্ছা, অনেক হল, আজকের পালা তাহলে এইখানেই শেষ।

Our Homage to Sri Aurobindo and The Mother

Mitra Engineering & Construction Co.

(ENGINEERS OF REPUTE)

Phone 46-3957

Specialist in Insulation Work, Air Conditioning & Refrigeration, Electrical Engineers & Builders.

16/1, Chandranath Chatterjee Street
Calcutta—25

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field
Sreepore Bagharghole
P.O. Bonhooghly, 24 Parganas

Head Office
34: 1, Puddapukur Road
Calcutta-20

Phone : 47-2869

With the best Compliments from :-

Ellora Enterprise

Paper & Board Merchants

57/2A, College Street
Calcutta-12

Phone: 34-3720

স ম গ্র

র চ না ব লী

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

চার খণ্ড প্রকাশিত—প্রতি খণ্ডের মূল্য ২৫·০০ টাকা

পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, মনোরম বাঁধাই, সুশোভন সংস্করণ

অমলেশ ভট্টাচার্যের

নিঃসঙ্গ আকাশ

নিঃসঙ্গ আকাশের মতোই উদার উন্মুক্ত চেতনার সুরে
রচিত অভিনব কাব্যগ্রন্থ।

রমেন সেনগুপ্তের

শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মায়ের চরণে নিবেদিত

প্রণতি

(কাব্যগ্রন্থ)

মূল্য ৩·০০ টাকা

সমীরকান্ত গুপ্তের

কাব্যলোকে

বাংলা কাব্যের মনোজ্ঞ আলোচনা

প্রাচীন থেকে আধুনিক পৌঁছানোর চিত্তাকর্ষক প্রকৃতি-বিশ্লেষণ

মূল্য ৮·০০

শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা সংগ্রহ

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ শ্রীমায়ের জন্ম-শতবার্ষিকী। শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির যথাভাবে শতবার্ষিকী জয়ন্তী পালন করবে। জয়ন্তীর একটি অংশ পালিত হবে শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা প্রকাশনের মাধ্যমে। শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা মূল ফরাসী এবং ইংরাজী থেকে বাংলায় অনূদিত ১৫ খণ্ডে প্রকাশ হবে। তাতে থাকবে তাঁর লেখা ধ্যান ও প্রার্থনা, পুরাণো লেখা, খসড়া উত্তর, খসড়া, পত্রাবলী ইত্যাদি।

প্রাক প্রকাশনী মূল্য—১০০৲ টাকা (সডাক ১৫০৲ টাকা) (গ্রাহকদের জন্য)
প্রকাশ হবার পরবর্তী মূল্য—৪০০৲ টাকা (সডাক ৫০০৲ টাকা)

[শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা সংগ্রহ জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ মোট ১৫ খণ্ডে প্রকাশ করা হবে লাইনো টাইপে ছাপা ও সুন্দর কাপড়ে মজবুত বাঁধাই হবে সুদৃশ্য জ্যাকেটে মোড়া হবে খুব কম সংখ্যা ছাপানো হবে।]

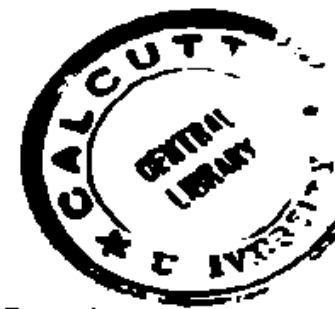

—গ্রাহক হবার নিয়মাবলী—

১। ৩০৲ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।
২। প্রতিটি খণ্ড প্রকাশ হলে গ্রাহকদের জানানো হবে এবং ২০৲ টাকা দিয়ে বই সংগ্রহ করতে হবে।
৩। শেষ দুই খণ্ড অর্থাৎ ১৪ ও ১৫ খণ্ড সংগ্রহ করবার সময় গ্রাহকের জমা ৩০৲ টাকার সঙ্গে হিসাবনিকাশ করা হবে।

৪। যোগাযোগ করার স্থান :—

(ক) শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির,
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

(খ) শ্রীঅরবিন্দ ভবন,
৮ শেক্সপীয়র সরণী, কলিকাতা-৭০০০৭১

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

২৪শে নভেম্বর, ১৯৭৮

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৪শে নভেম্বর, ১৯৭৮)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

সাবিত্রী (অনুবাদ)	শ্রীঅরবিন্দ	৫
ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিস্তব	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৫
শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি	...	১৯
প্রভাতচন্দ্র সান্যাল	সমীরকান্ত গুপ্ত	২১
বাঘের আলাপ		২৩

বর্ত্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

সম্পাদক
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by : **Nolini Kanta Gupta**
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-73
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry-2

The Grace is always with you, concentrate in your heart with a silent mind, and you are sure also to receive the guidance and the help you aspire for.

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

৭ম পর্ব—যোগসাধনা

৫ম সর্গ—অন্তরাত্মার দর্শন

চলেছে সে সম্মুখে অন্তরাত্মার রহস্য-গুহার সন্ধানে।
প্রথমেই পদক্ষেপ হল তার ভগবৎ-কৃত এক রাত্রিগর্ভে।
সে আলোক নিভে গিয়েছে শ্রমক্লিন্ন জগতের সহায় যে,
যে শক্তি প্রয়াস করে, চলে স্খলিতপদে জীবনের পথে
অক্ষম মন ত্যাগ করে তার চিন্তাধারা,
উন্মুখী হৃদয় বিসর্জন করে তার ব্যর্থ আশাদব।
বিফল সকল জ্ঞান, বিফল ভাবনার রূপাবলী,
বিজ্ঞতা বিভ্রান্তিভরে টানে অবগুণ্ঠন তার অবনত মস্তক'পরে
অনুভব করে সত্য এক চিন্তার বাক্যের অতীত,
রূপহারা অনির্বচনীয়, অক্ষয় অব্যয়।
সরল অবল অজ্ঞতা এক
পূজা করে চলে নিরাকার ভগবানে যেন
সেই অদৃশ্য আলোক আপনার নয় যা, নয় তার অধিকারে।
শূন্যতার সহজ শুদ্ধি নিয়ে
মন তার নত যেন অজ্ঞেয়ের সম্মুখে।
মুছে গিয়েছে সব, রয়েছে শুধু নিরাবরণ অন্তঃপুরুষ
আর তার সমর্পিত হৃদয়ের ভূলুণ্ঠিত আকূতি।
কোন সামর্থ্য নাই তার, কোন বীর্যবলের গর্ব
আকাঙ্ক্ষার সমুচ্চ শিখা নির্বাণোন্মুখ
লজ্জাভরে, নিয়ে তার স্বাতন্ত্র্যের মিথ্যা গরিমা,
অধ্যাত্ম-মহিমার আশা পলাতক সুদূরে,
চায় না সে মুক্তি, চায় না সে স্বর্গের বিজয়মুকুট :
মানবিকতাও মনে হয় এখন অতি গর্বের।
আপনি সে এখন শূন্য, এক ভগবানই পূর্ণ ;
তবু জানে না সে এখনও ভগবানে, জানে শুধু তিনি রয়েছেন।
পুণ্য এক আঁধার ধ্যানস্থ তার অন্তরে এখন,
জগৎ গভীর আঁধার বিপুল বিবসন।
এই শূন্য ধারণ করে জগৎ সকলের সমারোহ ছাড়াও আরও কিছু বেশি,
এই রিক্ততা অনুভব করে মহাকাল যা-কিছু বহন করেছে তার অপেক্ষাও বেশি ভার,

৫

এই অন্ধকার অজ্ঞাতকে জানে অস্ফুটভাবে বিপুলভাবে।
তবে সবই সেখানে রূপহারা, কণ্ঠহারা, অসীম অনন্ত।
ছায়ামূর্তি হেঁটে চলে যেন ছায়াময় রঙ্গমঞ্চে,
ক্ষুব্ধ এক নাস্তি ভেদ করে চলে যেন বৃহত্তর নাস্তি,
মূর্তিময় নিশা এক শুধু রেখাকারে
পার হয়ে যায় অতল অমূর্ত মহানিশা,
নির্বাক চলে সে, রিক্ত, একান্ত।
অন্তহীন কালক্রমে অন্তরাত্মা তার উপনীত অপার অন্তে এক
এই নিরাকাশ প্রসার হয়েছে তার অন্তশ্চেতনার আবাস।
অবশেষে ধীরে এল এক রূপান্তর, লীর্ণ হল মহাশূন্যতা ;
অন্তরে তরঙ্গ এক আন্দোলিত, সৃষ্টি হয়েছে স্পন্দিত
পুনরায় তার আন্তর সত্তা হয়েছে তার আপন আশ্রয়।
অনুভবে এল আনন্দময় সীমাহীন মহালক্ষ্যের,
স্বর্গ অবনত যেন পুণ্য গিরি চুম্বনতরে,
বাতাস শিহরিত আবেগে উল্লাসে।
মহোজ্জ্বল গোলাপ এক প্রস্ফুটিত স্বপ্নের তরুশীর্ষে,
উষার মুখমণ্ডল ফুটে ওঠে ক্রমে চন্দ্রিমাভূষিত আলোক-আঁধারে।
এল দিনমান, পুরোহিত যেন আনন্দের মহাযজ্ঞে
নীরব পূজারত সাবিত্রীর জগতে ;
দিনের আলো দেবতা যেন জ্যোতির্ময় পরিধান তার,
স্বর্গকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে রক্তিম উত্তরীয় যেন,
স্বর্ণবর্ণ সূর্যকে কপালে ধারণ করেছে সিন্দূর-তিলকরূপে।
যেন অতি পুরাতন স্বপ্ন এক স্মৃতির আশ্রয়ে সত্য হয়ে উঠেছে,
তার ভবিষ্যদর্শী মনের মধ্যে ধরা দিল এসে
সেই আকাশের অক্ষয় জ্যোতি,
সেই প্রসন্ন বাতাসের স্পন্দিত মাধুর্য
তারপর, মনের ধারণা এবং প্রাণের আকাঙ্ক্ষার আড়ালে,
দেখল পুণ্য গিরিতলে সেই রহস্যময় গুহা,
জানতে পারল তার গোপন অন্তরাত্মায় আপন নিবাস।
যেন কোন অলৌকিক লোকের গহন গর্ভে,
সত্যের শেষ আশ্রয় চিন্তার দূষিত স্পর্শ থেকে দূরে,
লুকায়ে রয়েছে যেন গিরি-মন্দিরের নিঃসঙ্গতা মাঝে,
ভগবান আশ্রয় নিয়েছেন যেন অজ্ঞানের পূজারত জগৎ থেকে সরে গিয়ে,
আপনাকে সরিয়ে রেখেছে তা জীবনধারার আন্তর ইন্দ্রিয়ানুভব হতেও,
হৃদয়ের জটিল বাসনারাজি হতে প্রত্যাহৃত হয়ে।
চেয়ে দেখে সে দৃষ্টির সম্মুখে অপরূপ ধ্যানমগ্ন গোধূলিলগ্ন এক,

পূর্ণা নৈঃশব্দ্য এক ধরে রেখেছে সেই কণ্ঠহারা আকাশ।
ভীতিকর অস্ফুটতা এক আচ্ছন্ন করে রেখেছে বিপুল গিরিরাজ যত
কেটে তোলা হয়েছে জড়ের পুঞ্জীভূত প্রস্তর-সমাহিতি হতে।
ছিন্নপক্ষ দুটি সর্প ঘিরে রয়েছে চৌকাঠের চারিদিকে,
ঘিরে রেখেছে তারে তাদের শুদ্ধ বিভীষণ সামর্থ্য দিয়ে,
চেয়ে রয় বাহিরের দিকে প্রজ্ঞানের গভীর জ্যোতির্ময় চক্ষু মেলে।
উপর হতে ঈগল এক ছায়ায় ধরেছে তারে প্রসারিত করে আপনার বিজয়ী
পক্ষ দুটি।

আত্মনগ্ন স্থির স্বপ্নরাজির শিখাসব,
কপোতদল ভিড় করে রয়েছে ধূসর ধ্যানাবিষ্ট গৃহকোণে
শুভ্রবক্ষ শান্তির প্রস্তরপ্রতিমা যেন।
সৃষ্টির দুয়ার পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ করে সাবিত্রী
দেখে চারিদিকে তার দেবতাদের মহান প্রতিমূর্তি সব
সচেতন প্রস্তরদেহে, শ্বাসবর্জিত তবু জীবন্ত,
দৃষ্টি তাদের নিবদ্ধ মানুষের অন্তরাত্মার 'পরে,
বিশ্বপুরুষের কর্মী কায়া যত,
বিশ্বভূত প্রতীক তারা অচল অক্ষয় সামর্থ্যের আধার।
প্রাচীরে অঙ্কিত সর্বত্র অর্থবহ রূপ সব
তার দিকে তাকিয়ে রয় দেখায় তারে মানুষের আর প্রাণীর জীবনযাত্রা
আর দেবতাদের সমুচ্চ জীবনরহস্য,
এইসব অসংখ্য লোকাবলীর কি শক্তি, কি প্রয়োজন,
অধিবাসীদের রূপাবলী আর বিশ্ব-আকাশের প্রসার সব
এনে দেয় তাকে এক সংক্ষিপ্ত অক্ষুরন্ত
গুপ্তবাণী এই যত উর্ধ্বগামী ভুবনের।
অনন্তের বিরাট স্বাক্ষর যেন তারা,
তারা হল ভগবানেরই আপনার প্রসারিত আধার
আশ্রয় দিয়েছে, সকলকেই গ্রহণ করে নিরপেক্ষভাবে,
ভগবানেরই আপন প্রতিমূর্তি সব, তাঁর ক্ষুদ্র হোক বিশাল হোক কর্মাবলী
তাঁর বিপুল আবেগ, তাঁর জন্ম, তাঁর জীবন, তাঁর মৃত্যু
অবরুদ্ধে তাঁর প্রত্যাবর্তন।
চিরন্তনের শাশ্বতের অভিমুখে তাদের আরোহণ,
সেই শুদ্ধ সৎ অভিমুখে সর্বত্র যা একই,
সেই পূর্ণ চেতনা আর সেই অমিশ্র শক্তির দিকে
আর সেই অচিন্তনীয় নিরাকার আনন্দের দিকে,
কালগত পুলকের অভিমুখে, কালহীন রহস্যের অভিমুখে
সেই ত্রিধা সত্তার সর্বময় যে, অদ্বিতীয় যে

অথচ সে ব্যক্তিবিশেষ নয়, স্বয়ং সে একান্তে।
ছিল না সেখানে চলমান মানুষের নিঃশ্বাস, ছিল না ধ্বনি কোন,
রয়েছে শুধু অন্তরাত্মার জীবন্ত সান্নীপ্য।
রয়েছে তবু সকল জগৎ আর ভগবান স্বয়ং,
প্রত্যেকটি প্রতীক বাস্তব সেখানে
নিয়ে আসে ভগবান-সান্নিধ্যকে যেখানে জন্ম তাদের।
এসবই দেখে সাবিত্রী, অনুভব করে অন্তরে, আর জানতে পারে
মনের কোন চিন্তার আশ্রয়ে নয়, অন্তরাত্মার আশ্রয়ে।
সে জ্যোতির জন্ম নয় সূর্যে বা চন্দ্রে বা অগ্নিতে,
সে জ্যোতির নিবাস অন্তরে, দেখে সে অন্তরে
অন্তরঙ্গ দর্শন এক ছড়িয়ে দিয়ে,
গুপ্তকে ব্যক্ত করে বাকা অপেক্ষা সুষ্ঠুতরভাবে
আমাদের দৃষ্টি আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভব ভ্রান্তিপূর্ণ প্রত্যয়, ভ্রান্তিপূর্ণ স্পর্শ,
অন্তশ্চেতনার প্রত্যক্ষই পূর্ণ সত্য।
সাবিত্রী চলে যায় পার হয়ে সেই রহস্যস্থান দিয়ে
কক্ষ হতে কক্ষান্তরে, দুয়ার পার হয়ে, পার হয়ে প্রস্তরে কাটা দুয়ার,
অনুভব করে সে যা-কিছু দেখে সকলের সঙ্গে এক।
নিভৃত চিরদিন ঐকাবোধ জাগে অন্তরে তার :
জানে সেই হল পরমের প্রিয়া
এই যত দেবতা আর দেবীকুল, সবই তিনি আর সে নিজে :
জননী সে সৌন্দর্যের আনন্দের,
মহাবাক্ সে ব্রহ্মার বিপুল সৃষ্টিকর আলিঙ্গনে,
জগৎ-শক্তি সে সর্বশক্তিময় মহাদেবের উৎসঙ্গে,—
সকল জীবের অধিপতি সে, জননী সে
চেয়ে রয়েছে জগতের অভিমুখে তাদের বনজ দৃষ্টি সৃষ্টি করেছে যারে,
কৃষ্ণ এবং রাধা চিরতরে আনন্দে একাত্মীভূত,
পূজ্য এবং পূজারী আত্মহারা, একার।
সর্বশেষ কক্ষে হিরণ্ময় সিংহাসন 'পরে
আসীন একজন যার আকার কোন দিব্যদর্শন এঁকে দিতে পারে না,
শুধু অনুভব করা যায় বিশ্বের অগম্য যে উৎস,
মহাশক্তি এক যার বিক্ষিপ্ত অংশ এক নিজে সে,
অদৃশ্য মহাসৌন্দর্য এক, জগতের বাসনার কাম্য,
মহাসূর্য এক সকল জ্ঞান যার এক কিরণরেখা,
মহিমা এক যার বিহনে জীবন সম্ভব নয়।
সেখান থেকে সবই অন্তর্হিত হয়ে গেল শুদ্ধ আত্মার মধ্যে,
সবই হয়ে গেল রূপহীন বিশুদ্ধ নিরালম্ব।

তারপরে শেষ প্রস্তরপ্রাচীর কেটে এক সুড়ঙ্গ পার হয়ে
বাহিরে এল সে প্রজ্বলিত যেখানে নৃত্যহীন সূর্য এক।
ভবন এক সেখানে গঠিত আগুনে আলোকে
তারপর পার হয়ে এক প্রজ্বলন্ত বহ্নির দ্বারহীন দেওয়াল
অকস্মাৎ উপনীত সে তার গুপ্ত অন্তরাত্মার সাক্ষাতে।

সত্তা এক দাঁড়িয়ে রয়েছে নশ্বরের মধ্যে অমর,
নৃত্যহীন লীলা তার ক্ষণিকাদের সঙ্গে,
বিশাল নয়নে তার প্রশান্ত প্রসন্নতা
মুছে যায়নি তা দুঃখ দয়া সত্ত্বেও,
অনন্তের দৃষ্টি সাস্ত আধারের অভিমুখে
সাক্ষী সে দেখে যায় মুহূর্তাবলীর নীরব পদক্ষেপ
আর চলমান দৃশ্যাবলী যত চিরন্তনের লীলামাঝে,
মহা-ইচ্ছাশক্তির নির্বাচন-রহস্য মাঝে,
এই দিব্য নাট্য অভিনয়ে অভিনেতা,
সচেতন প্রতিনিধি পরাচেতনার,
মানবের মধ্যে ভগবানের প্রতিভূ,
বিশ্বের সহচর, লোকাতীতের রশ্মিরেখা,
এসেছে নারী এই মানুষী দেহের কক্ষতলে
কন্দুক-ক্রীড়াতরে কালের ঘটনার সঙ্গে।
জগতে আনন্দ, এই হল এখানে তার পরম গতিভঙ্গ,
লীলার আবেগ প্রোজ্জ্বল করে ধরেছে তার নয়ন
ওষ্ঠে স্মিতহাসি এক স্বাগত করে পৃথিবীর সুখ ও শোক,
আনন্দে-বেদনায় প্রতিদান তার অট্টহাস্য।
দৃষ্টিতে তার সবই হল সত্যের ছদ্মবেশ
অজ্ঞানের পরিচ্ছদ ধারণ করে আপনাকে লুকায়েছে,
সম্বৎসরের ধারা অতিক্রম করে চলেছে অমরত্বে
সবকিছুর সম্মুখীন হতে সক্ষম সে, নিয়ে তার চেতনার মহাবল শান্তি।
তবুও জানে সে মনের প্রাণের পরিশ্রম
জননী অনুভব করে অংশী হয় যেমন তার সন্তানদের জীবনে,
বের করে ধরে দেয় আপনারই ক্ষুদ্র অংশ এক,
আকারে অঙ্গুষ্ঠমাত্র সত্তা সে
হৃদয়ের এক গোপন রাজ্যে
দুঃখের সম্মুখীন হতে ভুলে গিয়ে আত্মানন্দ,
পৃথিবীর ক্ষতরাজির যন্ত্রণার ভাগী হতে, সহ্য করতে
আর পরিশ্রম করে চলতে নক্ষত্ররাজির শ্রবপুঞ্জ মাঝে।

এই সত্তাই আমাদের মধ্যে হাসে কাঁদে, সহ্য করে আঘাত,
উল্লাস তার বিজয়ে, প্রয়াস তার বিজয়মুকুটের জন্য,
একীভূত সে মনের প্রাণের দেহের সঙ্গে,
আপনার পরে গ্রহণ করে তাদের বেদনা আর ব্যর্থতা,
রক্ত ঝরে তার দুর্ভাগ্যের কষাঘাতে, ঝুলে থাকে ক্রুশ 'পরে,
তবু অন্তরাত্মা তার অক্ষত অমর রয়,
ধারণ করে রাখে মানুষী রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাকে।
এই ধারায় তিনি প্রেরণ করেন আমাদের কাছে তাঁর মহিমা আর শক্তি সব,
নিয়ে চলেন জ্ঞানের শিখরে সব দুর্গতির গহ্বর পার হয়ে ;
তিনি আমাদের বল জুগিয়ে চলেন আমাদের নিত্যকর্মের জন্য
আর অনুকম্পা অন্যের দুঃখভাগী হওয়ার জন্য
আর সেই সামর্থ্যটুকু আমাদের মানবজাতিকে সাহায্যের জন্য
আমাদেরই গ্রহণ করতে হবে বিশ্বের অভিনয়-অংশ
বিশ্ব অভিনয় করে চলে নিজে তুচ্ছ মানুষী আকারের মাঝে,
আমাদের স্কন্ধ'পরে বহন করি আমরা শ্রমক্লিন্ন ব্রহ্মাণ্ডকে।
এই হল সেই দেবতা আমাদের অন্তরে ক্ষুদ্র এবং ক্লিন্ন হয়ে আছে ;
দেহসম্ভাব এই যে মানুষী অংশ
সেখানে মহাশক্তি স্থাপন করেছেন অন্তরাত্মার মহত্বকে কালের ধারায়
তাকে তুলে ধরবার জন্য জ্যোতি হতে জ্যোতির মধ্যে, সামর্থ্য হতে সামর্থ্যের মধ্যে,
যতদিন না সে উঠে দাঁড়ায় স্বর্গের শিখরে, রাজা হয়ে।
দেহে সে দুর্বল, হৃদয়ে সে অজ্ঞের বীর্য,
উঠে চলে স্খলিতপদে, অদৃশ্য হাত ধরে আছে তবে,
মানুষী আকারে শ্রমরত চিৎসত্তা এক।
এই আগুনের ও আলোকের ঝকতলে দেখা হল দুজনার .
দৃষ্টি নিবদ্ধ উভয়ের উভয়ের পানে, পরিচয় হল তাদের,
অন্তঃস্থ দেবতা আর তার মানুষী প্রতিরূপ,
প্রশান্ত অমর সত্তা আর শ্রমক্লিন্ন জীব।
সহসা রূপান্তরের যাদুময় প্রবেগে
দুজনে দুজনার মধ্যে ধেয়ে এসে মিশে গেল এক হয়ে।

আবার হয়েছে সে যেমন ছিল মানুষী জীব পার্থিব মাটির 'পরে
রাত্রির অস্ফুট আঁধার আর বর্ষাধৌত বনতলে
তুচ্ছ তার কুটিরের মাঝে আসীন সে ধ্যানমগ্ন :
সূক্ষ্ম জগৎটি সরে গেল গভীর অন্তরে তার
আন্তর দৃষ্টির সূর্য-আবরণ পশ্চাতে।
এখন তবে অর্ধ-উন্মীলিত তার হৃদয়-পদ্মের কলি

বিকশিত, ধরা দিয়েছে পার্থিব কিরণলেখার কাছে,
মূর্তরূপে আলোকোজ্জ্বল প্রকটিত তার গুপ্ত অন্তরাত্মা।
কোন প্রাচীর নাই সেথা অন্তরাত্মাকে আর মনকে বিচ্ছিন্ন করে,
কোন অলৌকিক বেষ্টনী ঘিরে দেওয়া হয়নি জীবনের দাবি হতে তাহে রক্ষা তরে।
অতল গভীর কমল-ভবনে সত্তা আসীন তার
যেন সমাহিতির প্রস্তর-আসনে,
আহ্বান করে পরাশক্তি জগৎ-জননীরে
এই পার্থিব আবাসকে আপন নিবাস করে তুলবার জন্য।
সহসা তড়িৎ-লেখা যেন লোকোত্তর জ্যোতির্মণ্ডল হতে,
আদিশক্তির জীবন্ত মূর্তি এক,
মুখমণ্ডল, আকার এক অবতীর্ণ হৃদিতলে তার
যেন আপনারই নিজস্ব মন্দির আর বিশুদ্ধ নিবাসে।
পদযুগল তার যেন স্পর্শ করে সেই শশ্বিত প্রস্ফুরণ,
বিপুল প্রবেগ এক দুলায়ে গেল আন্তর আকাশ
সমগ্র জগৎ যেন আন্দোলিত, লভে অবশেষে তার অন্তঃপুরুষ
নিশ্চেতনার আত্মাহীন মানসহীন রাত্রিগর্ভ হতে
প্রজ্বলন্ত বিষধর এক উঠে এল নিদ্রাভঙ্গে তার।
উঠে চলে দুলায়ে তার বলয়াবলী, দাঁড়ায় ঋজু হয়ে
সবলে ঝড়ের বেগে ঊর্ধ্বমুখী পথ বেয়ে চলে ও'র
একে একে স্পর্শ করে যায় জ্বলন্ত জিহ্বাগ্রে যাবতীয় চক্র সাবিত্রীর আধারে
বহ্নিময় চুম্বন যেন ভেঙে দিয়ে যায় সুপ্তি তাদের,
ফুটে ওঠে তারা হাস্যদীপ্ত আপূর্ণ আলোকে আর আনন্দে
অবশেষে শীর্ষে গিয়ে যুক্ত হয় সে সনাতনের আকাশে।
মূর্ধচিক্রে, জড়ের অধিষ্ঠানচক্রে,
ভগবানের প্রতিটি দুর্গে, প্রকৃতির প্রতিটি গ্রন্থিতে
ধরে রাখে সে এই অলৌকিক ধারাকে যুক্ত করে রেখেছে যে
অগোচর শিখর সব অদৃশ্য অতলের সঙ্গে,
এই যত দুর্গস্থানের বেষ্টনী এই তনুর রক্ষাবেষ্টনী
আমাদের রক্ষণভার যাদের বিশাল জগতের বিরুদ্ধে,
তার বৃহৎ প্রসারের মধ্যে আনাদের আত্মপ্রকাশের ধারা যত।
আদি শক্তির মূর্তি এক আসীন সেখানে
জগৎ-জননীর আকার ও আনন ধারণ করে।
সশস্ত্রা, নানা-আয়ুধধারিণী আর সেই মুদ্রা
যার গুপ্ত শক্তি কোন যাদুবিদ্যা অনুকরণ করতে পারে না,
বহুরূপিণী তবুও এক অদ্বিতীয় আসীন সে, অভয়দাত্রী
ত্রাণকর্ত্রী সে প্রসারিত করেছে হস্ত তার,

প্রতীক যেন সহজাত বিশ্বসামর্থ্যপুঞ্জের,
এলায়িত পতাকা পল্লবে তার,
প্রশান্ত অগ্নিচক্ষু জীবন্ত শক্তিরাশি যেন।
রূপান্তরিত হয়ে গেল সব সমুচ্চ স্বর্গীয় প্রভাবে এক :
দীর্ণ হল ঘনঘোর নিশ্চেতনার বুক অন্ধ প্রাচীর,
মুছে গেল অজ্ঞানের কুণ্ডলী যত,
মহাশক্তিরাজি দেবসংঘসব বহ্নিবেগে হল প্রস্ফুরিত,
আধারের প্রতি অঙ্গ আনন্দে স্পন্দিত
অভিভূত এবে পুলকের প্লাবনধারায়,
মহাশক্তির হস্তস্পর্শ দেখা যায় প্রতি ঘটনায়
প্রতি অঙ্গ প্রতি কোষ অবধি অনুভব করে স্পর্শ তার
মূর্ধায় সহস্রার-রাজ্যে।
মানস চিন্তা যেখানে গড়ে তুলেছে তার সঙ্কুল কর্মক্ষেত্র,
ভ্রূ-যুগলমধ্যস্থ দুর্গকমলে
যেখান হতে নিক্ষেপ করে সে দৃষ্টি ও সঙ্কল্পের তীব্রধারা,
তারপর কণ্ঠস্থ কমলদলের পথ ধরে
বাক্ যেখানে ফুটে ওঠে, মনের হয় আত্মপ্রকাশ
আর হৃদয়াবেগ ছুটে চলে বাক্যের আর কর্মের আশ্রয় তরে,
এল তবে আনন্দময় উন্নয়ন এক, অভিনব কর্মধারা এক।
অমর সত্তার চিন্তাবলী আমাদের সীমিত দৃষ্টির স্থান অধিকার করে,
অধিকার করে পৃথিবীর মলিন ধারণা আর অনুভূতি :
সব জিনিসই লাভ করেছে গভীরতর স্বর্গীয়তর বাঞ্ছনা।
প্রসন্ন স্বচ্ছ সুষমা এক এঁকে দিয়েছে তাদের সত্তার পরিসীমা,
পুনরায় স্থাপন করেছে জগতের যথাযথ সাম্য আর পরিমাপ।
প্রতিটি আকার ধরে দিয়েছে তার প্রচ্ছন্ন পরিকল্পনা,
নির্মুক্ত করে অন্তরে যে উদ্দেশ্য ভরে দিয়ে ভগবান তাকে সৃষ্টি করেছিলেন
আর সেই জীবন্ত মহাদ্যুতি ভগবৎ শিল্পগত চিন্তাধারার।
জগৎ-জননীর স্বেচ্ছাবৃত যন্ত্র,
দেবসত্তার সঙ্কল্প আপন প্রশান্ত নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ করে
আমাদের অন্ধ ভ্রান্ত জীবন-শাসনভার ;
এককালে ছিল যা শিথিল গণতন্ত্র যেন আমাদের মত অভাবে প্রয়োজনে পরিপূর্ণ,
তারপর এক অনিশ্চিত অধিকর্তা মনের কাছে মাথা নত করে,
এখন সে অনুসরণ করে দিব্যতর বিধান এক,
প্রতিটি কর্ম হয়ে উঠেছে ভাগবত ক্রিয়া।
হৃদয়কমলরাজ্যে
প্রেম গেয়ে চলেছে তার শুদ্ধ মিলনের স্তোত্রাবলী,

প্রাণকে দেহকে গড়েছে পুণ্য পুলকের দর্পণরূপে
আর যত হৃদয়াবেগ উৎসর্গিত এখন ভগবানে।
নাভিকেন্দ্রে বিশাল সাম্রাজ্য অধিকার যেন এক
তার গর্বিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা যত আর দুর্জয় লালসা সব
এখন অনুগত বাহন তারা প্রশান্ত বিপুল প্রভাব-প্রসারী
করবে সে ভগবানের কাজ পার্থিব মাটির পরে।
নিম্নতন সঙ্কীর্ণ চক্রের ক্ষুদ্রতর ধারা যত
তার দৈনন্দিন বাসনাকার বাসনাবলীর বালসুলভ ক্রীড়াপর্ব
পরিবর্তিত এখন মধুর উচ্ছ্বসিত লীলাভঙ্গে,
জীবনের সঙ্গে কালধারায় বালশিল্যদের লীলালাস্য যেন।
গভীর গহনে একদা যেখানে সুপ্ত ছিল কুণ্ডলিনী শক্তি
সেখান হতে এল জড়ের মহাশক্তিরাজির উপর দৃঢ় অধিকার
জীবনধারার ক্ষুদ্র অবকাশে বিপুল প্রয়োজন সাধনের জন্য ;
অটল প্রতিষ্ঠা প্রস্তুত এখন স্বর্গ হতে অবতারী শক্তির তরে।
সকলের পশ্চাতে তারই সর্বজয়ী মৃত্যুঞ্জয়ী অন্তরাত্মার রয়েছে শাসন
দূরে ফেলে দিয়েছে অজ্ঞানের অবগুণ্ঠন,
সমধর্মী এখন দেবতাদের আর বিশ্বজনীন সত্তা আর শক্তিরাজির,
গড়ে উঠেছে এখন মানুষী স্থিতির সুসামঞ্জস্য ;
বিশ্বজননীর পাদমূলে আপনাকে সমর্পণ করেছে,
অনুসরণ করে চলে এখন একমাত্র তারই অদ্বিতীয় অনুজ্ঞা
নিশ্চেতনার জগতে এই রহস্যজালে।
প্রচ্ছন্ন অন্তরাত্মা এক রয়েছে পিছনে ধারণ করে রয় সব,
সে-ই হল অধিপতি আর সাক্ষী আমাদের অজ্ঞান জীবনধারার,
স্বাগত করেছে সে পরমপুরুষের দৃষ্টি আর পরমাপ্রকৃতির কৃতি।
যবে গুপ্ত দুয়ার সব হবে উদার মুক্ত
অবগুণ্ঠিত নৃপতি তখন এসে দাঁড়াবে প্রকৃতির সম্মুখে
জ্যোতি আসে নেমে অজ্ঞানের অন্তরে,
গুরুভার বেদনাময় গ্রন্থি তার হয়ে পড়ে শিথিলমুষ্টি :
মন হয়ে যায় করতলগত যন্ত্র যেন
আর জীবনধারা লাভ করে অন্তরাত্মার বর্ণাভ মূর্তি।
সুখভরে অগ্রসর হয়ে চলে সব জ্ঞানের আর আনন্দের অভিমুখে।
ভাগবত মহাশক্তি গ্রহণ করে প্রকৃতির স্থান
পরিচালিত করে আমাদের দেহের ও মনের গতিবিধি ;
সেই মহাশক্তি গ্রহণ করেছে এখন আমাদের উদ্‌গ্রীব আশা এবং স্বপ্নাবলী,
আমাদের চিন্তার ও কর্মরাজির প্রিয় একচ্ছত্র কর্ত্রী,
অবারিত বেগে প্রবাহিত হয় আমাদের অন্তরে,

ঢেলে দেয় মর্ত্য অঙ্গে যত অমর্ত্যের উল্লাস ও মহাবল।
সৌন্দর্যের আন্তর বিধান এক রূপ দেয় আমাদের জীবনধারায় :
আমাদের বাক্যাবলী হয়ে ওঠে সত্যের স্বভাবজ ভাষণ,
প্রতিটি চিন্তা হয়ে ওঠে আলোকের সাগরপরে তরঙ্গচূর্ণ যেন।
পাপ ও পুণ্য তখন বিস্মরণাঞ্চল বর্জন করে চলে যায় :
তাদের কোন দ্বন্দ্ব নাই আর আমাদের মুক্ত হৃদয়তলে
আমাদের কর্মাবলী ভগবানের সহজ স্বাভাবিক প্রেরণের সঙ্গে চলে সমতালে
অথবা সেবক হয় পরমবর্ষের শাসনবিধানে।
কলুষিত ভাবনা যত, যত পাপ যত মিথ্যা
স্থিতিস্থান ত্যাগ করে চলে যায় বিপুল বিশৃঙ্খলায়
আপনাদের লজ্জা লুকিয়ে রাখে অবচেতনার ছায়াতলে।
তখনই মন উচ্চকণ্ঠে গেয়ে ওঠে বিজয়বাণী
"হে অন্তরাত্মা, অন্তরাত্মা আমার, স্বর্গকে সৃষ্টি করেছি আমরা,
এখানে অন্তরে আমরা আবিষ্কার করেছি ভগবানের রাজ্য,
গড়ে তুলেছি তাঁর দুর্গ কোলাহলসঙ্কুল অজ্ঞান জগতে।
আমাদের জীবন সুরক্ষিত দুটি জ্যোতির স্রোতস্বিনীর মাঝে,
আকাশকে আমরা রূপান্তরিত করেছি শান্তির উপসাগররূপে,
মেহকে গড়েছি মহানন্দের রাজদুর্গরূপে।
আর কি, আর কি রয়েছে বাকী যদি আরও কিছু এখনও করবার থাকে?"
ক্রমবিকশিত চেতনার মন্থর ক্রিয়াধারায়,
মৃত্যু এবং জন্মের মাঝখানে ক্ষণস্থায়ী অন্তরালে
এনে দিয়েছে অবশেষে পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধির প্রথম পাদ।
আমাদের প্রাকৃত উপাদানের কাষ্ঠ এবং প্রস্তর হতে
নির্মিত মন্দির এক হবে যা সমুচ্চ দেবতাদের আবাস।
বাহিরে এখনও যদি রয়ে যায় দ্বন্দ্বসঙ্কুল জগৎ
তবু একটি মানুষের পূর্ণসিদ্ধি জগতের মুক্তি এনে দিতে পারে।
জয় হয়েছে আকাশপথের অভিনব সাধীপ্য,
স্বর্গ ও মর্ত্যের প্রথম উদ্বাহ-উদ্যোগপর্ব,
সত্যের ও জীবনের মধ্যে গভীর মিলনগ্রন্থি :
ভগবানের শিবির স্থাপিত হল মানুষী কালের মধ্যে।

(পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত)

ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র

(ঋগ্বেদ)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৩য় মণ্ডল—১১শ সূক্ত

১। অগ্নির্হোতা পুরোহিতোঽধ্বরস্য বিচর্ষণিঃ।
স বেদ যজ্ঞমানুষক্ ॥১॥

অগ্নিঃ—অগ্নি
হোতা—আহ্বাতা (সাধক)
পুরোহিতঃ—সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত, যাজিক
অধ্বরস্য—যজ্ঞযাত্রার
বিচর্ষণিঃ—সর্বদ্রষ্টা
সঃ—সে
বেদ—জানে
যজ্ঞম্—যজ্ঞকে
আনুষক্—আনুপূর্বিক

অগ্নি হলেন যজ্ঞযাত্রার দৃষ্টিবর যাজিক, পুরোভাগে স্থান তাঁর যজ্ঞের আনুপূর্বিক জ্ঞান তাঁর আছে ॥১॥

২। স হব্যবাড়মর্ত্যা উশিগ্দূতশ্চনোহিতঃ।
অগ্নির্বিদ্বা সনুশ্রুতি ॥২॥

সঃ—সে, তিনি
হব্য-বাট্—আহুতি-বাহক
অমর্ত্যঃ—অমর্ত্য
উশিক্—আপ্তকাময়, অভীপ্সাময়
দূতঃ—দূত (তিনি)
চনঃ-হিতঃ—আনন্দে নিহিত
অগ্নিঃ—অগ্নি
বিদ্বা—বুদ্ধির সঙ্গে
সনু-শ্রুতি—সম্মিলিত হয়েছে

অমর তিনি, আহুতির বাহক, অভীপ্সাময়, দূত তিনি, আনন্দে অধিষ্ঠিত, সেই অগ্নি আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে সম্মিলিত ॥২॥

৩। অগ্নির্বিদ্বা স চেততি কেতুর্যজ্ঞস্য পূর্ব্যঃ।
অর্ধং হ্যস্য তরণি ॥৩॥

অগ্নিঃ—অগ্নি
বিদ্বা—বুদ্ধির সঙ্গে
সঃ—সে, তিনি
চেততি—জাগ্রত হয়ে ওঠেন
কেতুঃ—জ্ঞান (তিনি)
অর্ধম্—লক্ষ্য, গন্তব্য
হি—নিশ্চয়
অস্য—এর (মানুষের)
তরণি—তারণকর্তা

যজ্ঞস্য—যজ্ঞের
পূর্ব্যঃ—পরম বা সনাতন

সেই অগ্নি বুদ্ধির সঙ্গে যুগপৎ জাগ্রত হয়, সে হল যজ্ঞের সনাতন জ্ঞান, সে-ই মানুষকে পার করে নিয়ে যায় লক্ষ্যের দিকে ॥৩॥

৪। অগ্নিং সূনুং সনশ্রুতং সহসো জাতবেদসম্।
বহ্নিং দেবা অকৃণ্বত ॥৪॥

অগ্নিম্—অগ্নিকে
সূনুম্—পুত্র
সনশ্রুতম্—সনাতনের কি চিরন্তনের স্মৃতি যার
সহসঃ—মহাবলের
জাতবেদসম্—জন্মজ্ঞানীকে
বহ্নিম্—বাহক-শিখা
দেবাঃ—দেবতারা
অকৃণ্বত—গড়ে তুলেছেন, সৃষ্টি করেছেন

এই যে অগ্নি, মহাবলের পুত্র, যিনি শ্রবণ করেন সনাতনকে, জন্মজ্ঞানী যিনি, দেবতারা বাহক-শিখারূপে তাঁকে সৃষ্টি করেছে ॥৪॥

৫। অদাভ্যঃ পুরএতা বিশামগ্নির্মানুষীণাম্।
তূর্ণী রথঃ সদা নবঃ ॥৫॥

অদাভ্যঃ—অদমনীয়
পুরঃ-এতা—অগ্রগামী
বিশাম্—লোকসমূহের
অগ্নিঃ—অগ্নি
মানুষীণাম্—মানুষীদের
তূর্ণিঃ—বেগবান, দ্রুতগামী
রথঃ—রথ
সদা—সদা
নবঃ—নূতন

অগ্নি, মানুষী লোকসমূহের সম্মুখে চলেছেন অদম্য, রথ তাঁর ক্ষিপ্রগামী, নিত্য নূতন ॥৫॥

৬। সাহ্বান্বিশ্বা অভিযুজঃ ক্রতুর্দেবানামমৃক্তঃ।
অগ্নিস্তুবিশ্রবস্তমঃ ॥৬॥

সহ্বান্—অভিভূত করে, পরাস্ত করে
বিশ্বাঃ—যাবতীয়
অভি-যুজঃ—আক্রমণকারীদের
ক্রতুঃ—ইচ্ছাশক্তি, তপঃশক্তি
দেবানাম্—দেবতাদের
অমৃক্তঃ—অদমিত, অপরাজিত
অগ্নিঃ—অগ্নি
তুবি-শ্রবঃ-তমঃ—প্রভূত শ্রুতিশক্তি-সম্পন্ন

অগ্নি সকল আক্রমণকারীকে পরাভূত করেছে, দেবতাদের অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তি সে, পরিপূর্ণ সে অন্তঃপ্রেরণার প্রাচুর্যে ॥৬॥

৭। অভি প্রয়াংসি বাহসা দাশ্বাঁ অশ্নোতি মর্ত্যঃ।
ক্ষয়ং পাবকশোচিষঃ ॥৭॥

অভি (+অশ্নোতি)—অধিগত করে, ভোগ করে
প্রয়াংসি—সকল প্রেয়
বাহসা—বহন করে যে তাকে দিয়ে, বহনকারীর সহায়ে
দাশ্বান্—দাতা যে
অশ্নোতি (অভি+)—অধিগত করে, ভোগ করে
মর্ত্যঃ—মর্ত্যজীব
ক্ষয়ম্—আবাসগৃহ
পাবক-শোচিষঃ—শুদ্ধ করে যে জ্যোতি, শুদ্ধিদাতা জ্যোতির

সকল প্রেয়ের দাতা যে তার কল্যাণে মর্ত্যজীব জয় করে ভোগ করে শুদ্ধিকর জ্যোতিশিখার আলয়ে ॥৭॥

৮। পরি বিশ্বানি সুধিতাগ্নেরশ্যাম মন্মভিঃ।
বিপ্রাসো জাতবেদসঃ ॥৮॥

পরি (+অশ্যাম)—সর্বতোভাবে, চারিদিক দিয়ে যেন ভোগ করি
বিশ্বানি—যাবতীয় বস্তু
সু-ধিতা—দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত
অগ্নেঃ—অগ্নির
অশ্যাম (পরি+)—সর্বতোভাবে, চারিদিক দিয়ে যেন ভোগ করি
মন্মভিঃ—চিন্তাশক্তির সহায়ে
বিপ্রাসঃ—দীপ্ত দৃষ্টিময় যারা
জাতবেদসঃ—জন্মজ্ঞানী যারা, জ্ঞান জন্মেছে যাদের মধ্যে

অগ্নির রয়েছে যা-কিছু বস্তু চারিদিকে সুপ্রতিষ্ঠিত, আমরা যেন চিন্তাশক্তির সহায়ে তাকে অধিকার করি, আমরা যেন হয়ে উঠি জ্যোতির্ময় দ্রষ্টা, জন্মজ্ঞানী ॥৮॥

৯। অগ্নে বিশ্বানি বার্যা বাজেষু সনিষ্যবহে।
ত্বে দেবাস এরিরে ॥৯॥

অগ্নে—হে অগ্নি
বিশ্বানি—যাবতীয়
ত্বে—তোমার মধ্যে
দেবাসঃ—দেবতারা

বার্যা—বরেণ্য বস্তু
বাজেষু—পূর্ণতা-সকলের মধ্যে
সনিষ্যামহে—আমরা জয় করব
আ—আমাদের অভিমুখে
ঈরিরে—এসে গিয়েছে

হে অগ্নি, সকল পরিপূর্ণতার মধ্যে যাবতীয় বরণীয় বস্তু আমরা জয় করব ; তোমাকে আশ্রয় করে দেবতারা আমাদের অভিমুখে চলে এসেছে ॥৯॥

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি

(শ্রীনায়ের ভাষ্য সহ)

১—মানুষের মধ্যে দুটি সম্মিলিত শক্তি রয়েছে—জ্ঞান আর প্রজ্ঞা।

জ্ঞান হল সত্যের যতটুকু মন ধরতে পেরেছে হাতড়ে হাতড়ে, দেখেছে একটা বিকৃত আবেষ্টনের ভিতর দিয়ে। প্রজ্ঞা হল দিব্যচক্ষু দিব্যদৃষ্টিতে যা দেখে অধ্যাত্মের মধ্যে।

কেউ আমায় প্রশ্ন করেছে "শক্তি দুটি সম্মিলিত কেন?"

আমার মনে হয়, মানুষের মধ্যে সব অংশই পরস্পর দ্বন্দ্বরত এইভাবে দেখতে আমরা অভ্যস্ত বলেই সম্মিলিত হওয়া কথাটা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব শুধু আপাতমাত্র। বস্তুত, আবশ্যিকভাবেই, উর্ধ্বতর ক্ষেত্র থেকে যেসব শক্তি আসে তারা সবাই সম্মিলিত—ঐক্যবদ্ধ তারা, অজ্ঞানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একমত। আর শ্রীঅরবিন্দ যথেষ্ট পরিষ্কারভাবেই (যারা বোঝে তাদের জন্য) বলেছেন যে ঐ শক্তি দুটির একটি হল মনের এবং অপরটি অধ্যাত্মের। এই গভীর সত্যটিই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সূত্রটিতে প্রকাশ করতে চেয়েছেন সেটি হল এই যে মন দ্বিতীয় শক্তিটিকে অধিগত করতে চাইলেও তা সে পারে না, যেহেতু তা এমন এক শক্তি যা অধ্যাত্মের এবং যা মানুষী সত্তার মধ্যে অধ্যাত্ম-চেতনার সঙ্গে সঙ্গে জন্মলাভ করে।

জ্ঞান হল এমন কিছু যা মন অনেক চেষ্টায় অর্জন করতেও পারে, যদিও তা হয় না সত্যকার জ্ঞান, হয় শুধু জ্ঞানের একটা মনোময় রূপ মাত্র পক্ষান্তরে প্রজ্ঞা মোটেই মনের অধিকারে নেই, মন তার অধিকারী হতে একেবারেই অক্ষম, কারণ বাস্তবিকপক্ষে সে জানেই না প্রজ্ঞা কি বস্তু। আমি আবার বলি প্রজ্ঞা হল মূলত: অধ্যাত্মের শক্তি এবং সে-শক্তি জন্মায় শুধু অধ্যাত্মচেতনার সাথে সাথে।

একটা প্রশ্ন যা জিজ্ঞাসা করলে মনোজ্ঞ হত তা হল এই যে শ্রীঅরবিন্দ "বিকৃত আবেষ্টনের ভিতর দিয়ে দৃষ্ট সত্য" বলতে কি বোঝান। প্রথমত, সেই বিকৃত আবেষ্টনই-বা কি আর সেই বিকৃত আবেষ্টনের ভিতর দিয়ে সত্য যা হয়ে ওঠে তাই-বা কি?

আর সর্বত্র যেমন, শ্রীঅরবিন্দ যা বলেন তার বহু অর্থ থাকতে পারে যা উপর্যুপরি সন্নিবিষ্ট—একটা মোটের উপর বিশেষ অর্থ, আর একটা মোটের উপর সাধারণ অর্থ।

সব থেকে বিশেষ অর্থে, বিকৃত আবেষ্টন হল মনোময় আবেষ্টন যা কাজ করে চলে অজ্ঞানের ভিতর দিয়ে এবং তার ফলে সত্যকে শুদ্ধ স্বরূপে প্রকাশ করতে তা অক্ষম। কিন্তু সবপ্র জীবনই যেহেতু অজ্ঞানাশ্রিত, কাজেই সেই বিকৃত আবেষ্টনটি হল আবার এই পার্থিব পরিবেশ যার সবখানি তার ভিতর দিয়ে প্রকাশোন্মুখ সত্যকে বিকৃত করে ফেলে।

আর এই সূত্রটির সব থেকে সূক্ষ্ম দিকটি মেলে এইখানে। মন হাতড়ে হাতড়ে কি ধরতে পারে? আমরা জানি সে সব সময়েই হাতড়ে চলে, সে ভুল করে, পুরান প্রচেষ্টায় ফিরে আসে, শেষে...প্রতি পদে হোঁচট খেতে খেতে সে-চলা, কিন্তু সত্যের কতটুকু সে-মন ধরতে পারে? তা কি এক কণা, এক টুকরো, এমন কিছু যা আংশিক অসম্পূর্ণ হলেও সত্যই, না কি তা এমন কিছু যা মোটেই আর সত্য নয়? এটাই হল জিজ্ঞাসার বিষয়।

আমরা শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি (হয়তো আমরা অনেকবারই বলেছি) যে মানুষের হতে পারে শুধু আংশিক অসম্পূর্ণ খণ্ড জ্ঞান, আর, তাই সেসব সত্যকার জ্ঞান হতে পারে না। এ-দৃষ্টিভঙ্গি খুবই সাধারণ এবং এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পক্ষে জীবনে তার সামান্য একটু পরীক্ষা করে দেখাই যথেষ্ট, কিন্তু "বিকৃত আবেষ্টনের ভিতর দিয়ে দৃষ্ট সত্য" বলতে শ্রীঅরবিন্দ যা বোঝাতে চেয়েছেন তা ওর থেকে অনেক বেশি সূক্ষ্মরসাত্মক।

সত্য নিজেই ভিন্ন রূপের হয়ে পড়ে, সে সেই আবেষ্টনের মধ্যে আর সত্য থাকে না, হয়ে পড়ে সত্যের বিকৃতি ; ফলে, মানুষ যেটুকু ধরতে পারে তা হয় না এমন এক টুকরো যা হবে সত্য, তা হয় অন্তর্হিত সত্যের এক ভ্রান্ত রূপ বা আভাস মাত্র।

যা বলতে চাচ্ছি তা তোমাদের বোঝাবার চেষ্টায় আমি একটা উপমার সহায় নিচ্ছি। তা শুধুই একটা উপমা মাত্র, তার বেশি কিছু নয়, তাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করো না।

আমরা যদি সাদা সত্যকে নির্মল ভাস্বর একটি শুভ্র জ্যোতির্গোলকের সঙ্গে তুলনা করি, আমরা বলতে পারি যে মনোময় আবেষ্টনে, মানস পরিবেশের মধ্যে সেই শুভ্র পূর্ণালোক নিজেকে সহস্র সহস্র বীথিবিভঙ্গে রূপান্তরিত করে যাদের প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব বর্ণ-বৈশিষ্ট্য, কারণ তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে স্বতন্ত্র—আবেষ্টনটি শুভ্র জ্যোতিকে বিকৃত করেছে এবং তাকে গোচর করে ধরছে যেন লাল, সবুজ, হলুদ, নীল প্রভৃতি অসংখ্য বিভিন্ন বর্ণরূপে যাদের মধ্যে প্রায়ই থাকে প্রবল বিসঙ্গতি ; আর মন যা ধরে, তা ওই শুভ্র আলোকের ছোট্ট একটি কণা নয়, তা হল কমবেশি ওই বিভিন্ন রঙের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোরই কিছু সংখ্যককে, আর সেসব থেকে সে যে আবার ফিরে শুভ্র আলো গড়ে নেবে তাও সে পারে না। ফলে সত্যে পৌঁছান তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সে যা অধিগত করে তা সত্যের চূর্ণখণ্ড নয়, তা হল বিশ্লিষ্ট সত্য। সে হল বিশ্লিষ্টাবস্থা।

সত্য হল অখণ্ড, আর অখণ্ডই প্রয়োজন। যে বিকৃত আবেষ্টনের (মানস পরিবেশ) মধ্যে তাকে তুমি দেখ, তা তার সকল উপাদানকে অভিব্যক্ত, প্রস্ফুট বা এমনকি বোধ করবারও অনুপযুক্ত—বলা যেতে পারে শ্রেষ্ঠ ভাগই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। তাকে আর তখন তুমি সত্য আখ্যা দিতে পার না, তবে তা এমন কিছু যা নূনত সত্য হলেও সেই মনোময় পরিবেশের মধ্যে আলো আর তা নয়—অজ্ঞান মাত্র।

কাজেই, সংক্ষেপে বলতে গেলে আমি বলব যে মানুষী মন যে জ্ঞানকে ধরতে পারে তা অবশ্যম্ভাবীরূপে অজ্ঞানগত এক জ্ঞান, প্রায় বলা যেতে পারে অজ্ঞানাচ্ছন্ন জ্ঞান।

প্রজ্ঞা হল সত্যের দর্শন তার আপন সারসত্তায় এবং অভিব্যক্তির মধ্যে তার প্রয়োগে।

১২-৯-৫৮

অনুবাদ : শতদল

প্রভাতচন্দ্র সান্যাল

(১৮ অক্টোবর, ১৯০১ — ৩০ জুলাই, ১৯৭৮)

সমীরকান্ত গুপ্ত

ডাক্তার প্রভাতচন্দ্র সান্যাল তখন কলকাতার নামকরা শল্যচিকিৎসক—সার্জন, একজন দুর্ধর্ষ এফ. আর. সি. এস। বিধানচন্দ্র রায় তাঁকে শিশুদের অস্ত্রচিকিৎসার (Pediatric Sugery) প্রধান পদ দিতে চেয়েছিলেন। তিনি রাজী হননি। সার্জারির বিপুল জগৎ তখন তাঁর সামনে—তিনি কঠিন থেকে কঠিনতর ও জটিলতর অস্ত্রোপচারের চিন্তায় মগ্ন। ভিয়েনায় তিনি কিছুকাল অস্থিবিদ্যায় (Orthopædy) ট্রেনিং নিয়েছিলেন—বিনয় সহকারে সে-কথা বলতে শুনেছি তাঁকে। আশ্রম জীবনে তাঁকে কিছি-শিয়ানের ভূমিকা নিতে হয়েছিল বেশ। সার্জনের এই ব্রত, কেউ এমন বিরূপ মন্তব্য করলে তিনি বলতেন, মেডিসিন পাশ না করে তিনি সার্জন হন নি এবং সুদক্ষ সার্জনকে মেডিসিন সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ ও পারদর্শী থাকতে হয়। তিনি একটা কৌতুকপ্রদ গল্প বলতেন। তিনি তখন সবে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে বের হয়েছেন। তাঁর ঠাকুমা একদিন খেদভরে বলে ফেললেন, "তোকে কি শেষে ওষুধের ব্যাগ হাতে করে দু'টো পয়সার জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হবে।" কথাটা তাঁর কি রকম মনে ধরেছিল। তিনি তখনই সিদ্ধান্তে শল্যচিকিৎসায় সর্বোচ্চ পারদর্শিতা অর্জনের সিদ্ধান্ত করে ফেললেন। সেই ফেলোশিপ লাভের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানটির বর্ণনাও তাঁর মুখে শুনেছি। তাঁর কিছিশিয়ান হিসাবে কৃতিত্বের উল্লেখ করেছি। পুরাণীর (আমাদের অগ্নালাল পুরাণী) কাছে শোনা একটি গল্প প্রসঙ্গত বলব। আমেরিকা ভ্রমণ শেষে আশ্রমে ফিরে এসে পুরাণিকে কঠিন হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তিনি কোনো হাসপাতালে যাননি। ডা: সান্যালই তাঁর চিকিৎসক ছিলেন। একটু বাড়াবাড়ি দেখা দিলে ডা: সান্যালেরই পরামর্শে তিনি ভেল্লোরে বিশেষজ্ঞের কাছে যান। সেখানে ডাক্তাররা তাঁকে পরীক্ষা করে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাঁর হার্টের যে অবস্থা তাতে যে তিনি জীবিত অবস্থায় আরামদায়ক কারেও ভেল্লোরে পৌঁছতে পেরেছেন তা এক অভাবনীয় ব্যাপার। কে তাঁর চিকিৎসা করছিল তাঁরা জানতে চাইলেন। সমস্ত শুনে তাঁরা বললেন, "Hats off to that Doctor who could treat and keep you alive." বলা বাহুল্য তাঁরা জেনেছিলেন হাসপাতালের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ও যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াই এই দু:সাধ্য চিকিৎসা হয়েছিল।

ডা: সান্যাল আশ্রমের কলকাতা-কেন্দ্র শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের দ্বিতীয় সভাপতি ছিলেন (প্রথম ছিলেন চারুচন্দ্র দত্ত)। এই প্রতিষ্ঠানে তাঁর সাহায্য কম নয়। এখানে কোনো দায়িত্ব নিতে তিনি পিছপা ছিলেন না।

শ্রীঅরবিন্দের সংকটাপন্ন অসুস্থতার সময়ে তিনি আশ্রমে আসেন। শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়ানের অল্পকাল পরে বরাবরের জন্য চলে এসে আশ্রমের বাসিন্দা হন। চিকিৎসার ব্যাপারে শ্রীমা তাঁর মতামতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন—মায়ের কাছে তিনি ছিলেন "Docteur" ওইটুকু নামের মধ্যে তাঁর সবটা পরিচয় যেন ধরা ছিল।

তাঁর মুখে শোনা দুটি টুকরো গল্প দিয়ে প্রসঙ্গের ইতি টানব।

একদিন মা সাবিত্রী থেকে আবৃত্তি করে পড়ছিলেন। এপাশে বসে শুনছিলেন ডাঃ সান্যাল। হঠাৎ স্বর আটকে পড়া বন্ধ হল মায়ের। তিনি ডাক্তারকে বললেন, "একটা প্রচণ্ড শক্তি নামছিল, হঠাৎ এখানে আটকে গেল। (A tremcous Force was descending, it got struck up here.) ডাক্তার বললেন, "তোমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, তাই ওরকম কাশি।" মা একটু বিরক্তভাবেই উত্তর দিলেন, "তোমার সব তাতেই তর্ক। জানো বিভিন্ন কারণে একই ফল হতে পারে?" (You always argue. Do you know that different causes may produce the same result ?) ডাক্তার মিটিমিটি হেসে জানালেন, "আমার সুযোগ হয়নি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের পালায় নামার, সুতরাং এই রকমের কৌশলেই তোমার কাছ থেকে রহস্যভেদ আমার জেনে নিতে হয়।" বলা নিষ্প্রয়োজন এর পরে হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে মায়ের মুখ।

ডাঃ সান্যালের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি—এদিকে তিনি যেমন pragmatic তেমনি rational। এই গম্ভীর ও দুর্ভেদ্য মুখোশের অন্তরালে আর একটি মানুষ কেউ কেউ টের পেয়েছেন। সেখানে তিনি শিশুর মতো নরম—শিশুর মতোই প্রায় অসহায় এবং সাধক। তিনি চিরকাল কালীভক্ত ছিলেন—তাঁর ধ্যানঘরে মা-শ্রীঅরবিন্দের পাশে কালীমূর্তিও ছিল। সাম্প্রতিককালে তাঁর এক জন্মদিনে সন্ধ্যায় মা তাঁকে ডেকে পাশে বসান, বলেন, "তুমি মহাকালী দেখতে চাও? বসো এখানে।" (You want to see Mahakali ? Sit here.) তিনি মেপে মেপে তন্ময় হয়ে একথা বলছিলেন আমি ও তাঁর অনুজোপম এক বন্ধুকে। সন্দেহবাদী বৈজ্ঞানিকের মুখে এ কী শুনছি? তাঁর সেই প্রত্যয়মাখা প্রসন্ন দুরে-নিবদ্ধ দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তাঁর দর্শন সম্বন্ধে আর কোনো প্রশ্ন মনে হল অবান্তর।

মায়ের আলাপ

১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮

(শ্রীঅরবিন্দের Bases of Yoga বইটির পাঠ আরম্ভ হল, আজ থেকে। তারই যে কয়েক পৃষ্ঠা পড়া হল, তার মধ্যে থেকে ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন এবং মায়ের উত্তর)

প্রশ্ন যে মন চিন্তা করে, তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেও কি সে তখনও চিন্তা করে চলে ?

শ্রীমা সাধারণত তাই করে। তবে তাতে তোমার আর কিছু এসে যায় না। ওটা ঠিক "চিন্তা করা" নয়, ও যেন একটা বাজারের মাঝখান। চিন্তাগুলো আসে, ঘোরাঘুরি করে, পিছন দিকে ফেরে, বেরিয়ে যায়, আবার আসে, পাশ কাটিয়ে যায়, কখন বা ধাক্কা-ধাক্কি করে। হুবহু বাজারের মানুষের মতো। ওইভাবে যাওয়া আসা করে...(ইঙ্গিতে দেখালেন)

চিন্তার কারখানা হল...তেমনটা খুব বেশী ঘটেনা যদিও। কেউ কেউ আছে যাদের বিশেষ কাজই হল বাইরে থেকে চিন্তার যে বেগ আসে তাকে একটা বিশেষ রূপ দেওয়া। সাধারণত এরা হল লেখক বা বক্তা বা যারা শিক্ষক...এবং ঐ রকমের অন্যান্যরা...তবে সেটা বিরল। সচরাচর চিন্তাগুলো আসে, চলে যায়, আবার আসে, আবার ফিরে যায়। তখন যদি সেগুলো থেকে নিজেকে বিযুক্ত কর, তাহলে অনায়াসে উপর থেকে দেখতে পাবে, যেন মনুমেন্টের উপর থেকে নিচের চৌমাথার লোক-চলাচল দেখছ। তখন বড়ই মজার ব্যাপার হয়। এমন কি তখন পরিষ্কার দেখতে পাবে, কোথা থেকে চিন্তাটা আসছে, কোথায় যাচ্ছে, কোন্ জিনিসটাকে তা নাড়া দিচ্ছে এবং তার ফল কি হচ্ছে।

প্রশ্ন মা, "মনের প্রাণ" কাকে বলে ?

শ্রীমা ব্যাপারটা কি জান, ও হল শ্রেণী বিভাগ করবার জন্যে কতকগুলো শব্দ প্রয়োগ করা, যাতে বোঝবার সুবিধা হয়। আসলে সত্তার প্রতিটি অংশেই চারটি ভাগ আছে। একটি হল দেহগত মন, তারপর হল দেহগত প্রাণ, এবং দেহগত শরীর, এমন কি দেহগত এক চৈত্যপুরুষ পর্যন্ত আছে, তার অধিষ্ঠান একেবারে পিছনে। তেমনি আবার প্রাণময় মন আছে, প্রাণময় প্রাণ আছে, প্রাণময় দেহ আছে, এমন কি প্রাণময় চৈত্যপুরুষ পিছনে গোপনে রয়েছে। আবার মনোময় মন আছে মনোময় প্রাণ আছে মনোময় দেহ আছে এবং মনোময় চৈত্যপুরুষ পর্যন্ত আছে যা গোপনে থাকে পিছন দিকে। এদের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন রকমের কাজকর্ম আছে, আবার আছে এক একটি বিশেষ রাজ্য যা হল চেতনার ও সত্তার বিশেষ স্তর। আর এই সব রাজ্যের বা ভিতরকার আয়তনের অনুরূপ হল যত বাহ্য স্তর বা রাজ্য। সমস্যাটা সহজবোধ্য করবার জন্যে সেগুলোকে ব্যাপক বা পৃথিবীব্যাপী বলতে পার। তোমার নিজের মধ্যে আছে এক মনোময় মন, আবার পার্থিব

আবেষ্টনে আছে এক মনোময় মন, আবার...কি ভাবে বলি...এই সব অন্তর্জগতের এবং বহির্জগতের গাঢ়তা একই রকমের, তাদের স্পন্দনের ধারণও একই রকমের।

যদি সচেতনভাবে তোমার মনোময় মনের মধ্যে প্রবেশ কর তাহলে তুমি সচেতন ভাবে পৃথিবীর মনোময় মনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে। আগে একবার আমরা এটা বুঝিয়ে বলেছিলাম, নয় কি? এক রকমের নক্‌সাও করা হয়েছিল, মনে পড়ছে? না, না, আমি ভূ-গোলকের (globe) কথা বলছি না। বলছি...যেখানে বিভিন্ন রাজ্যের নক্‌সা আঁকা হয়েছিল।

প্রশ্ন আচ্ছা মা, কি ভাবে মনের বল প্রয়োগ করে নিজের আবেগ উত্তেজনাগুলোকে বশে আনা যায়?

শ্রীমা সব শিক্ষিত লোকেরাই এটা করে। কেবল যারা অশিক্ষিত অসভ্য শ্রেণীর তারাই করে না। শিক্ষার মর্মই ত তাই, নয় কি? কারণ এটা ত জানাই কথা যে তুমি যদি সমাজে বাস কর—ধর যদি নিঃসঙ্গ হয়ে সম্পূর্ণ একা একাই বাস কর তাহলেও, আর সমাজে বাস করলে ত কথাই নেই—তোমার আবেগ উত্তেজনাগুলো তোমাকে যা কিছু করতে উত্তেজিত করবে, নির্বিচারে তুমি সে সবই করে চলতে পার না। করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, নয় কি? তোমার এতটুকু বয়স থেকেই শিক্ষকদের প্রধান কাজ হল, তোমার আবেগ উত্তেজনাগুলোকে কি ভাবে সংযত করতে হয় তা তোমাকে শেখানো, এবং যে সব বিধি-নিষেধের অধীনে তুমি বাস কর, অথবা জীবনে যে আদর্শকে তুমি অনুসরণ করতে চাও বা যে পরিবেশে থেকে তুমি মানুষ হচ্ছ সেখানকার আচার আচরণগুলিই কেবল তোমাকে মেনে চলতে শেখানো হয়। মন দিয়ে গড়া এই যে রূপ, যেটা তোমার আবেগ উত্তেজনাগুলোর উপর কর্তৃত্ব করবে, তার মূল্য কতখানি, তা অনেকটাই নির্ভর করছে, তুমি কোন্ পরিবেশে বাস করছ তার উপর এবং তোমার বাবা-মা বা যাঁরা তোমাকে শিক্ষাদান করেন তাঁদের প্রকৃতির উপর। কিন্তু তা ভালই হোক বা মন্দই হোক, সাধারণ রকমের হোক বা অতি উৎকৃষ্ট হোক, সর্বদাই সেটা নির্ভর করবে তোমার প্রবৃত্তিকে তুমি কতখানি আয়ত্তের মধ্যে আনতে পেরেছ তার উপর। তোমার বাবা-মা যখন তোমাকে বলেন, "এটা করবে না" বা যখন বলেন, "যাও, গিয়ে ওটা কর", তখন সেটাই হল তোমার প্রবৃত্তিকে মন দিয়ে শাসন করতে শেখানোর প্রথম পাঠ।

তাই, যে ব্যক্তি গুণী বা যিনি সুশিক্ষিত তাঁর মনের সমগ্র গঠনটাই এমন, যে তাঁর পরিবেশের আদর্শের সঙ্গে তিনি সর্বদাই নিজেকে খাপ খাইয়ে চলেন। কিন্তু যে তা করে না, অন্তত ন্যূনতম পরিমাণেও যে মনের এই গঠনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবে না, সমাজ তাকে অসভ্য বর্বর বলবে এবং তৎক্ষণাৎ সমাজ থেকে দূর করে দেবে। বাস্তবিকই যারা খুনে আসামী বা যাদের অর্ধ-উন্মাদ বলা হয়, তারা কেবল তাদের প্রবৃত্তির দাসত্ব করে, মনের সংযম তারা মানে না। তোমরা যারা এখানে রয়েছ তাদের মধ্যে একজনও কেউ নেই, জীবনে যে সংযমের বাঁধন না মেনে, প্রবৃত্তি তাকে যা কিছুই করতে উত্তেজিত করে, সে তাই করে। নিজের জীবনটা একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে, সারাক্ষণ নিজেকে নিজে বলতে হচ্ছে, "না, এ কাজ আমি করতে পারি না," অথবা "হাঁ, এটা আমি করতে

পারি," অথবা কোন একটা উত্তেজনাকে দমন করতে হচ্ছে বা আর একটাকে উৎসাহিত করতে হচ্ছে। একেই বলে মনের সংযম।

আমার ত মনে হয়, বনেজঙ্গলে বাস করে এমন লোকেরই কেবল মনের সংযম নেই, কারণ তারা সঙ্গে কোন মানুষেরই সংযোগ নেই। সে ক্ষেত্রেও তার নিজেকে সংযত করা দরকার, কারণ যদি আত্মসংযম না থাকে তাহলে জীবনে তার দুর্যোগ ঘটতে পারে। যতই যা হোক, তার মনকে রাশ টানতেই হবে, যাতে সে এমন সব কাজ না করে, যেগুলোর দরুণ পরে তাকে সাংঘাতিক অসুবিধায় পড়তে হবে। মানুষের নিজের উপযুক্ত কর্তব্যই ত এই। মনকে এমনভাবে চালান চাই যাতে অল্প বিস্তর তার সত্তার বাকি অংশগুলো পাসনে থাকে। সে কতখানি সভ্য হয়ে উঠেছে তা নির্ভর করবে, কত দূর অবধি তার এই আত্মসংযম সার্থক হয়েছে তার উপর। আর তার মানেই হল, যে কথা এইমাত্র বললাম, তার মনের যে রূপায়ন রাশ ধরে থাকে, তার মূল্য কতখানি তার উপর।

প্রশ্ন : মা, দেহগত-মন আর যন্ত্রবৎ-মন কি একই জিনিস?

শ্রীমা প্রায় তাই, অবশ্য সামান্য একটু তফাৎ আছে। খুব বেশী নয়। যন্ত্রবৎ-মন দেহগত মনের চেয়ে আরও বোকা। দেহগত মনের কথা একদিন আমরা আলোচনা করেছি, তার কোন কিছুতেই সন্দেহ ভঞ্জন হয় না।

তোমাদের সেই বন্ধ-দরজার গল্পটা বলেছি, নয় কি? ওই হল দেহগত মনের যথার্থ প্রকৃতি। কিন্তু যন্ত্রবৎ মন আরও এক মাত্রায় অধম, কারণ সে নিঃসন্দেহ হবার মতন কোন প্রামাণ্য যুক্তিরই ধার ধারে না। আর সকলের বেলাতেই এ রকমটা ঘটে থাকে। তবে সাধারণত মানুষ ওটাকে প্রশ্রয় দেয় না। কিন্তু ও ঠিক আসবেই এবং বারে বারে সম্পূর্ণ যন্ত্রবৎ একই বস্তুর পুনরাবৃত্তি করে চলবে। সেগুলোর মাথা মুণ্ডু কিছুই নেই, কেবল কলের পুতুলের মতন আবৃত্তি করবে। যখন তার কিছু একটা খেয়াল চাপে অমনি সেটাকে নিয়ে মেতে ওঠে। যেমন ধর, তার যদি "এক-দুই-তিন-চার" গুণতে খেয়াল হল, তাহলে সেটাই সে-মন আবৃত্তি করে চলবে, "এক-দুই-তিন-চার", "এক-দুই-তিন-চার" "এক-দুই-তিন-চার" এইভাবে,...তুমি হয়ত তখন অন্য নানা বিষয়ে চিন্তা করতে পার, কিন্তু ও ঠিক ওই ভাবে আবৃত্তি করে চলবে, "এক-দুই-তিন-চার", এইভাবে...(মা হাসতে লাগলেন), অথবা হয়ত তিনটি কি চারটি শব্দকে ধরে অনবরত সেই গুলিই আবৃত্তি করতে থাকবে। আর তখন যদি কেউ ভীষণ চটে গিয়ে তাকে কষে একটি চড় মেরে বলে, "চুপ কর্", তাহলেও সে অবিরাম ওই ভাবেই আবৃত্তি করে চলবে।

প্রশ্ন : চিন্তা এবং ভাবনা শুধুই কি মানস স্তরের জিনিস?

শ্রীমা কোন কোন ভাবনা এবং চিন্তা পরপার থেকে এবং উর্ধ্ব থেকে আসে। সেগুলোর বেলায় মন কেবল একটি আকার দেয় মাত্র। বস্তুত ঠিক সেই কথাই ত বলতে যাচ্ছিলাম। সত্যিকারের লেখক, চিন্তাশীল ব্যক্তি, স্রষ্টা যারা, তারা নিজেদের মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্তাকে সৃষ্টি করেনা। তারা উর্ধ্ব থেকে একটা প্রেরণা লাভ করে, সেই প্রেরণা মনের মধ্যে প্রবেশ করে ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু চিন্তার উৎস বহু উর্ধ্বে।

তুমি বোধহয় জানতে চাইছিলে, "নিচের থেকে চিন্তা আসে কি না?" সেগুলো চিন্তা নয়, কেবল আবেগ উত্তেজনা মাত্র। চেতনাতে সেগুলো রূপান্তরিত হয়, কিন্তু চিন্তা নয়। এদের প্রকৃতি আর এক রকমের।

প্রশ্ন মা, অবচেতনা বলতে ঠিক কি বোঝায়?

শ্রীমা অবচেতনা? অর্থাৎ যা অর্ধেকটা সচেতন, তাই না? "অব" বলার কারণ চেতনার "নিচে"। ও হল এমন কিছু যা চেতনার চেয়ে ঢের বেশী অস্পষ্ট, অথচ সেই সঙ্গেই আবার ও হল একটা নিম্নতন আশ্রয় যা চেতনাকে ধারণ করে আছে। ও যেন গুদাম ঘর বা ভাঁড়ার ঘরের মতন, যেখানে থেকে তুমি কাঁচামাল সংগ্রহ করতে পার, যার বিশেষ কোন আকার নেই। সেটাকে নানা ভাবে আকার দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পার, অথবা কাজে ফুটিয়ে তুলতে পার নানা প্রবৃত্তির মধ্যে দিয়ে, এমন কি হৃদয়ের নানা অনুভবের মধ্যে দিয়েও ফুটিয়ে তুলতে পার। কিন্তু ও হল ওই রকম সব ভাঁড়ার ঘরের মতন যার মধ্যে প্রচুর জিনিস জমা রয়েছে, কিন্তু সেগুলো পাঁচমিশেলী হয়ে রয়েছে, মোটেই বেশ পরিষ্কার স্পষ্ট নয়। কিন্তু তার মধ্যে যথেষ্ট মূল্যবান কিছু থাকার সম্ভাবনা আছে। কেবল সেগুলোকে টেনে বের করে আলোর সামনে এনে বাছিয়ে-গুছিয়ে শ্রেণী বিভাগ করে যথাযথ আকার দিতে হবে, যাতে সেগুলো মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে। যতদিন ওগুলো ওখানেই পড়ে থাকবে ততদিন ও যেন একটা স্তূপীকৃত একসঙ্গে মেশানো কিছু। অবশ্যই তা অবচেতন, অর্থাৎ অর্ধেকটা সচেতন। সবকিছুই সেখানে জটপাকানো রয়েছে। তার মাঝে না আছে কোন সুব্যবস্থা না কোন শ্রেণী বিভাগ। চেতনার প্রধান কাজই হল সুব্যবস্থিত করা এবং শ্রেণীবিভাগ করা...শ্রেণীবিভাগ, যথাযথ ব্যবস্থা, যুক্তিযুক্তভাবে সাজানো...যুক্তি-বিবেচনা ত নানা রকমেরই আছে, যাই হোক তবু কিছুটা যুক্তি-বিবেচনা, তার সূচনা মাত্র। ক্রমশ আরও উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরের যুক্তি আছে। কিন্তু যদি একেবারে প্রথমিক যুক্তিও হয়, সেটাও চেতনার প্রথম কাজ।

কিন্তু এই অবচেতন স্তরে চেতনা একেবারে নিমজ্জিত হয়ে আছে, মাটির মধ্যে শিকড় যে ভাবে ঢুকে থাকে আর সেখান থেকে উপর দিকে রস টানে—ঠিক সেইভাবে চেতনাও অনুক্ষণ অবচেতনাকে উপর দিকে টানছে, যাতে সে তাকে সুব্যবস্থিত কোন একটা বস্তুতে রূপান্তরিত করে তুলতে পারে। ঠিক এই কারণেই মানুষ একই কাজ বারে বারে করতে বাধ্য হয়। তার যদি খানিকটা সীমাবদ্ধ চেতনা থাকত, যেটা সম্পূর্ণ তার নিজস্ব (যেমন সেইভাবেই কেউ কেউ কল্পনা করে) তাদের যেন একটা ছোট্ট ব্যাগে ভর্তি চেতনা আছে, তাহলে সেটাকে তুমি যখন ভাল করে সুব্যবস্থিত করে গুছিয়ে ফেলতে পারবে, তখন তোমার কাজ শেষ হবে এবং তুমি নিশ্চিন্তে শান্তি ভোগ করতে পারবে। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সে রকম নয়।

চেতনার যেমন আছে নানা উপাদান, যেগুলো হারিয়ে যায়, বিলিয়ে যায়, চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়, তেমনি আবার আছে তার ঊর্ধ্বগতি, সে অনুক্ষণ ঊর্ধ্বের দিকে উঠে চলেছে, যেমন মাটির গভীর তলদেশ থেকে কিছু একটা চাইছে সচেতন হতে, কিন্তু তোমার হল বারে বারে একই কাজ করে চলা। তবে যদি যত্নশীল হও, যদি মনোযোগী হও, তাহলে

বারবার একই ভাবে একই কাজ না করে কিছুটা আগের চেয়ে ভাল করে করতে পার। তাহলে কাজের ধারাটা সমান্তরাল না হয়ে, যেন সর্পিল গতিতে হবে...এইভাবে... (মা সর্পিল গতির ইঙ্গিত করলেন)। তাই কখন কখন বোধহয় যেন পিছু হটে যাওয়া হচ্ছে, আসলে কিন্তু তা ক্রমশ আরও বেশী এগিয়ে যাওয়ার দিকেই।

প্রশ্ন : মা প্রশান্তিলাভ না করেও কি মানুষ নীরবতা লাভ করতে পারে?

শ্রীমা ঃ হাঁ, হয়ত পারে, অর্থাৎ মন তখন নীরব হয়েছে কিন্তু হৃদয় তখনও শান্তিলাভ করেনি। এমনটা হওয়া খুবই সম্ভব যে, মন একেবারে নীরব নিশ্চল হয়ে গেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও, এই জায়গাটায়, হৃদয়ে, তখনও স্পন্দন জাগছে এবং সংপিণ্ডে ধা পড়ছে। সাধারণত তার দ্বারা প্রমাণ হয়, মানুষটা নানাভাবে বিভক্ত। কিন্তু এমন ত অনেক লোকই আছে যারা বিভক্ত। কেউ হয়ত মনে সম্পূর্ণ নীরবতা লাভ করে রয়েছে, কিন্তু হৃদয়ে তার শান্তি নেই। এমনটা হওয়া মোটেই আশ্চর্য নয় যে তার মন সম্পূর্ণ নীরব এবং স্থির হয়ে গেছে কিন্তু তবু তার স্নায়ুমণ্ডলীতে শিহরণ রয়েছে, যার ফলে স্পন্দন এবং চাঞ্চল্য দেখা দিতে পারে, অথচ মন সম্পূর্ণ নীরব। কিন্তু যদি অনেকক্ষণ ধরে নীরব করতে পার, তাহলে বাকী আর যা কিছু তা স্বাভাবিক ভাবে আসবেই।

প্রশ্ন মা, প্রশান্তি আর স্থিরতা কি একই জিনিস?

শ্রীমা প্রশান্তি আর স্থিরতা? হাঁ্যা প্রায় একই। অবশ্য প্রশান্তি আবার নানা রকমের আছে, তেমনি স্থিরতাও আছে নানা রকমের। যদি একেবারে সম্পূর্ণ নিখুঁত এবং সঠিক ধারণা করতে চাও তাহলে প্রত্যেকটির জন্যেই আলাদা আলাদা শব্দ বা নাম দিতে পার। তাহলে আবার তার জন্যে তোমায় নতুন সব শব্দের তালিকা তৈরী করতে হবে। আর সত্যিই যদি একই লোকেদের সঙ্গে সর্বদা আলাপ আলোচনা করতে হয় এবং সংখ্যায় যদি তারা মাত্র কয়েকজনই হয়, তাহলে শব্দের তালিকাটি এমন নিখুঁত ভাবে তৈরী করতে পার, যাতে বলার পরে সেগুলিকে আর ব্যাখ্যা করবার দরকার হবে না।

কিন্তু যদি একই লোক না হয়ে অন্যদের সঙ্গে অথবা সম্পূর্ণ নতুন লোকেদের সঙ্গে আলাপ কর, তাহলে তোমাকে সব কিছু আবার ঢেলে সাজাতে হবে, কারণ এ এমন জিনিস, যা, এক কথায় বড় বেশী...অপেক্ষিকই শুধু নয়, বাঁধা রীতি নীতির বাইরের বস্তু। লোকেরা আবার কথাগুলোর অর্থ বিশেষ একভাবে বোঝে, প্রত্যেকেই বোঝে নিজের ভাবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কথাবার্তা বলার অভ্যাস থাকে আর যদি তাদের মতের মিল থাকে, অন্তত যদি পরোক্ষভাবেও থাকে, তবেই তারা শব্দগুলোর অর্থ ভাল করে বোঝে। ধর তুমি একজন নতুন লোকের সঙ্গে কথা বলছ, লোকটা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ থেকে এসেছে—তার চিন্তার ধরণ তোমার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের—সে ক্ষেত্রে তুমি যদি তাকে কোন বিষয়ে কিছু বল, সে তোমার কথার এক বিন্দুও বুঝতে পারবে না। সে বুঝবে অন্য কিছু, যেটা তার মাথার মধ্যে রয়েছে। কারণ তুমি যে কথাগুলো বললে, তোমার কাছে সেগুলোর যে অর্থ, তার কাছে তা নয়। কেবল নিজেদের পরস্পরের মধ্যে যখন কথা বলার অভ্যাস হয়েছে এবং পরস্পরের কথার অর্থ পরিষ্কার ভাবে বোধগম্য হয়েছে, তখনই কেবল আলাপ

আলোচনার মাঝে ভুল বোঝার সম্ভাবনা খুবই কম হবে, বরং বলতে পার, তখন পরস্পরকে বুঝতে পারার অংশটাই সব চেয়ে বেশী হয়।

প্রশ্ন কি করে কৃতজ্ঞভাবে দিব্য-করুণাকে গ্রহণ করতে হয়?

শ্রীমা হাঁ:! প্রথমে তার একান্ত প্রয়োজনটা অনুভব করা চাই।

ওটাই হল সব চেয়ে প্রধান কথা। অন্তরে এমন এক বিনয়ের ভাব জাগা চাই যা তোমাকে সচেতন করবে, যে দিব্য-করুণা ছাড়া তুমি অসহায়, সত্যিই তাঁকে ছাড়া তুমি অসম্পূর্ণ, তোমার কোন শক্তি নেই। এই হল প্রথম কথা।

এ হল একটা অভিজ্ঞতা, যা বেশ সহজেই হতে পারে। এমন কি যে সব লোক কিছুই জানে না, যারা হঠাৎ তারা অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় পড়ে গেছে বা তাদের কোন একটা সমস্যার তাড় সমাধান চাই অথবা ঠিক তখনই কোন একটা রিপুকে দমন করতে হবে কিংবা হয়ত এমন কিছু ঘটে থাকবে যাতে তাদের সম্পূর্ণ ওলট্‌পালট্‌ করে দিয়েছে...তারা দেখছে আর কোনই আশা নেই, কি করতে হবে কিছুই বুঝতে পারছে না—না ভেবে চিন্তে, না ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করে না কোনরকম অনুভূতির জোরে, বুঝে উঠতে পারছে না কি করা উচিত—ঠিক তখনই ওই জিনিসটি ঘটে, তাদের অন্তরে একটা কিছু আছে যে আকুলভাবে ডাকতে থাকে, সে ডাকের লক্ষ্য এমন কিছু বা কেউ যে-ই কেবল পারে অসাধ্যসাধন করতে, মানুষ তা পারে না। মানুষ তখন এমন একটা জিনিসের জন্যে আকুল হয়ে আকাঙ্ক্ষা করে, যে অঘটন ঘটাতে পারে, যা অন্য কেউ পারে না।

এই হল প্রথম অবস্থা। তারপর যদি বুঝতে পার যে একমাত্র দিব্য করুণাই এটা করতে পারেন, যে অবস্থার মধ্যে তুমি পড়ে গেছ তা থেকে তিনিই একমাত্র তোমাকে টেনে বের করতে পারেন, সমাধান বলে দিতে পারেন এবং বেরিয়ে আসবার মতো শক্তি দান করতে পারেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তোমার অন্তরে একটা তীব্র আস্পৃহা জেগে উঠবে, তুমি এমন একটা চেতনা লাভ করবে যেটা রূপান্তরিত হয়ে তোমার মধ্যে একটা নতুন দরজা খুলে যাবে। যদি ডাকতে থাক, যদি আস্পৃহাপরায়ণ হও, আর যদি, সাড়া পাবেই, এই ভরসা নিয়ে অপেক্ষা কর, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তুমি নিজেকে দিব্য-করুণার দিকে উন্মুক্ত করে ধরবে।

এরপর থেকে কিন্তু তোমাকে এ বিষয়ে খুব সাবধান হতে হবে (মা তাঁর মুখের সামনে আঙুলটি তুলে ধরে ইঙ্গিত করলেন) দিব্য-করুণা তোমার ডাকে সাড়া দেবেন, তিনি তোমাকে গণ্ডগোলের মাঝ থেকে টেনে তুলবেন, তোমার সমস্যার সমাধান বলে দেবেন, অথবা তোমার বাধাবিঘ্ন থেকে তোমাকে উদ্ধার করবেন। কিন্তু একবার যেই তোমার ঝঞ্ঝাট মিটে যাবে এবং বাধা বিঘ্নগুলোর হাত থেকে তুমি মুক্ত হবে, তখন ভুলে যেও না যে একমাত্র দিব্যকরুণাই তোমাকে তা থেকে মুক্ত করেছেন, যেন ভেব না যে তুমি নিজেই বিপদ-মুক্ত হয়েছ। কারণ এটাই হল বিশেষভাবে সাবধান হবার বিষয়। বেশীর ভাগ লোকই বিপদ কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বলে, "যাক্‌ বাঁচা গেল, শেষ পর্যন্ত বিপদটা কাটিয়ে উঠলাম!"

ব্যস্‌, তাহলেই সব গেল। তুমি দরজায় তালা লাগিয়ে দিলে। এরপর থেকে আর কিছুই

লাভ করতে পারবে না। ফিরে আবার তোমাকে একটা কেন তীব্র আঘাতপ্রাপ্তির অবস্থায় পড়তে হবে, সাংঘাতিক বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হবে, যাতে তোমার ভিতরকার এই ধরণের আহাম্মুকীর শিক্ষা হয় এবং নতুন করে আবার একবার বুঝতে পার যে তুমি নিজে কিছুই করতে পার না। কারণ যখন যথার্থই বুঝতে পারবে যে তোমার কোন শক্তিই নেই তখন তুমি খানিকটা নমনীয় হবে এবং তোমার অন্তরটা কিছুটা পরিমাণে নিজেকে খুলে ধরবে। কিন্তু যতদিন বিশ্বাস করবে যে তুমি যা করছ তা তোমার নিজেরই বুদ্ধি বিবেচনার এবং তোমার সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে করছ, ততদিন যথার্থই তুমি যে কেবল একটি দরজাই বন্ধ কর তা নয়, একে একে অনেক দরজাতেই তালা লাগিয়ে দাও। তখন তুমি নিজেকে একটি দুর্গের মধ্যে বন্ধ করে রাখ, সেখানে আর কিছুই ঢুকতে পারে না। ঠিক এটাই হল সব চেয়ে বড় আফ্‌সোসের কথা। মানুষ কত চট্ করেই না ভুলে যায়! অতি স্বাভাবিক-ভাবেই নিজের বাহাদুরীর কথা ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ কর।

প্রশ্ন : কিন্তু মা, আমরা যখন বিশ্বাস করতে চেষ্টা করি যে আমাদের কোন শক্তিই নেই, তখনও আমাদের মধ্যে কিছু একটা মনে করে যে আমরা শক্তিমান। তখন কি করা যায়?

শ্রীমা বটেই ত! খুবই সত্যি কথা! অকপট হওয়া সত্যিই ভারী কঠিন...সেই জন্যেই ত আঘাতগুলো বার বার অসংখ্যবার আসে। আর সময় সময় সেগুলো সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ একমাত্র ওটাই তোমার নির্বুদ্ধিতাকে ভেঙে গুঁড়ো করে দেয়। মানুষের মত দুর্বিপাকের যুক্তিযুক্ততাই ত হল ওটা। অবস্থা যখন চূড়ান্ত হয়ে দাঁড়ায়, সত্যিই যখন অকূল পাথারে পড়ে গেছ বলে বোধ কর, তখনই কেবল তোমার নির্বুদ্ধিতা কিছুটা কেটে যায়। কিন্তু যে কথা তুমি বললে, কেটে যাবার পরেও কিছু একটা, ছোট্ট একটা কিছু ভিতরে থেকে যায়। সেই জন্যেই ত বাধাগুলো এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়...

মানুষ যে নিজে কিছুই নয়, সে কিছুই করতে পারে না, তার কোন অস্তিত্বই নেই, দিব্য-চেতনা এবং দিব্য করুণা ছাড়া কোন সত্যই নেই—জীবনে এটা গভীরভাবে উপলব্ধি করার আগে পর্যন্ত তাকে কত আঘাতই না খেতে হয়। কিন্তু যে মুহূর্তে সে এটা সম্পূর্ণ নিশ্চিত জানল, তখন থেকে তার আর বাধা বলে কিছু থাকে না। কিন্তু সে জানা সর্বাঙ্গীণ হওয়া চাই। সোনার বিরুদ্ধাচারণ করার মতন কোন কিছুই থাকলে চলবে না। কিন্তু তেমনটা হবার আগে পর্যন্ত...আর তার জন্যে সুদীর্ঘকাল লেগে যায়।

প্রশ্ন : আচ্ছা মা, আঘাতগুলো সব কেন একেবারেই আসে না?

শ্রীমা কারণ, তাহলে সেটা তোমাকে একেবারে শেষ করে ফেলবে। তোমাকে সম্পূর্ণ ব্যাধিমুক্ত করবার জন্যে যে দারুণ আঘাতের প্রয়োজন হবে, তাতে তুমি একেবারে গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে যাবে। খুব ধীরে ধীরে একটু একটু করে এগুতে থাকলেই তোমার অস্তিত্ব বজায় থাকবে। স্বভাবতই সেটা নির্ভর করে তোমার ভিতরকার শক্তির উপর, তোমার অকপটতার উপর, তোমার উন্নতি লাভের সামর্থ্যের উপর আর তোমার অভিজ্ঞতার দ্বারা লাভবান হবার উপর। আর যে কথা এইমাত্র বললাম, তোমার ভুলে-না-যাওয়ার উপর।

ভুলে যায় না এমন ভাগ্যবান যে, সে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলে। মানুষ সত্যিই খুব তাড়াতাড়ি এগুতে পারে। আর যদি সেই সঙ্গে তার ভিতরকার ওই নৈতিক বলটা থাকে—যার কল্যাণে সামনে জলন্ত লৌহ-শলাকা থাকলে সেটার উপর জল ফেলে তাকে নিবিয়ে দেবার চেষ্টা না করে, যে তার বিস্ফোটের নর্মতল অবধি চলে যেতে পারে সে খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। কিন্তু তেমনটা করতে পারার মতন যথেষ্ট শক্তিশালী লোক সংখ্যায় খুব বেশী মেলে না, বরং তার বিপরীতটাই বেশী। লোকেরা অতি শীঘ্রই এ-ভাবে ও-ভাবে সে-ভাবে ঢাকতে চেষ্টা করে, তারা নিজেকেই নিজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। মানুষ যে সব নির্বুদ্ধিতার কাজ করে সে সবের সমর্থনে কত সুন্দর সুন্দর ছোটখাট যুক্তিই না সে দেয়, কত অসংখ্য কৈফিয়তের স্তূপই না সে জমা করে তোলে।

প্রশ্ন মা, কতগুলো আঘাত খেতে হবে, তা কি লোকেদের উপর নির্ভর করে?

শ্রীমা হাঁ, সেটা লোকেদের উপরই নির্ভর করে, এইমাত্র তোমাদের যা বললাম, সেটা নির্ভর করে তাদের উন্নতিলাভের সামর্থ্যের উপর, তাদের শক্তির উপর এবং তাদের প্রতিরোধ করবার ক্ষমতার উপর। কিন্তু আমি এমন খুব কম লোককেই জানি যাদের কোনদিন আঘাত খাবার দরকার হয় নি।

প্রশ্ন মা, আঘাত সেটা আসে সেটা কি মহাকালীরই আঘাত?

শ্রীমা আঘাত? না, তেমন কোন কথা নেই।

তুমি যদি খানিকটা বিষ খেয়ে ফেল, আর তার দরুণ জর্জরিত হও, সেটা মহাকালীর দোষ নয়। তোমার বিষ খাওয়াটাই তার কারণ। যদি ইচ্ছা করে সম্পূর্ণ আহাম্মুকের মতো কাজ কর তাহলে নিজেই এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করবে, যাতে স্বাভাবিক ভাবেই তোমার হাতটা, পাটা বা মাথাটা ভাঙতে পারে। কারণ, যে সামান্য অবস্থায় তোমার থাকার কথা সেটা তখন তোমার ছিল না। সে ক্ষেত্রে তুমি দিব্য-শক্তিদের দোষ দিতে পার না। ও হল, ভিতরকার যে অবস্থার দরুণ নির্বুদ্ধিতার কাজ করা হয়েছে তারই গন্তব্য স্বাভাবিক পরিণাম।

প্রশ্ন : মা, মহাকালীর আঘাত কী ধরণের?

শ্রীমা সে আঘাতে তুমি খুব খুশি হয়ে ওঠ, তোমার অন্তরটি তাতে উষ্ণ আবেগে ভরে যায়, ঠিক এই রকম। তুমি তাতে খুবই পরিতৃপ্তি লাভ কর।

প্রশ্ন : সেটা পাবার জন্যে কি অন্তরে প্রার্থনা করতে হয়, না-কি তা আপনা থেকেই আসে?

শ্রীমা হাঁ, সে জন্যে তোমার অন্তরের আশ্বাসটি অকপট হওয়া চাই। উন্নতি লাভের জন্যে আন্তরিক ইচ্ছা হওয়া চাই। সত্যিই বলা চাই, "হাঁ, আমি উন্নতি লাভ করতে চাই," অকপটে বলা চাই, "যা কিছুই ঘটুক, আমি চাই উন্নতিলাভ করে চলতে।" তা হলেই সেটা আসবে।

কিন্তু ওই যে বললাম, সেটা আসে পরিপূর্ণতার প্রচণ্ড স্রোতের আবেগে। আর তার মধ্যে থাকে তীব্র আনন্দ। একবার যখন সংকল্প গ্রহণ করেছ, যখন নিজের মধ্যে কিছু একটাকে দমন করবে বলে স্থির করেছ, যে অপকর্মটা একবার করেছ তা আর কখন করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছ, অথবা এমন কিছু করবে বলে সংকল্প করেছ যেটা করা অসম্ভব বা খুবই কঠিন, কিন্তু তুমি জান যে সেটা না করলেই নয়, এবং যখন তোমার সেই সঙ্কল্পের পিছনে অকপট ইচ্ছাশক্তিকে পূর্ণভাবে প্রয়োগ করেছ, তখন যেই একটা প্রচণ্ড ধাক্কা আসে এবং তুমি সেটা করবে বলে মনস্থ করেছ, সেটা তোমায় করতে বাধ্য করে, তখন সেটাই হল মহাকালীর আঘাত। কিন্তু সে আঘাতে তুমি নিজেকে ধন্য মনে কর, খুবই পরিতৃপ্ত হও। সেটা বড়ই চমৎকার অবস্থা, নয় কি? তখন তুমি অনুভব কর, তার মধ্যে অপূর্ব কিছু একটা রয়েছে (মা আঙুল দিয়ে নিজের হৃদয় নির্দেশ করলেন)।

একটা অবস্থা হল, তুমি যখন সম্পূর্ণ বাহ্য চেতনাতে বাস কর, সেটা একেবারেই বস্তুবৎ, পুরোপুরি দেহগত, তখন তুমি এমনই এক অজ্ঞানের মধ্যে বাস কর, সেটা তোমাকে দিয়ে যত রকমের অসম্ভব দুষ্কর্ম করায়। তার দরুন স্বভাবতই তোমাকে অপরিহার্যভাবে অতি শোচনীয় পরিণাম ভোগ করতে হয়।

আর এক অবস্থা হল, যখন তুমি নিজেকে সম্পূর্ণ উচ্চ এক অবস্থায় তুলে ধরে সংকল্প কর যে, তুমি নিজেকে অতিক্রম করে উঠে যাবে, একমাত্র সত্যের চেতনাতেই বাস করবে, এবং উন্নতি লাভের জন্যে যে মূল্যই দিতে হোক, তা দেবে।

এই যে দুটো অবস্থা, এর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ রয়েছে...আর সেই সময় তোমার কাছে যে সব বস্তু আসে, সেগুলো এতই অর্থপূর্ণ যে তার মধ্যে যে উজ্জ্বল সত্যটা রয়েছে তাকে খুব ভাল করেই দেখতে পাও, তা যেন দূর-দর্শনের আলোর মতন তোমার পথ আলোকিত করে...তখন সব কিছুই কি পরিষ্কারই না দেখা যায়। তখন আর বোধ হয়না যে একটা কিছু তোমাকে পিষে ফেলছে একটা বিরাট পাথর তোমার পিঠের উপর পড়ছে। তখন শুধুই প্রত্যক্ষ কর এক চোখধাঁধানো আলো।

সেই জন্যেই ত সর্বদা বলা হয়, প্রথম পদবিক্ষেপটাই বড় কষ্ট কর। প্রথম পদবিক্ষেপ অর্থাৎ এই স্তর থেকে বেরিয়ে এসে ওই স্তরে উঠে যাওয়া। তারপর থেকে সমস্ত কিছুই বদলে যায়।

কিন্তু এই স্তর থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসা চাই। এখানে থাকলে চলবে না। এক-পা এখানে আর এক-পা ওখানে দিয়ে চেষ্টা করলে চলবে না। তাতে কোন লাভ হয় না।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই থাক, বাছারা।*

* Bulletin, August 1978, Entretiens-র অনুবাদ (মূল ফরাসী থেকে)

Our Homage to Sri Aurobindo and The Mother

Mitra Engineering & Construction Co.

(ENGINEERS OF REPUTE)

Phone 46-3957

Specialist in Insulation Work, Air Conditioning & Refrigeration, Electrical Engineers & Builders.

16/1, Chandranath Chatterjee Street

Calcutta–25

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field
Sreepore Bagharghole
P.O. Bonhooghly, 24 Parganas

Head Office
34: 1, Puddapukur Road
Calcutta-20

Phone : 47-2869

With the best Compliments from :-

Ellora Enterprise

Paper & Board Merchants

57/2A, College Street
Calcutta-12

Phone: 34-3720

স ম গ্র

র চ না ব লী

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

চার খণ্ড প্রকাশিত—প্রতি খণ্ডের মূল্য ২৫·০০ টাকা

পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, মনোরম বাঁধাই, সুশোভন সংস্করণ

অমলেশ ভট্টাচার্যের

নিঃসঙ্গ আকাশ

নিঃসঙ্গ আকাশের মতোই উদার উন্মুক্ত চেতনার সুরে
রচিত অভিনব কাব্যগ্রন্থ।

রমেন সেনগুপ্তের

শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মায়ের চরণে নিবেদিত

প্রণতি

(কাব্যগ্রন্থ)

মূল্য ৩·০০ টাকা

সমীরকান্ত গুপ্তের

কাব্যলোকে

বাংলা কাব্যের মনোজ্ঞ আলোচনা
প্রাচীন থেকে আধুনিক পৌঁছানোর চিত্তাকর্ষক প্রকৃতি-বিশ্লেষণ

মূল্য ৮·০০

শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা সংগ্রহ

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ শ্রীমায়ের জন্ম-শতবার্ষিকী। শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির যথাভাবে শতবার্ষিকী জয়ন্তী পালন করবে। অবশ্যই একটি অংশ পালিত হবে শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা প্রকাশনের মাধ্যমে। শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা মূল ফরাসী এবং ইংরাজী থেকে বাংলায় অনূদিত ১৫ খণ্ডে প্রকাশ হবে। তাতে থাকবে তাঁর লেখা ধ্যান ও প্রার্থনা পুরোণো লেখা, প্রশ্ন উত্তর প্রবন্ধ পত্রাবলী ইত্যাদি।

প্রাক প্রকাশনী মূল্য—১০০ টাকা (সডাক ১৫০ টাকা) (গ্রাহকদের জন্য)
প্রকাশ মূল্য—৪৫০ টাকা (সডাক ৫০০ টাকা)

[শ্রীমায়ের সমগ্র রচনা সংগ্রহ জন্মশতবার্ষিক-সংস্করণ মোট ১৫ খণ্ডে প্রকাশ করা হবে। ডবল ক্রাউন সাইজে ছাপা সুন্দর কাপড়ে মজবুত বাঁধাই হবে সুদৃশ্য জ্যাকেটে মোড়া হবে। খুব কম মূল্যে ছাপানো হবে।]

॥ গ্রাহক হবার নিয়মাবলী ॥

১। ১০০ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।

২। দুটি খণ্ড-প্রকাশ হলে গ্রাহকদের জানানো হবে এবং ২০ টাকা দিয়ে বই সংগ্রহ করতে হবে।

৩। শেষ দুই খণ্ড অর্থাৎ ১৪ ও ১৫ খণ্ড সংগ্রহ করবার সময় গ্রাহকদের জমা ১০ টাকা সুদ সহ হিসাবনিকাশ করা হবে।

৪। যোগাযোগ করার স্থান :—

(ক) শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির,
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

(খ) শ্রীঅরবিন্দ ভবন,
৮ শেকসপীয়র সরণী, কলিকাতা-৭০০০৭১